হাদীসের কিস্‌সা
আকরাম ফারুক

হাদীসের কিস্‌সা

আকরাম ফারুক

স্মৃতি প্রকাশনী

হাদীসের কিস্‌সা

আকরাম ফারুক

প্রকাশক

মোঃ নেছার উদ্দিন মাসুদ

স্মৃতি প্রকাশনী

৪৫১, মীর হাজীর বাগ, ঢাকা-১২০৪

ফোন : ৭৪৪২৮০৮

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০১৩

কার্তিক ১৪২০

জিলহজ্জ ১৪৩৪

মূল্য : ১৩০.০০ টাকা

প্রচ্ছদ
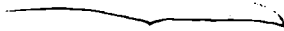
হামিদুল ইসলাম

প্রকাশকের কথা

বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক, বহু ভাষাবিদ ও সুসাহিত্যিক জনাব আকরাম ফারুক রচিত "হাদীসের কিস্‌সা" গ্রন্থটি সকল শ্রেণীর পাঠক মহলের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হওয়ায় গ্রন্থটির প্রথম থেকে চতুর্থ খন্ড একত্রে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনেকদিন ধরেই অনুভব করে আসছি। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতায় তা হয়ে উঠছিল না। মহান রাব্বুল আলামিনের বিশেষ অনুগ্রহে তা এখন প্রকাশ পাওয়ায় তাঁর দরবারে জানাই লাখো কোটি শোকরিয়া। চারটি খন্ড একত্রে নতুন ভাবে বিন্যাস করে নতুন ধারাবাহিকতা রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

নব্য জাহেলিয়াতের এই যুগে শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠন উপযোগী সাহিত্য নেই বললেই চলে। বিশেষ করে সরাসরি আল কুরআন ও আল হাদীস থেকে নবী-রাসূলদের বিভিন্ন ইতিহাস ও ছোট ছোট ঘটনা এবং উল্লেখযোগ্য সাহাবী, তাবেয়ী ও ব্যক্তিগণের জীবনের বিভিন্ন দিক, বিভাগ ও ঘটনা নিয়ে রচিত সাহিত্যের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এ গ্রন্থে সাহাবী, তাবেয়ী, উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ এবং নবী-রাসূলদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী, ইতিহাস ও শিক্ষামূলক গল্প-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠে শিশু-কিশোরসহ সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা বিশেষভাবে উপকৃত হবে এবং শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করি। আল্লাহ্ আমাদের সকল শ্রম ও প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন!

মোঃ নেছার উদ্দিন মাসুদ
৪৫১, মীর হাজীর বাগ
ঢাকা-১২০৪

ভূমিকা

কিস্‌সা কাহিনী ও গল্প বলা আবহমানকাল থেকেই শিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। নৈতিক অথবা নৈতিকতা বিরোধী- যে বিষয়েই মানুষকে প্রেরণা দান ও উদ্বুদ্ধ করণের আকাংখা পোষণ করা হোক না কেন, কিস্‌সা কাহিনীর মাধ্যমে তা সর্বোত্তম পর্যায়ে করা সম্ভব। সর্বশ্রেণীর মানুষকে, বিশেষতঃ শিশুদেরকে নৈতিক শিক্ষা দানের জন্য অতীত কিংবা বর্তমানের সর্বজনমান্য ব্যক্তিবর্গের জীবনী, ঘটনাবলী ও শিক্ষামূলক গল্প কাহিনী শোনানো ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত বই পড়তে দেয়া খুবই ফলদায়ক হয়ে থাকে।

মানব মনের এই স্বভাবগত ঝোঁক ও আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতেই অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থের বিরাট অংশ জুড়ে ইতিহাস ও ঘটনাবলী সন্নিবেশিত হতে দেখা যায়। মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং হাদীস গ্রন্থ সমূহও বহুলাংশে ইতিহাস ও কিস্‌সা কাহিনীতে পরিপূর্ণ। কুরআনের এই ইতিহাস অংশ আলাদাভাবে কাসাসুল কুরআন নামে বিভিন্ন ভাষায় রচিত ও অনুদিত হয়েছে। কিন্তু হাদীসের কিস্‌সা-কাহিনী ও ইতিহাস সম্বলিত অংশ বিশেষতঃ রাসূল (সাঃ) এর পূর্ববর্তী সময়কার ঘটনাবলী আলাদাভাবে বই আকারে সংকলিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অথচ এই ঘটনাবলী সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।

"হাদীসের কিস্‌সা" নামে হাদীসে বর্ণিত ঘটনাবলীর এই ক্ষুদ্র সংকলনটি রচনার পটভূমি এটাই। কিস্‌সাগুলো বিশুদ্ধ হাদীস থেকে সংগ্রহ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। "হাদীসের কিস্‌সা" সর্বস্তরের মানুষ বিশেষতঃ শিশু-কিশোরদের নিকট ইসলামের শিক্ষা বিস্তারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই রচিত। আল্লাহ এ উদ্দেশ্য সফল করুন, এটাই তার দরবারে অধমের সকরুণ প্রার্থনা।

আকরাম ফারুক
ফায়দাবাদ, আযমপুর, ঢাকা
০১-০৯-১৯৯৩

সূচীপত্র

হাদীসের কিস্সা

১। বিশ্বনবীর একটি স্বপ্ন

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রীতি ছিল এই যে, প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর সাহাবীদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কিনা বা কারো কিছু জিজ্ঞাসা আছে কিনা জানতে চাইতেন। কেউ কিছু জানতে চাইলে তিনি তাকে যথাযথ পরামর্শ দিতেন।

একদিন এরূপ জিজ্ঞাসা করার পর কেউ কিছু বলছেনা দেখে তিনি নিজেই বলতে আরম্ভ করলেন। আজ আমি একটি অতি সুন্দর ও আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম, দুই ব্যক্তি আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে আমাকে এক পবিত্র স্থানের দিকে নিয়ে চললো। কিছুদূর গিয়ে দেখলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর অপর এক ব্যক্তি তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়ানো লোকটির হাতে একখানা করাতের মত অস্ত্র রয়েছে। সেই করাত দিয়ে সে বসা লোকটির মাথা চিরে ফেলছে। একবার মুখের দিক দিয়ে করাত ঢুকিয়ে দিয়ে মাথার দিকে কেটে ফেলছে। আবার বিপরীত দিক দিয়েও তদ্রুপ করছে। এক দিক দিয়ে কাটার পর যখন অপর দিক দিয়ে কাটতে যায়, তখন আগের দিক জোড়া লেগে স্বাভাবিক হয়ে যায়। এ অবস্থা দেখে আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি ব্যাপার? তারা বললো, সামনে চলুন।

কিছুদুর গিয়ে দেখলাম, একজন লোক শুয়ে আছে। অপর একজন একখানা ভারী পাথর নিয়ে তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়ানো লোকটি ঐ পাথরের আঘাতে শোয়া লোকটির মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিচ্ছে। পাথরটি সে এত জোরে মারে যে, মাথাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে তা অনেক দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে। অতঃপর লোকটি যেই পাথর কুড়িয়ে আনতে যায়, অমনি ভাঙ্গা মাথা জোড়া লেগে ভালো হয়ে যায়। সে ঐ পাথর কুড়িয়ে এনে পুনরায় মাথায় আঘাত করে এবং মাথা আবার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। এইভাবে ক্রমাগত ভাঙ্গা ও জোড়া লাগার পর্ব চলছে। এই লোমহর্ষক দৃশ্য দেখে আমি আতংকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপারটা কি আমাকে খুলে বলুন। তারা কোন জবাব না দিয়ে পুনরায় বললেন, আগে চলুন। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটি প্রকান্ড গর্ত। গর্তটির মুখ সরু, কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ অত্যন্ত গভীর ও প্রশস্ত। ঐ যেন একটি জ্বলন্ত চুলো, যার ভেতরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আর

তার ভেতরে বহু সংখ্যক নর-নারী দগ্ধীভূত হচ্ছে। আগুনের তেজ এত বেশী যেন তাতে ঢেউ খেলছে। ঢেউয়ের সাথে যখন আগুন উচু হয়ে ওঠে, তখন ঐ লোকগুলো উথলে গর্তের মুখের কাছে চলে আসে। আবার যেই আগুন নীচে নেমে যায়, অমনি তারাও সাথে সাথে নীচে নেমে যায়। আমি আতংকিত হয়ে সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, বন্ধুগণ! এবার আমাকে বলুন ব্যাপারটা কি? কিন্তু এবারও তারা কোন জবাব না দিয়ে বললেন, আগে চলুন।

আমরা সামনে এগুতে লাগলাম। কিছুদূর গিয়ে দেখলাম, একটি রক্তের নদী বয়ে চলছে। তীরে একটি লোক দাঁড়িয়ে। তার কাছে স্তূপীকৃত রয়েছে কিছু পাথর। নদীর মধ্যে একটি লোক হাবুডুবু খেয়ে অতি কষ্টে কিনারের দিকে আসার চেষ্টা করছে। কিনারের কাছাকাছি আসা মাত্রই তীরবর্তী লোকটি তার মুখে এত জোরে পাথর ছুঁড়ে মারছে যে, সে আবার নদীর মাঝখানে চলে যাচ্ছে। এভাবে ক্রমাগত তার হাবুডুবু খেতে খেতে কুলে আসার এবং কুল থেকে পাথর মেরে তাকে মাঝ নদীতে হটিয়ে দেয়ার কার্যক্রম চলছে। এমন নির্মম আচরণ দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে আমার সঙ্গীকে বললামঃ বলুন, এ কি ব্যাপার? কিন্তু এবারও তারা জবাব না দিয়ে বললেন, সামনে চলুন।

আমরা আবার এগুতে লাগলাম। কিছুদূর গিয়ে দেখলাম একটি সুন্দর সবুজ উদ্যান। উদ্যানের মাঝখানে একটি উঁচু গাছ। তার নীচে একজন বৃদ্ধ লোক বসে আছে। বৃদ্ধকে বেষ্টন করে বসে আছে বহুসংখ্যক বালক বালিকা। গাছের অপর পারে আরো এক ব্যক্তি বসে রয়েছে। তার সামনে আগুন জ্বলছে। ঐ লোকটি আগুনের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে। সঙ্গীদ্বয় আমাকে গাছে উঠালেন। গাছের মাঝখানে গিয়ে দেখলাম একটা মনোরম প্রাসাদ। এত সুন্দর ভবন আমি আর কখনো দেখিনি। ঐ ভবনে বালক বালিকা ও স্ত্রী পুরুষ - সকল শ্রেণীর মানুষ বিদ্যমান। সঙ্গীদ্বয় আমাকে আরো ওপরে নিয়ে গেলেন। সেখানে আরো একটি মনোরম গৃহ দেখতে পেলাম। তার ভেতরে দেখলাম শুধু কিছু সংখ্যক যুবক ও বৃদ্ধ উপস্থিত। আমি সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, আপনারা আমাকে নানা জায়গা ঘুরিয়ে অনেক কিছু দেখালেন। এবার এ সবের রহস্য আমাকে খুলে বলুন।

সংগীদ্বয় বলতে লাগলেনঃ প্রথম যে লোকটির মাথা করাত দিয়ে চেরাই করতে দেখলেন; তার মিথ্যা বলার অভ্যাস ছিল। সে যে সব মিথ্যা রটাতো, তা সমগ্র সমাজে প্রসিদ্ধ হয়ে যেতো। কিয়ামত পর্যন্ত তার এরূপ শাস্তি হতে থাকবে।

তারপর যার মাথা পাথরের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হতে দেখলেন, সে ছিল একজন মস্ত বড় আলেম। নিজে কুরআন হাদীস শিখেছিল, কিন্তু তা অন্যকে

শিখায়নি এবং নিজেও তদনুসারে আমল করেনি। হাশরের দিন পর্যন্ত তার এ রকম শাস্তি হতে থাকবে।

তারপর যাদেরকে আগুনের বদ্ধ চুলোয় জ্বলতে দেখলেন তারা ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের এই আযাব চলতে থাকবে।

রক্তের নদীতে হাবুডুবু খাওয়া লোকটি দুনিয়ায় সুদ ও ঘুষ খেতো এবং এতীম ও বিধবার সম্পদ আত্মসাৎ করতো।

গাছের নীচে যে বৃদ্ধকে বালক বালিকা বেষ্টিত দেখলেন, উনি হযরত ইবরাহীম এবং বালক বালিকারা হচ্ছে নাবালক অবস্থায় মৃত ছেলে মেয়ে। আর যাকে আগুন জ্বালাতে দেখলেন, তিনি দোজখের দারোগা মালেক। গাছের ওপর প্রথম যে ভবনটি দেখেছেন, ওটা সাধারণ ঈমানদারদের বেহেস্তের বাড়ীঘর। আর দ্বিতীয় যে প্রাসাদটি দেখেছেন, তা হচ্ছে ইসলামের জন্য আত্মদানকারী শহীদদের বাসস্থান। আর আমি জিবরীল এবং আমার সংগী ইনি মিকাইল। অতঃপর জিবরীল আমাকে বললেন, ওপরের দিকে তাকান। আমি ওপরের দিকে তাকিয়ে একখন্ড সাদা মেঘের মত দেখলাম। জিবরীল বললেন, ওটা আপনার বাসস্থান। আমি বললাম, আমাকে ঐ বাড়ীতে যেতে দিন। জিবরীল বললেন, এখনও সময় হয়নি। পৃথিবীতে এখনো আপনার আয়ুকাল বাকী রয়েছে। দুনিয়ার জীবন শেষ হলে আপনি ওখানে যাবেন।

শিক্ষা ঃ এ হাদীসটিতে রাসূল (সাঃ) কে স্বপ্নের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধের পরকালীন শাস্তির নমুনা দেখানোর বিবরণ রয়েছে। নবীদের স্বপ্ন ওহীর অন্তর্ভূক্ত এবং অকাট্য সত্য। সুতরাং এ শাস্তির ব্যাপারে আমাদের সুদৃঢ় ঈমান রাখা এবং এগুলিকে স্মরণে রেখে এসব অপরাধ থেকে নিবৃত্ত থাকা উচিত। বিশেষতঃ এমন কয়েকটি অপরাধের ওপর এখানে আলোকপাত করা হয়েছে, যা সামাজিক অপরাধের পর্যায়ভূক্ত। অর্থাৎ যা গোটা সমাজকে অন্যায় ও অনাচারের কবলে নিক্ষেপ করে। যেমনঃ মিথ্যাচার, সুদ, ঘুষ ও পরের অর্থ আত্মসাৎ করা এবং ইসলামের প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তা প্রচারে বিমুখ হওয়া ও সে অনুসারে আমল না করা। একজন মিথ্যাবাদী যেমন মিথ্যা গুজব, অপবাদ ও কুৎসা রটিয়ে জনমতকে বিভ্রান্ত, বিপথগামী ও গোটা দেশবাসীকে অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্ররোচিত করে থাকে। একজন আলেম তেমনি তার নিষ্ক্রীয়তা ও বদ আমলী দ্বারা অন্য যে কোন খারাপ লোকের চেয়ে সমাজকে অধিকতর অপকর্মে প্ররোচিত করে থাকে। আর পরের সম্পদ আত্মসাৎকারী এবং সুদখোর ও ঘুষখোর যে গোটা সমাজকে কিভাবে জুলুম, নিপীড়ন ও শোষণ করে তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা।

২। মিরাজের ঘটনা

মিরাজ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর, অলৌ কিক ও শিক্ষামূলক ঘটনা। রাত্রে সংঘটিত হওয়ায় অনেকে একে স্বপ্ন ভেবে বিভ্রান্ত হয়েছে। আসলে এটি একটি বাস্তব ঘটনা। রাসূল (সাঃ) সম্পূর্ণ জাগ্রত ও সচেতন অবস্থায় ফেরেশতাদের সাহচার্যে মক্কা শরীফ থেকে প্রথমে বাইতুল মাকদাস এবং পরে সেখান থেকে সাত আসমান ও তারও উর্দ্ধের জগত পরিভ্রমণ করেন। এই ঘটনা সম্পর্কে নিম্নে সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনা সমূহের সমন্বিত বিবরণ উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সকালে সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে বললেন, "গত রাতে আমার প্রতিপালক আমাকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন। গত রাতে আমি যখন মসজিদুল হারামে ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন তিনজন ফেরেশতা আমার কাছে আসলেন। তারা আমাকে জাগিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে যমযম কূয়ার নিকট রাখলেন। অতঃপর জিবরীল আমার গলা থেকে বুক পর্যন্ত চিরে ফেললেন এবং আমার বুক ও পেটের ভেতর থেকে সমুদয় বস্তু বের করলেন। তারপর নিজ হাতে যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে আমার পেট পবিত্র করলেন। অতঃপর একটি সোনার পাত্র আনা হলো। ঐ পাত্র থেকে ঈমান ও হিকমত নিয়ে বুক ও গলার ধমনীগুলো পূর্ণ করলেন এবং জোড়া লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর আমাকে মসজিদুল হারামের দরজায় আনা হলো। সেখানে জিবরীল আমাকে বহন করে নেয়ার জন্য খচ্চর সদৃশ বোরাক নামক একটি জন্তু পেশ করলেন। জন্তুটি ছিল শ্বেত বর্ণের। আমি যখন তাতে আরোহণ করলাম, তখন তা এত দ্রুত গতিতে চলতে লাগলো যে, তার পেছনের পা দু'টি যে স্থানে স্পর্শ করে, সেখান থেকে সামনের পা যেখানে পড়ে তার দূরত্ব দৃষ্টি সীমার দূরত্বের সমান। এভাবে তা আমাকে বিদ্যুৎবেগে নিয়ে বাইতুল মাকদাসে গিয়ে উপনীত হল। এখানে জিরবীলের ইংগিতে বোরাকটিকে মসজিদুল আকসার দরজার কাছে একটি বিশেষ জায়গায় বেঁধে রাখা হলো । বনী ইসরাইলের নবীগণ এই মসজিদে নামাজ পড়তে এসে তাদের বাহনকে ঐ জায়গায় বেঁধে রাখতেন।

অতঃপর আমি মসজিদুল আকসার ভিতরে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায পড়লাম । কোন কোন বর্ণনা অনুসারে, পূর্ববর্তী সকল নবীগনের ইমাম হয়ে জামায়াতে নামায পড়লাম। তারপর সেখান থেকে উর্ধ্বজগতে আরোহনের প্রস্তুতি শুরু হলো। প্রথমে জিবরীল আমার সামনে দু'টি পেয়ালা পেশ করলেন। এর একটিতে দুধ ও অপরটিতে মদ ছিল। আমি দুধের পেয়ালা গ্রহণ করলাম এবং মদের পেয়ালা ফেরত দিলাম। তা দেখে জিবরীল

বললেন, আপনি দুধের পেয়ালা গ্রহণ করে স্বাভাবিক দ্বীনকে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর উর্ধ্বজগতের ভ্রমণ শুরু হলো। আমাকে ও জিবরীল'কে নিয়ে বোরাক আকাশের দিকে উড়ে চললো। আমরা প্রথম আসমানে পৌঁছলে জিবরীল দ্বাররক্ষী ফেরেশ্‌তাদেরকে দরজা খুলে দিতে বললেন। রক্ষী ফেরেশ্‌তারা জিজ্ঞাসা করলেন, কে? জিবরীল উত্তর দিলেন, আমি জিবরীল। ফেরেশ্‌তারা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সংগে কে? জিবরীল উত্তর দিলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ফেরেশ্‌তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি আল্লাহ তায়ালার নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছেন? জিবরীল বললেন, অবশ্যই । ফেরেশ্‌তারা দরজা খুলতে খুলতে বললেন, এমন ব্যক্তির আগমন মোবারক হোক। আমরা যখন প্রথম আকাশে প্রবেশ করলাম , প্রথমেই হযরত আদম (আঃ) এর সাথে দেখা হলো। জিবরীল আমাকে বললেন ইনি আপনার পিতা আদম আলাইহিস্‌ সালাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, স্বাগতম, হে সম্মানিত পুত্র ও সম্মানিত নবী। অতঃপর দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত পৌঁছলাম। এখানে প্রথম আসমানের মত প্রশ্নোত্তরের পালা অতিক্রম করে দরজা দিয়ে প্রবেশ করলাম। সেখানে হযরত ইয়াহিয়া ও ঈশা (আঃ) এর সাথে সাক্ষাত হলো। জিবরীল আমাকে তাঁদের উভয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং বললেন, আপনিই আগে সালাম করুন। আমি সালাম করলে তাঁরা উত্তর দিয়ে বললেন, "স্বাগতম, হে সম্মানিত ভাই এবং সম্মানিত নবী।" অতঃপর তৃতীয় আসমানে পৌঁছলে পূর্বের মত ঘটনাই ঘটলো এবং সেখানে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত হলো। জিবরীল আমাকে বললেন, আপনিই আগে সালাম করুন। আমি সালাম করলে ইউসুফ (আঃ) সালামের জবাব দিয়ে বললেন, "স্বাগতম, হে সম্মানিত ভাই এবং সম্মানিত নবী।" অতঃপর চতুর্থ আসমানে একই রকমের প্রশ্নোত্তরের পর্ব অতিক্রম করে হযরত ইদরীস আলাইহিস্‌ সালামের সাক্ষাত হলো। অতঃপর পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন আলাইহিস সালাম এবং ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আঃ) এর সাথে একইভাবে সাক্ষাত অনুষ্ঠিত হলো। কিন্তু হযরত মূসার (আঃ) কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। আমি কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আপনার এই অসাধারণ মর্যাদার জন্য আমার ঈর্ষা হচ্ছে যে, আপনার উম্মত আমার উম্মতের তুলনায় বহু গুণ বেশী বেহেশ্‌তবাসী হবে। অতঃপর পূর্বোক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব অতিক্রম করে আমরা যখন সপ্তম আকাশে পৌঁছলাম, তখন সেখানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্‌ সালামের সাথে সাক্ষাত হলো। তিনি সেখানে বাইতুল মা'মুরের দেয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে বসেছিলেন। এই বাইতুল মা'মুরে প্রতিদিন সত্তর হাজার নতুন নতুন ফেরেশ্‌তা প্রবেশ করেন।

তিনি আমার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, "স্বাগতম, হে আমার সম্মানিত সন্তান এবং সম্মানিত নবী।" অতঃপর সেখান থেকে আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় (শাব্দিক অর্থে 'সীমান্তের বরই গাছ' তবে এটি প্রকৃত পক্ষে কী গাছ, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না) নিয়ে যাওয়া হলো।

অতঃপর আল্লাহ আমাকে সম্বোধন করে হুকুম দিলেন যে, আপনার ও আপনার উম্মতের ওপর ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হলো। অতঃপর আমি নিচের দিকে নামতে শুরু করলাম। পথিমধ্যে হযরত মূসা (আঃ) এর সাথে সাক্ষাত হলো। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই মিরাজের সফরে আপনি কি উপঢৌ কন পেলেন? আমি বললাম, ৫০ ওয়াক্তের নামায। তিনি বললেন, আপনার উম্মত এই ভারী বোঝা বহন করতে পারবে না। সুতরাং আপনি আবার ফিরে যান এবং আরো কমিয়ে দেয়ার আবেদন জানান। কেননা আমি আপনার পূর্বে নিজের উম্মাতকে পরীক্ষা করেছি। এ কথা শুনে আমি আল্লাহর দরবারে ফিরে গেলাম এবং মিনতি জানানোর পর ৫ ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হলো। অতঃপর মূসার কাছে আসলে তিনি পুনরায় বললেন, এখনো অনেক বেশী রয়েছে, আবার যান এবং আরো কমিয়ে আনুন। আমি আবার গেলাম। এবারও আরো ৫ ওয়াক্ত কমানো হলো। অতঃপর মূসার পীড়াপীড়িতে আবার যাই এবং আবার ৫ ওয়াক্ত কমিয়ে আনি। এভাবে কয়েকবার গিয়ে কমাতে কমাতে যখন মাত্র ৫ ওয়াক্ত বাকী রইল, তখনও মূসা আমাকে বললেন, আমি বনী ইসরাইলের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আপনার উম্মাত ৫ ওয়াক্তও সহ্য করতে পারবে না। সুতরাং আবার যান এবং কমিয়ে আনুন। কেননা প্রতিবার ৫ ওয়াক্ত কমানো হয়েছে। এবার গেলেও হয়তো ৫ ওয়াক্ত কমানো হবে। তখন আমার হাতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আমি এখন পুনরায় কমানোর আবেদন জানাতে লজ্জা বোধ করছি।"

বুখারী শরীফের রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, শেষ বারেও রাসূল (সাঃ) আল্লাহর কাছে যান এবং বলেন, হে প্রতিপালক! আমার উম্মাতের শরীর, মন, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি খুবই দুর্বল। অতএব আমার প্রতি এ নির্দেশকে আরো হালকা করে দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা বললেনঃ হে মুহাম্মদ! রাসূল (সাঃ) জবাব দিলেন ঃ হে প্রভূ, আমি হাযির। আল্লাহ বললেনঃ আমার নির্দেশের কোন রদবদল হয় না। আমি তোমাদের প্রতি যা ফরয করেছিলাম, তা উম্মুল কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। প্রত্যেক সৎ কাজের নেকী দশগুণ। উম্মুল কিতাব বা লওহে মাহফুযে পঞ্চাশ ওয়াক্তই লেখা থাকলো। শুধু তোমার ও তোমার উম্মতের জন্য তা ৫ ওয়াক্ত করা হলো।

এরপর তিনি নেমে এলেন এবং নিজেকে জাগ্রত অবস্থায় মসজিদুল হারামে উপনীত দেখতে পেলেন।

শিক্ষা ঃ মিরাজের ঘটনার শিক্ষা অনেক। এখানে তার মাত্র কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা তুলে ধরছিঃ

(১) নামায যে ইসলামী ইবাদাতগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা এই ঘটনা থেকে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ অন্যান্য সকল ইবাদাত ফরয করার জন্য একটি ওহী নাযিল করাই যথেষ্ট মনে করেছেন। কিন্তু নামায ফরয করার জন্য কুরআনে ১১৩ বার নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও তাকে যথেষ্ট মনে করেননি। বিশেষভাবে দাওয়াত দিয়ে রাসূল (সাঃ) কে নিজের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নিয়ে এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায এমন ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ফরয করলেন যে, প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায দশটি ওয়াক্তের সমান বলে ধারণা দেয়া হলো। যাতে এর একটি ওয়াক্তও কেউ তরক করার সাহস না করে।

(২) রাসূল (সাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবীকে প্রথমে সালাম করেছেন। এ দ্বারা ইসলামের এই শিক্ষাই প্রতিফলিত হয়েছে যে, কোন জায়গায় আগে থেকে উপস্থিত ব্যক্তি এবং পরে আগত ব্যক্তির মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিরই কর্তব্য প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে সালাম করা, চাই মর্যাদার দিক দিয়ে যিনিই শ্রেষ্ঠ হোন না কেন।

৩। মুমিনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা

হযরত জাবের থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গে যাতুর রিকাব অভিযানে গিয়েছিলাম। একটি ছায়াদার বৃক্ষ দেখে সেখানে রাসূল (সাঃ) বিশ্রাম করতে লাগলেন। আর আমরা কিছু দূরে অবস্থান করতে লাগলাম। সহসা শত্রুপক্ষীয় একজন মোশরেক রাসূল (সাঃ) এর কাছে এল। এ সময়ে রাসূল (সাঃ) ঘুমন্ত ছিলেন এবং তাঁর তরবারী গাছের সাথে ঝুলছিল। সে এসেই রাসূলুল্লাহর তরবারী হাতে নিয়ে বললো, হে মুহাম্মদ! এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? রাসূল (সাঃ) নির্ভীকভাকে দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, আল্লাহ। এ কথা শোনামাত্র লোকটির হাত থেকে তরবারী খসে পড়লো। অমনি রাসূল (সাঃ) তরবারী তুলে নিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ বল, এখন কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? সে বললোঃ আপনি মহানুভবতা প্রদর্শন করুন। রাসূল (সাঃ) বললেনঃ তুমি কি সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছ যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং আমি তাঁর রাসূল? সে বললোঃ না। তবে আমি ওয়াদা করছি যে, আমি কখনো আপনার সাথে যুদ্ধ করবো না এবং

আপনার শত্রুদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করতে আসবো না। রাসূল (সাঃ) তাকে মুক্ত করে দিলেন। সে চলে গেল। নিজ গোত্রের কাছে গিয়ে সে বললোঃ আমি মুহাম্মাদের (সাঃ) সাথে সাক্ষাত করে এলাম। পৃথিবীতে তার চেয়ে উত্তম মানুষ আর নেই।

শিক্ষা ঃ (১) আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান, অবিচল নির্ভরতা ও সৎ সাহস মুমিন ব্যক্তির সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

(২) নাগালে পেয়েও শত্রুর প্রতি মহানুভবতা ও ক্ষমা প্রদর্শন ইসলামের দাওয়াত দাতাদের সবচেয়ে মূল্যবান গুণ। এ দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করা যায়।

(৩) শত্রুকে সব সময় স্বমতে দীক্ষিত করার আশা করা ঠিক নয়। কখনো কখনো তার শত্রুতার তীব্রতা হ্রাস পাওয়াকেই যথেষ্ট মনে করা উচিত। তাকে সংঘর্ষের পথ থেকে সরাতে পারাও একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

৪। মহানবীর আখলাক

[ক] একবার এক সফরে থাকাকালে রাসূল (সাঃ) সাহাবীগণকে একটি ছাগল জবাই করে রান্না করতে বললেন। জনৈক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ছাগলটি জবাই করবো। আর এক সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ছাগলটির চামড়া খসাবো ও গোশত বানাবো। তৃতীয় সাহাবী আবদার করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ছাগলটি রান্না করবো। রাসূল (সাঃ) বললেন, ঠিক আছে। আর আমি রান্নার জন্য জ্বালানী কাঠ কুড়িয়ে আনবো।

সকলে একযোগে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ও কাজটি আমরাই করতে পারবো, আপনার কিছু করতে হবে না। রাসূল (সাঃ) বললেন, আমি জানি, ও কাজটি আমি না পারলেও তোমরা করতে পারবে। কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বসে থাকা পছন্দ করি না। আল্লাহও এটা পছন্দ করেন না যে, তার কোন বান্দা তার সাথীদের মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বসে থাকুক।

শিক্ষাঃ

(ক) মহানবী (সাঃ) এর এই গুণটি পদমর্যাদা সম্পন্নসহ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের আয়ত্ব করা উচিত। অফিস আদালতে বা ঘরোয়া জীবনে সর্বক্ষেত্রে প্রত্যেকের পরস্পরের সহযোগিতা করা উচিত।

[খ] জনৈক ইহুদীর কাছে রাসূল (সাঃ) এর কিছু ঋণ ছিল। লোকটি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ঋণ পরিশোধের জন্য তাড়া দিতে লাগলো। সে মদিনার এক রাস্তায় রাসূল (সাঃ) এর মুখোমুখী হয়ে বললো "তোমরা আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরেরা সময়মত ঋণ পরিশোধ কর না।"

হযরত ওমর তার এই আচরণ দেখে রেগে গিয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি অনুমতি দিন, ওর গর্দান কেটে ফেলি।"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "হে ওমর, আমার এই ইহুদীর জন্য অন্য রকম আচরণের প্রয়োজন ছিল। তুমি বরং ওকে উত্তম পন্থায় ঋণ ফেরত চাইতে বল, আর আমাকে উত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করতে বল।"

অতঃপর তিনি ইহুদীর দিকে ফিরে বললেন, তুমি কালকেই তোমার দেয়া ঋণ ফেরত পাবে।

এদিকে রাসূল (সাঃ) এর ব্যবহারে ইহুদীর মনে ভাবান্তর দেখা দিল। সে এগিয়ে এসে বললোঃ "আমি আসলে আপনার প্রতিক্রিয়া দেখতে চেয়েছিলাম। তাওরাতে শেষ নবীর এ রকম আলামতই লেখা আছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনিই আল্লাহর শেষ রাসূল।" এই বলে সে ইসলাম গ্রহণ করলো।

শিক্ষাঃ

(ক) স্বচ্ছল ব্যক্তির কোন অস্বচ্ছল ব্যক্তিকে ঋণ দেয়া খুবই সওয়াবের কাজ। আর সময় মত ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে তাকে সময় বাড়িয়ে দেয়া আরো মহৎ কাজ। তবে সময় হওয়ার আগে ঋণ পরিশোধের জন্য তাড়া দেয়া এবং কটুক্তি করায় ঋণ দেয়ার সওয়াব কমে যায়।

(খ) কারো আচরণে সহসা উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা কখনো কখনো অকল্পনীয় সুফল পাওয়া যায়।

৫। খলিফার আখলাক

[ক] হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) যেদিন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, সেইদিনই সকালে কাপড়ের বড় একটা পুটুলি মাথায় করে বাড়ী থেকে বেরুলেন। পথে হযরত ওমরের সাথে তার দেখা হলো। ওমর জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে রাসূলুল্লাহর খলীফা, আপনি কোথায় চলেছেন?

হযরত আবু বকর বললেন, বাজারে।

হযরত ওমর বললেন, আপনি মুসলমানদের শাসনভার গ্রহণ করেছেন। এখন বাজারে আপনার কি কাজ?

আবু বকর বললেন, বাজারে না গেলে আমার ছেলেমেয়েকে খাওয়াবো কোথেকে? নিজের ছেলেমেয়েদেরকে যদি আমি খাবার না দিতে পারি তাহলে গোটা দেশের মুসলমানদেরকেও তো খাবার দিতে পারবো না।

ওমর বললেন, চলুন, মসজিদে নববীতে যাই। সবার সাথে আলোচনা করে আপনার ও আপনার পরিবারের খোরপোষের কি ব্যবস্থা করা যায়, যাতে আপনি দেশের কল্যাণ সাধন ও খিলাফতের দায়িত্ব পালনে একাগ্রচিত্তে কাজ করতে পারেন। মসজিদে গিয়ে আবু বকর ও ওমর বাইতুল মালের সচিব আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ ও আরো কিছু সংখ্যক সাহাবীর সাথে বৈঠকে বসলেন এবং ওমর তাঁর অভিমত পেশ করলেন। তখন সকলে আবু বকর ও তার পরিবারের জন্য প্রচলিত নিয়মে যতটা দরকার খোরপোষ বরাদ্দ করলেন।

শিক্ষা ঃ মুসলমানের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরকে এরূপ বেতনভাতা দেওয়া উচিত, যাতে তারা মৌ লিক প্রয়োজনের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থেকে একাগ্র চিত্তে কাজ করতে পারে এবং কোন দূর্নীতিতে লিপ্ত হতে বাধ্য না হয়।

[খ] খলীফা হওয়ার পর হযরত ওমর (রাঃ) রাত জেগে এই বলে কাঁদতেন যে, আল্লাহর কসম, আমার শাসনকালে ছাগলও যদি নদীর কিনারে অযত্নে পড়ে থাকে, তবে আমার আশংকা হয় যে, কিয়ামতের দিন তার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

একবার তিনি একজন সঙ্গীকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক মহিলা তাকে ডেকে থামালো। তারপর বললো, একদিন তুমি শিশু ওমর ছিলে, এখন তুমি বয়স্ক ওমর হয়েছ। কাল তুমি ওমর ছিলে, আজ হয়েছ মুসলমানদের খলীফা। হে ওমর, আল্লাহ তোমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন, সে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।

মহিলার কথা শুনে ওমর অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। খলীফার সঙ্গী মহিলাকে বললো, ওহে আল্লাহর বান্দী, একটু সংযত হয়ে কথা বলুন। যিনি এই পৃথিবীতে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, তাঁকে আপনি কাঁদিয়ে ফেললেন।

ওমর বললেন, "ওহে আমার সহযাত্রী, এ মহিলাকে বলতে দাও। উনি হচ্ছেন সেই খাওলা বিনতে হাকীম, যার কথা স্বয়ং আল্লাহও শুনেছেন এবং পবিত্র কুরআনে তা বর্ণনাও করেছেন, "হে রাসূল, সেই মহিলার কথা আল্লাহ শুনেছেন যে তোমার সাথে তার স্বামীর ব্যাপারে বাকবিতন্ডা করে এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করে। আল্লাহ তোমাদের উভয়ের আলাপ আলোচনা শ্রবণ করেন।" সুতরাং খাত্তাবের পুত্র ওমরকে তার কথা শুনতেই হবে।"

শিক্ষাঃ শাসকদের কর্তব্য প্রজাদের যাবতীয় অভিযোগ-অনুযোগ ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করা ও যথাসাধ্য প্রতিকার করা।

৬। হযরত আবু বকরের খোদাভীতি

সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) এর একজন গোলাম ছিল। সে হযরত আবু বকরকে মুক্তিপণ হিসাবে কিছু অর্থ দেয়ার শর্তে মুক্তি চাইলে তিনি তাতে সম্মত হন। অতঃপর সে প্রতিদিন তার মুক্তিপণের কিছু অংশ নিয়ে আসতো। হযরত আবু বকর তাকে জিজ্ঞেস করতেন, কিভাবে এটা উপার্জন করে এনেছ? সে যদি সন্তোষজক জবাব দিত তবে তা গ্রহণ ও ভোগ করতেন, নচেত করতেন না। একদিন সে রাতের বেলায় তাঁর জন্য কিছু খাবার জিনিস নিয়ে এল। সেদিন তিনি রোযা ছিলেন। তাই তাকে ঐ খাদ্যের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ভুলে গেলেন এবং এক লোকমা খেয়ে নিলেন। তাঁরপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ খাবার তুমি কিভাবে সংগ্রহ করেছ? সে বললোঃ আমি জাহেলিয়াত আমলে লোকের ভাগ্যগণনা করতাম। আমি ভালো গণনা করতে পারতাম না। কেবল ধোকা দিতাম। এ খাদ্য সেই ভাগ্যগণনার উপার্জিত অর্থ দ্বারা সংগ্রহীত। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ কী সর্বনাশ! তুমি তো আমাকে ধ্বংস করে ফেলার উপক্রম করেছ। তারপর গলায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বমিতে খাওয়া জিনিস বেরুলোনা। তখন তিনি পানি চাইলেন। পানি খেয়ে খেয়ে সমস্ত ভুক্ত দ্রব্য পেট থেকে বের করে দিলেন। লোকেরা বললোঃ আল্লাহ আপনার ওপর দয়া করুন। ঐ এক লোকমা খাওয়ার কারণেই কি এত সব? হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ ঐ খাদ্য বের করার জন্য যদি আমাকে মৃত্যুবরণও করতে হতো, তবুও আমি বের করে ছাড়তাম। কেননা আমি শুনেছি, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ "যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গড়ে ওঠে তার জন্য দোজখের আগুনই উত্তম।" তাই আমি আশংকা করছিলাম যে এই এক লোকমা খাদ্য দ্বারা আমার শরীরের কিছু অংশ গঠিত হতে পারে।

শিক্ষা ঃ আখেরাতের কঠিন ও অবধারিত শাস্তির কথা মনে রেখে সব সময় হালাল-হারাম বাছ-বিচার করে চলা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

৭। হযরত আবু বকরের (রাঃ) জনসেবা

হযরত আবু বকর (রাঃ) কে খলীফা নিযুক্ত করা হয়েছে একথা যখন ঘোষণা করা হলো তখন মহল্লার একটা গরীব মেয়ে অস্থির হয়ে পড়লো।

লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো যে, আবু বকর (রাঃ) খলীফা হয়েছেন, তাতে তোমার কি অসুবিধা হয়েছে। মেয়েটি বললো, "আমাদের ছাগলগুলোর কী হবে?" জিজ্ঞাসা করা হলো,"তার অর্থ?" সে বললো, এখনতো উনি খলীফা হয়ে গেছেন। আমাদের ছাগল ক'টার দেখাশুনাই বা কে করবে, ওগুলোর দুধই বা কে দুইয়ে দেবে ? এ কথার কোন জবাব দেয়া কারো পক্ষে সম্ভব হলো না। কিন্তু পরদিন খুব ভোরে মেয়েটি অবাক হয়ে দেখলো যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) যথাসময়ে তাদের বাড়ীতে গেছেন এবং দুধ দোহাচ্ছেন। আর যাওয়ার সময় বলে গেলেন, "মা, তুমি একটুও চিন্তা করো না। আমি প্রতিদিন এভাবেই তোমার কাজ করে দিয়ে যাবো।" তাবাকাতে ইবনে সা'দে আছে যে, মেয়েটির বিচলিত হওয়ার খবর শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছিলেন, আমি আশা করি খেলাফতের দায়িত্ব আমার আল্লাহর বান্দাদের সেবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। আমি এখনো ঐ দরিদ্র মেয়েটির ছাগল দোহন করে দিয়ে আসবো ইনশা আল্লাহ্।

ইবনে আসাকের লিখেছেন যে, আবু বকর (রাঃ) খেলাফতের পূর্বে তিন বছর এবং খেলাফতের পরে এক বছর পর্যন্ত মহল্লার দরিদ্র পরিবারগুলোর ছাগল দোহন করে দিতেন।

আবু সালেহ গিফারী বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন খলীফা হন তখন মদীনার এক অন্ধ বুড়ীর বাড়ীর কাজকর্ম হযরত ওমর (রাঃ) স্বহস্তে করে দিতেন। তার প্রয়োজনীয় পানি এনে দিতেন ও বাজার সওদা করে দিতেন।

একদিন হযরত ওমর সেখানে গিয়ে দেখেন বুড়ীর বাড়ী একদম পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। কলসিতে পানি আনা হয়েছে, বাজারও করা হয়েছে। তিনি ভাবলেন, বুড়ীর কোন প্রতিবেশী হয়তো কাজগুলো করে দিয়ে গেছে। পরদিনও দেখলেন একই অবস্থা। সব কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল। এবার হযরত ওমরের কৌতুহল হলো। ভাবলেন, এই মহানুভব লোকটি কে তা না দেখে ছাড়বেন না।

একদিন নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে এসে লুকিয়ে রইলেন। দেখলেন অতি প্রত্যুষে এক ব্যক্তি দ্রুত গতিতে বুড়ীর বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে। হযরত ওমর বুঝতে পারলেন যে, এই ব্যক্তিই সেই মহান ব্যক্তি যিনি তারও আগে এসে বুড়ীর সমস্ত কাজ সেরে দিয়ে যান। ব্যক্তিটি বুড়ীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে যখন কাজ শুরু করে দিল তখন হযরত ওমর যেয়ে দেখেন, ইনি আর কেউ নয় স্বয়ং খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)। হযরত ওমর বললেন,

হে রাসূলের প্রতিনিধি! মুসলিম জাহানের শাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি 'এই বুড়ীর তদারকীও চালিয়ে যেতে চান নাকি? সকল নেক কাজেই কি আপনি আমাদের সবাইকে পেছনে ফেলে দেবেন? হযরত আবু বকর জবাব না দিয়ে একটু মুচকি হেসে যথারীতি কাজ করতে লাগলেন।

শিক্ষাঃ সাধারণতঃ উচ্চ পদস্থ লোকেরা স্বহস্তে অন্যের কাজ করে দেয়া দূরে থাক, নিজের কাজও করতে চায়না। চাকর চাকরাণী ও যন্ত্রের মাধ্যমে সব কাজ সারতে চেষ্টা করে। হযরত আবু বকরের হাতে দাসদাসীর অভাব ছিল না। উপকারের কাজটা কোন ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিয়েও করাতে পারতেন। কিন্তু আখেরাতের বাড়তি সওয়াবের আশায় এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করার মানসে এভাবে স্বহস্তে অন্যের সেবা করেছেন সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদে আসীন থাকা অবস্থায়। সকল যুগের মুসলমানদের সকল পর্যায়ের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গের জন্য এটি একটি চমকপ্রদ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

৮। হযরত আবু বকর (রাঃ) অনুশোচনা

এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কে গালি দিচ্ছিল। সেখানে রাসূল (সাঃ) উপস্থিত ছিলেন। আবু বকর (রাঃ) কোন বাদ প্রতিবাদ না করে নীরবে গালি শুনতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি ঐ ব্যক্তিকে তারই দেয়া একটি গালি ফিরিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ রাসূল (সাঃ) এর মুখে অসন্তোষের চিহ্ন ফুটে উঠলো। তিনি উঠে বাড়ীতে চলে গেলেন। আবু বকর (রাঃ) ঘাবড়ে গেলেন । তিনি কালবিলম্ব না করে রাসূল (সাঃ) এর কাছে ছুটে গেলেন এবং বললেন, "হে রাসূল! লোকটি যখন আমাকে গালি দিচ্ছিল আপনি চুপচাপ শুনছিলেন। যেই আমি জবাব দিলাম অমনি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠে চলে এলেন।"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "শোন আবু বকর, যতক্ষণ তুমি চুপ ছিলে এবং ধৈর্য ধারণ করছিলে, ততক্ষণ তোমার সাথে আল্লাহর একজন ফেরেশতা ছিল, যিনি তোমার পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছিলেন। কিন্তু যখন তুমি নিজেই জবাব দিতে শুরু করলে তখন ঐ ফেরেশতা চলে গেলেন এবং মাঝখানে এক শয়তান এসে গেল। সে তোমাদের উভয়ের মধ্যে গোলযোগ তীব্রতম করতে চাইছিল। হে আবু বকর! মনে রেখ কোন বান্দার ওপর যদি যুলুম ও বাড়াবাড়ি হতে থাকে এবং সে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তা ক্ষমা করতে থাকে এবং কোন প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত থাকে, তবে আল্লাহ যুলুমকারীর বিরুদ্ধে তাকে সর্বাত্মক সাহায্য করে।"

হযরত আবু বকর অনুতপ্ত হলেন যে, ধৈর্যহারা হয়ে তিনি আল্লাহর ফেরেশতার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলেন।

শিক্ষাঃ এই ঘটনা আমাদের সামনে ধৈর্যের শিক্ষাই নতুন করে তুলে ধরেছে। রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ 'ধৈর্য এমন একটা গাছ, যার সারা গায়ে কাঁটা, কিন্তু এর ফল অত্যন্ত মজাদার।' সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, চরম উস্কানীর মুখেও ধৈর্য ধারণ করা এবং ক্রোধ সম্বরণ করা। উস্কানীর মুখে ক্রোধ সম্বরণের সহজ পন্থা হলো সালাম দিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করা, নচেত ঠান্ডা পানি দিয়ে ওযূ করা।

৯। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতা

হযরত ওমর (রাঃ) তখন মুসলিম জাহানের খলিফা। একবার রাতের বেলা তিনি একটি সুরেলা আওয়াজ শুনতে পেলেন। একটি লোক গান গাইছিল। তাঁর সন্দেহ হলো। তিনি প্রাচীরে উঠে দেখলেন, পাশের ঘরে এক পুরুষ বসে আছে। তার পাশে মদ ভর্তি একটি পাত্র এবং গ্লাস। অদূরে এক মহিলাও রয়েছে। খলিফা চিৎকার করে বললেন, ওরে আল্লাহর দুশমন! তুই কি মনে করেছিস যে, তুই আল্লাহর নাফরমানী করবি, আর তিনি তোর গোপন অভিসারের কথা ফাঁস করবেন না? জবাবে সে বললো ঃ "আমীরুল মুমিনীন, তাড়াহুড়া করবেন না। আমি যদি একটি গুনাহ করেও থাকি, তবে আপনি করেছেন তিনটি গুনাহ। আল্লাহ তায়ালা মানুষের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু আপনি দোষ-ত্রুটি খুঁজেছেন। আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন কারো বাড়ীতে ঢুকলে দরজা দিয়ে ঢুকতে, কিন্তু আপনি প্রাচীর ডিংগিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছেন। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে, নিজের বাড়ী ছাড়া অন্যের বাড়ীতে অনুমতি না নিয়ে ঢুকোনা। কিন্তু আপনি আমার অনুমতি ছাড়াই আমার বাড়ীতে প্রবেশ করেছেন।"

এ জবাব শুনে হযরত ওমর নিজের ভুল স্বীকার করলেন এবং তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না। তবে তার কাছ থেকে অংগীকার আদায় করলেন যে, সে পাপের পথ ত্যাগ করে সৎ পথে ফিরে আসবে।

শিক্ষা ঃ অন্যায়ের প্রতিরোধে সক্রিয় থাকা প্রত্যেক মুসলিমের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনেও অনেক সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়া প্রয়োজন। নচেত প্রতিরোধের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। হযরত ওমরের (রাঃ) এই ঘটনা থেকে সেই শিক্ষাই পাওয়া যায়।

১০। হযরত ওমর (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণ

ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরাইশ প্রতিনিধি আমর ইবনুল আ'স ও আবদুল্লাহ ইবনে রবীয়া' যখন আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এল এবং সেখানে হিজরত করে যাওয়া মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলো না, তার অল্প কয়েকদিন পরই ওমর বিন খাত্তাবের ন্যায় দুর্দান্ত সাহসী ও প্রতাপশালী ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ও হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণে রাসূল (সাঃ) এর সাহাবীগণের মনোবল যথেষ্ট বেড়ে যায় এবং তারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অনুভব করেন। এর আগে তাঁরা কাবার চত্তরে নামায পড়ারও সাহস পেতেন না। ইসলাম গ্রহণের পর ওমর ঝুঁকি নিয়ে কাবার চত্তরে নামায পড়েন এবং তাঁর সাথে অন্যান্য সাহাবীগণও নামায পড়েন।

উম্মে আবদুল্লাহ্ বিনতে আবি খাসয়ামা (রাঃ) বলেন যে, আমরা একে একে সবাই আবিসিনিয়ায় চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমার স্বামী আমের তখন একটা পারিবারিক কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। সহসা ওমর ইবনুল খাত্তাব এসে আমার কাছে দাঁড়ালেন। তখনো তিনি মোশরেক। তার জুলুম অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ ছিলাম। ওমর বললেনঃ হে উম্মে আবদুল্লাহ! আপনারা বুঝি বিদায় হচ্ছেন? আমি বললামঃ হাঁ, আল্লাহর কসম। আল্লাহর পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়বো। তোমরা আমাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছ, অনেক নির্যাতন চালিয়েছ। আল্লাহ এ অবস্থা থেকে আমদেরকে উদ্ধার করবেন। ওমর বললেনঃ "আল্লাহ্ আপনাদের সাথী হোন।" তার কথায় এমন একটা সহানুভূতির ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল যা আর কখনো দেখিনি। এরপর ওমর ইবনুল খাত্তাব চলে গেলেন। তবে আমার মনে হচ্ছিল, আমাদের দেশ ত্যাগের খবরে তিনি মর্মাহত। কিছুক্ষণ পর আমের প্রয়োজন সেরে ঘরে ফিরে এলো। আমি তাকে বললামঃ "ওহে আবদুল্লাহর বাবা! এইমাত্র ওমর এসেছিল। আমাদের প্রতি তার সেকি সহানুভূতি ও উদ্বেগ, তা যদি তুমি দেখতে!" আমের বললেনঃ তুমি কি তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আশান্বিত? আমি বললামঃ হাঁ। সে বললোঃ খাত্তাবের গাধা ইসলাম গ্রহণ করলেও তুমি যাকে দেখেছ সে (খাত্তাবের ছেলে ওমর) ইসলাম গ্রহণ করবে না। ইসলামের প্রতি ওমরের যে প্রচন্ড বিদ্বেষ, হঠকারিতা ও একগুয়েমির প্রকাশ দেখা যাচ্ছিল, তার দরুণ আমের হতাশ হয়েই অনুরূপ কথা বলেছিল।

হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের কারণ ঃ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত আছে যে, 'ওমরের বোন ফামিতা বিনতে খাত্তাব ও তার স্বামী সাঈদ বিন

যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েল ওমরের আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা ওমরের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। মক্কার আর এক ব্যক্তি নাঈম বিন আবদুল্লাহ আন নাহহামও একইভাবে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। ওমরের স্বগোত্রীয় অর্থাৎ বনু আদি বিন কা'বের অন্তর্ভূক্ত এই ব্যক্তি নিজ গোত্রের অত্যাচারের ভয়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেননি। খাব্বার ইবনুল আরাত (বনু তামীম বংশোদ্ভূত এই সাহাসী জাহেলিয়াতের যুগে তরবারী তৈরির পেশায় নিয়োজিত ছিলেন এবং বনু খোযায়া গোত্রের উম্মে আনমার নাম্মী মহিলার মুক্ত গোলাম ছিলেন) নামক অপর এক নওমুসলিম গোপনে ফাতিমা বিনতে খাত্তাবকে কুরআন পড়িয়ে যেতেন। একদিন ওমর ইবনুল খাত্তাব উন্মুক্ত তরবারী হাতে নিয়ে রাসূল (সাঃ) ও তাঁর একদল সাহাবীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, প্রায় ৪০ জন নারী ও পুরুষ সাহাবীসহ রাসূল (সাঃ) সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী একটা ঘরে সমবেত রয়েছেন। রাসূল (রাঃ) এর সাথে তাঁর চাচা হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব, আবু বকর সিদ্দীক বিন আবু কুহাফা ও আলী বিন আবু তালেবসহ এমন কিছু সংখ্যক মুসলমান ছিলেন যারা রাসূল (সাঃ) এর সাথে মক্কায় অবস্থান করছিলেন এবং আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের সাথে হিজরত করেননি।' পথে নাঈম বিন আবদুল্লাহর সাথে ওমরের দেখা হলো। তিনি বললেন, কোথায় চলেছ ওমর? ওমর বললেন, "ধর্মচ্যুত মুহাম্মাদের সন্ধানে চলেছি, যে কুরাইশ বংশে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তাদের বুদ্ধিমানদেরকে বোকা সাব্যস্ত করেছে, তাদের অনুসৃত ধর্মের নিন্দা করেছে এবং তাদের দেবদেবীকে গালাগাল করেছে। আমি ওকে হত্যা করবো।" নাঈম বললেন, "ওহে ওমর, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হয়েছ। তুমি কি মনে কর, মুহাম্মদকে হত্যা করার পর বনু আবদ মানাফ তোমাকে ছেড়ে দেবে আর তুমি পৃথিবীর ওপর অবাধে বিচরণ করে বেড়াতে পারবে? তোমার কি উচিত নয় আগে নিজের পরিবার পরিজনের দিকে মনোনিবেশ করা এবং তাদেরকে শোধরানো?" ওমর বললেন : "আমার পরিবার পরিজনের কি হলো?" নাঈম বললেন, "তোমার ভগ্নিপতি ও চাচাতো ভাই সাঈদ বিন যায়েদ বিন আমর এবং তোমার বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব। আল্লাহর কসম, তাঁরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মুহাম্মদের ধর্ম অনুসরণ করছে। পারলে তাদেরকে সামলাও।" ওমর

তৎক্ষণাৎ ফিরে গেলেন তার বোন ও ভগ্নিপতির বাড়ির দিকে। যখন তিনি তাদের কাছে রওনা হলেন তখন তাদের কাছে খাব্বাব ইবনুল আরাত ছিলেন। তিনি তাদেরকে পবিত্র কুরআনের একটি অংশ হাতে নিয়ে পড়াচ্ছিলেন। এই অংশটিতে ছিল সূরা ত্বা-হা। ওমরের আওয়াজ শুনে খাব্বাব গা ঢাকা দিলেন। তিনি ঘরের কোন এক অংশে লুকিয়ে রইলেন। আর ফাতেমা কুরআনের অংশটি নিজের উরুর নিচে চাপা দিয়ে রাখলেন। ঘরের কাছাকাছি পৌঁছার পর ওমর খাব্বাবের পড়ার আওয়াজ শুনেছিলেন। ঘরে ঢুকে তিনি বললেন, "একটা দুর্বোধ্য বাণী আবৃত্তি করার আওয়াজ শুনছিলাম। ওটা কি?" তারা উভয়ে বললেন, "না, আপনি কিছুই শোনেননি।" ওমর বললেন, "নিশ্চয়ই শুনেছি। আর আল্লাহর কসম, এটাও জেনেছি যে, তোমরা দু'জনে মুহাম্মাদের অনুসারী হয়ে গেছ।" কথাটা বলে ভগ্নিপতি সাঈদকে প্রবলভাবে জাপটে ধরলেন। তার বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব স্বামীকে বাঁচাতে ছুটে গেলে তিনি তাকে মেরে জখম করে দিলেন। এই কান্ড ঘটানোর পর তার বোন ও ভগ্নিপতি একযোগে তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। এখন যা করতে চান করুন।" ওমর যখন দেখলেন তার বোনের শরীর রক্তাক্ত, তখন অনুতপ্ত হলেন। তিনি স্বীয় বোনকে বললেন, "আমাকে এই পুস্তিকাটি দাও, যা এইমাত্র তোমাদেরকে পড়তে শুনলাম। আমি একটু দেখবো মুহাম্মাদ কি জিনিস নিয়ে এসেছে।" ওমর লেখাপড়া জানতেন। তিনি এ কথা বললে তাঁর বোন তাঁকে বললো, "আমার ভয় হয় আপনি নষ্ট করে ফেলেন কিনা। ওমর বললেন, "ভয় পেয়ো না!" অতঃপর তিনি নিজের দেবদেবীর শপথ করে বললেন, "ওটি আমি পড়েই তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো।" ওমরের এ কথাটা শুনে ফাতিমার মনে আশার সঞ্চার হলো যে, ওমর ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। তিনি বললেন, "ভাইজান! আপনি যে অপবিত্র! কেননা আপনি এখনো মোশরেক। অথচ এই পবিত্র গ্রন্থকে পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া স্পর্শ করতে পারে না।" ওমর তৎক্ষণাৎ উঠে চলে গেলেন এবং গোসল করে এলেন। এবার ফাতিমা তাকে পুস্তিকাখানি দিলেন। তাতে সূরা ত্বা-হা লিখিত ছিল। তিনি তা পড়লেন। প্রথম অংশটি পড়েই বললেনঃ "আহ্! কি সুন্দর কথা! কী মহৎ বাণী!" তাঁর এ উক্তি শুনে খাব্বাব তাঁর সামনে বেরিয়ে এলেন। তিনি তাঁকে বললেন, "হে ওমর! আল্লাহর কসম, আমার

মনে আশার সঞ্চার হচ্ছে যে আল্লাহ হয়তো আপনাকে তাঁর নবীর দাওয়াত গ্রহণের জন্য মনোনীত করেছেন। আমি গতকাল শুনলাম রাসূল (সাঃ) দোয়া করছেন, "হে আল্লাহ! তুমি আবুল হিকাম বিন হিশাম অথবা ওমর ইবনুল খাত্তাবের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি কর। অতএব, আল্লাহর দিকে অগ্রসর হোন, আল্লাহর দিকে অগ্রসর হোন হে ওমর।"

ওমর বললেন, "হে খাব্বাব! আমাকে মুহাম্মাদের সন্ধান দাও। আমি তাঁর কাছে যেয়ে ইসলাম গ্রহণ করবো।" খাব্বাব বললেন, "তিনি সাফা পাহাড়ের নিকট একটি বাড়িতে আছেন। সেখানে তাঁর সাথে তাঁর একদল সাহাবী রয়েছেন।" ওমর তাঁর তরবারী আগের মতই খোলা অবস্থায় ধরে নিয়ে রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীদের কাছে চললেন। সেখানে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লেন। ভেতর থেকে তাঁর আওয়াজ শুনে রাসূল (সাঃ) এর জনৈক সাহাবী দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভেতর থেকে তাকালেন। দেখলেন ওমর মুক্ত তরবারী হাতে দাঁড়িয়ে। তিনি শংকিত চিত্তে রাসূল (সাঃ) এর কাছে ফিরে গিয়ে বললেনঃ "হে রাসূলুল্লাহ! এ যে ওমর ইবনুল খাত্তাব একেবারে নগ্ন তরবারী হাতে!" হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব বললেন, "ওকে ভেতরে আসার অনুমতি দিন। সে যদি কোন শুভ কামনা নিয়ে এসে থাকে, আমরা তার প্রতি বদান্যতা দেখাবো। আর যদি কোন কু-বাসনা নিয়ে এসে থাকে তাহলে ওর তরবারী দিয়েই ওকে হত্যা করবো।" রাসূল (সাঃ) বললেন, "ওকে ভেতরে আসতে দাও।" উক্ত সাহাবী তাকে ভেতরে আসতে দিলেন। রাসূল (সাঃ) নিজে উঠে তার কাছে এগিয়ে গেলেন এবং নিজের কক্ষে নিয়ে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। রাসূল (সাঃ) তাঁর পাজামা বাঁধার জায়গা অথবা যেখানে চাদরের দুই কোণা মিলিত হয়, সেখানটা ধরে তাকে প্রবল জোরে আকর্ষণ করলেন এবং বললেন, "কি হে খাত্তাবের পুত্র! তোমার এখানে আগমন ঘটলো কিভাবে! আমার তো মনে হয়, আল্লাহ তোমার ওপর কোন বিপর্যয় না নামানো পর্যন্ত তুমি ফিরবে না।" ওমর বললেন, "হে রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার কাছে এসেছি আল্লাহর ওপর, তাঁর রাসূলের ওপর ও আপনার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু আসে তার ওপর ঈমান আনবার জন্য।" এ কথা শোনামাত্র রাসূল (সাঃ) এমন জোরে "আল্লাহু আকবার" বলে উঠলেন যে, ঐ ঘরের ভেতরে রাসূল (সাঃ) এর যে কয়জন সাহাবী ছিলেন সবাই বুঝলেন যে, ওমর ইসলাম গ্রহণ করেছে।

এরপর রাসূল (সাঃ) এর সাহাবীগণ যার যার জায়গায় চলে গেলেন। হামযার পর ওমর (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণে তাদের মনোবল ও আত্মমর্যাদা বেড়ে গেল। তারা নিশ্চিত হলেন যে, ওঁরা দুজন রাসূল (সাঃ) এর প্রতিরক্ষায় অবদান রাখবেন এবং ইসলামের দুশমনদের মোকাবিলায় মুসলমানদের সহযোগিতা করবেন।

এটি তাঁর ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বর্ণনা।

ওমর ইবনুল খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আতা ও মুজাহিদের বর্ণনা ঃ ইবনে ইসহাক বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আবি নুজাইহ আল মাক্কী স্বীয় শিষ্য আতা, মুজাহিদ অথবা অন্যান্য বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ওমর (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ব্যাপক জনশ্রুতি রয়েছে যে তিনি স্বয়ং নিম্নরূপ বলতেনঃ "আমি ইসলামের কট্টর বিরোধী ছিলাম। জাহেলী যুগে আমি মদের খুব ভক্ত ছিলাম। মদ পেলে খুবই আনন্দিত হতাম। আমাদের একটা মজলিশ বসতো উমার বিন আবদ বিন ইমরান আল মাখযুমীর পারিবারিক বাসস্থানের নিকটস্থ খাজওয়ারা নামক স্থানে। সেখানে কুরাইশের বহু লোক সমবেত হতো। একদিন রাতে ঐ আসরে আমার সহযোগীদের উদ্দেশ্যে গেলাম। কিন্তু তাদের কাউকেই পেলাম না। এরপর ভাবলাম, মক্কার অমুক মদ বিক্রেতার কাছে গেলে হয়তো মদ খেতে পারতাম। তার উদ্দেশ্যে গেলাম। কিন্তু তাকে পেলাম না। এরপর মনে মনে বললাম, কা'বা শরীফে গিয়ে যদি সাতবার অথবা সত্তুরবার তওয়াফ করতাম, মন্দ হতো না। অতঃপর কা'বা শরীফে তওয়াফ করার জন্য মসজিদুল হারামে উপনীত হলাম। সেখানে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তখনো সিরিয়ার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। নিজের ও সিরিয়ার মাঝখানে কা'বা শরীফকে রাখতেন। রূকনে আসওয়াদ ও রূকনে ইয়ামানীর মাঝে বসে তিনি নামায পড়তেন। তাঁকে দেখেই আপন মনে বললাম, আল্লাহর কসম, আজকের রাতটা যদি মুহাম্মাদের (সাঃ) আবৃত্তি শুনে কাটিয়ে দিতাম এবং সে কি বলে তা অবহিত হতাম, তাহলেও কাজ হতো। কিন্তু সেই সাথে এটাও ভাবলাম যে, মুহাম্মাদের (সাঃ) খুব কাছে গিয়ে যদি শুনি তাহলে তিনি ভয় পেয়ে যাবেন। তাই হাজরে আসওয়াদের দিক থেকে এলাম, কা'বা শরীফের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম। রাসূল (সাঃ) তখনো যথারীতি দাঁড়িয়ে নামাযে কুরআন পাঠ করে যাচ্ছেন। অবশেষে

আমি তাঁর ঠিক সামনে কা'বার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। যখন কুরআন শুনলাম, আমার মন নরম হয়ে গেল। আমি কেঁদে দিলাম। ইসলাম আমার মনমগজ দখল করে ফেললো। রাসূল (সাঃ) নামায শেষ করে চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমি ওখানেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি যখন কা'বা থেকে যেতেন, ইবনে আবি হুসাইনের বাড়ির কাছ দিয়ে যেতেন। এই বাড়ী ছিল তার সাফা ও মারওয়ার দৌ ড়েরও শেষ সীমা। সেখান থেকে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের বাড়ী এবং আজহার বিন আবদ আওফ আয্যুহরীর বাড়ির মাঝখান দিয়ে, তারপর আখনাস বিন শুরাইকের বাড়ী হয়ে নিজের বাড়ীতে চলে যেতেন। দারুর রাকতাতে ছিল রাসূল (সাঃ) এর বাড়ী। এই জায়গাটি ছিল আবু সুফিয়ানের ছেলে মুয়াবীয়ার মালিকানাধীন। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ) এর পিছু পিছু চলতে লাগলাম। যখন তিনি আব্বাসের বাড়ী ও ইবনে আযহারের বাড়ীর মাঝখানে পৌঁছলেন, তখন তাঁকে গিয়ে ধরলাম। আমার আওয়ায শুনেই রাসূল (সাঃ) আমাকে চিনে ফেললেন। রাসূল (সাঃ) মনে করলেন আমি তাঁকে কষ্ট দিতে এসেছি। তাই তিনি আমাকে একটা ধমক দিলেন। ধমক দিয়েই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে খাত্তাবের পুত্র! এ মুহূর্তে তুমি কি উদ্দেশ্যে এসেছ?" আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং তাঁর কাছে যা কিছু আল্লাহর কাছ থেকে আসে, তার প্রতি ঈমান আনার উদ্দেশ্যে।" এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ) আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। তারপর বললেন, "হে ওমর! আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত করেছেন।" তারপর তিনি আমার বুকে হাত বুলালেন এবং আমি যাতে ইসলামের ওপর অবিচল থাকি সে জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর রাসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে বিদায় হলাম এবং তিনি নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করলেন।"

ইবনে ইসহাক বলেনঃ ওমরের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে উপরোক্ত দুই ধরনের বিবরণের কোনটি সঠিক তা আল্লাহই ভালো জানেন।

ইসলামের ওপর ওমরের দৃঢ়তাঃ ইবনে ইসহাক বলেনঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমারের মুক্ত গোলাম না'ফে ইবনে উমার থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা ওমর যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন জিজ্ঞাসা করলেন যে, কুরাইশের কোন্ ব্যক্তি সর্বাধিক প্রচার মুখর? তাকে বলা হলো, জামীল বিন মুয়াম্মার আল-জুমৃহী। তিনি তৎক্ষণাৎ তার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার বলেনঃ আমি তাঁর পেছনে পেছনে ছুটলাম এবং তিনি কি করেন দেখতে লাগলাম। তখন আমি একজন বালক হলেও যা কিছু দেখি সবই বুঝতে পারি। ওমর (রাঃ) জামীলের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ "হে জামীল! তুমি জান, আমি ইসলাম গ্রহণ ও মুহাম্মাদের ধর্মে প্রবেশ করেছি।" ইবনে ওমর বলেনঃ জামীল তার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে চাদর গুটিয়ে হাটতে লাগলো। ওমর (রাঃ) তার পিছু পিছু চললেন। আমিও আমার পিতার পিছু পিছু চললাম। চলতে চলতে মসজিদুল হারামের দরজার ওপর পৌঁছে সে বিকট চিৎকার করে বললো, "হে কুরাইশ জনমন্ডলী! শুনে নাও, ওমর ধর্মচ্যুত হয়ে গেছে।" এ সময় কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কা'বার চত্ত্বরে তাদের আড্ডায় বসেছিল। ওমর তার পেছনে দাঁড়িয়ে বললেনঃ "জামীল মিথ্যা বলেছে, আমি ধর্মচ্যুত হইনি, ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) তার বান্দা ও রাসূল।" সঙ্গে সঙ্গে সকলে তার দিকে মারমুখী হয়ে ছুটে গেল। ওমর ও কুরাইশ জনতার মধ্যে লড়াই চললো দুপুর পর্যন্ত। এক সময় ওমর ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে বসে পড়লো। মারমুখী জনতা তখনো তার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে। ওমর বলতে লাগলেনঃ তোমরা যা খুশী কর। আল্লাহর কসম, আমরা যদি তিনশো লোক হতাম, তাহলে আমরা তোমাদের জন্য রণাঙ্গন ছেড়ে দিতাম অথবা তোমরা ছেড়ে দিতে।" (অর্থাৎ মুসলমানদের সংখ্যা বেশি হলে তোমরা এত মারমুখো হতে না।) উভয় পক্ষ যখন এই পর্যায়ে, তখন সহসা সেখানে একজন প্রবীণ কুরাইশ সর্দাদের আবির্ভাব ঘটলো। মূল্যবান ইয়ামানী চাদর ও নকশাদার আলখেল্লা পরিহিত এই বৃদ্ধ এসে তাদের কাছে দাঁড়ালেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কি হয়েছে? তারা বললো, "ওমর ধর্মচ্যুত হয়ে গেছে।" বৃদ্ধ বললেনঃ "তাতে কি? থামো। একজন মানুষ নিজের ইচ্ছায় একটা জিনিস গ্রহণ করেছে। তোমরা তার কি করতে চাও? তোমরা কি ভেবেছ, বনু আদি বিন কা'ব [ওমর (রাঃ)-এর গোত্র] তাদের সদস্যকে তোমাদের হাতে এভাবেই ছেড়ে দেবে? ওকে ছেড়ে দাও।" ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ এ কথার পর তারা নিজেদের উত্তেজিত ভাবাবেগকে সংগত করলো। পরে মদীনায় হিজরত করার পর আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলামঃ আব্বা, ঐ বৃদ্ধটি কে, যিনি আপনার ইসলাম গ্রহণের দিন মারমুখো জনতাকে ধমক দিয়ে আপনার কাছ থেকে হটিয়ে দিয়েছিলেন? তিনি বললেন, উনি আস ইবনে ওয়ায়েল আস্‌সাহমী।

ইবনে হিশাম বলেনঃ আমাকে কোন কোন বিদ্বান ব্যক্তি বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও তাঁর পিতার কথোপকথনটি এ রকম ছিলঃ

ইবনে ওমরঃ আব্বা! ঐ লোকটি কে, যিনি আপনার ইসলাম গ্রহণের দিন মক্কাতে যারা আপনার ওপর আক্রমণ করেছিল, তাদেরকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিলেন? আল্লাহ্ উনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।"

হযরত ওমর (রাঃ)ঃ "হে বৎস! উনি আ'স ইবনে ওয়ায়েল। আল্লাহ তাঁকে কোনই উত্তম প্রতিদান যেন না দেন।" কারণ ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত ভালো কাজের প্রতিদান পাওয়া যায় না। আ'স ইবনে ওয়ায়েল মোশরেক অবস্থায় এ কাজটি করেন এবং কখনো মুসলমান হননি।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেনঃ "সেই রাত্রে ইসলাম গ্রহণ করার পর সিদ্ধান্ত নিলাম যে মক্কাবাসীর মধ্যে যে ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর সবচেয়ে কট্টর দুশমন, তার কাছে যাবো এবং তাকে জানাবো যে, আমি মুসলমান হয়ে গেছি। ভেবে দেখলাম, এই ব্যক্তিটি তো আবু জাহ্‌ল ছাড়া আর কেউ নয়।" উল্লেখ্য যে, ওমর (রাঃ) আবু জাহলের আপন বোন খানতামা বিনতে হিশাম ইবনুল মুগীরার পুত্র ছিলেন। যাহোক, ওমর বলেনঃ আমি পরদিন সকালে তার কাছে গিয়ে তার ঘরের দরজায় কড়া নাড়লাম। আবু জাহ্‌ল আমার কাছে বেরিয়ে এলো এবং বললোঃ "আমার ভাগ্নেকে স্বাগত! তুমি কি খবর নিয়ে এসেছ ওমর?" আমি বললামঃ "মামা, আমি আপনাকে জানাতে এসেছি যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ঈমান এনেছি। তিনি যে বিধান নিয়ে এসেছেন তাও সত্য বলে মেনে নিয়েছি।" এরপর তিনি আমার মুখের ওপর ঠাস্ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং বললেনঃ "ধিক তোমাকে এবং ধিক তোমার বহন করে আনা সংবাদকে।"

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেনঃ হযরত ওমরের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ ছিল একটি বিজয়, তাঁর মদীনায় হিজরত ছিল আল্লাহ্‌র সাহায্য স্বরূপ এবং তাঁর খিলাফাত ছিল আল্লাহ্‌র রহমত স্বরূপ।

শিক্ষাঃ

(১) পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করেই হযরত ওমর (রাঃ) হেদায়াত লাভ করেছিলেন। তাই ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যারাই কাজ করতে চায়, কেয়ামত পর্যন্ত তাদের এ কাজ সরাসরি কুরআন দিয়েই শুরু করতে হবে।

(২) রাসূল (সাঃ) হযরত ওমরের নাম ধরে দোয়া করতেন তাঁর হেদায়াতের জন্য। তাই রাসূল (সাঃ) এর পদানুসরণ করে আমাদেরও ইসলামের শত্রুদের হেদায়াতের জন্য নাম ধরে ধরে দোয়া করা উচিত। শুধু প্রচার ও শিক্ষা দান করেই ক্ষান্ত থাকা উচিত নয়। কেননা হেদায়াতের আসল চাবিকাঠি আল্লাহর হাতে রয়েছে।

(৩) আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর মক্কার অবস্থা ছিল চরম নৈরাশ্যজনক। কিন্তু এহেন পরিস্থিতিতেও আল্লাহ তায়ালা হযরত ওমরের (রাঃ) মত ব্যক্তিত্বকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সুতরাং কোন পরিস্থিতিতেই মুসলামানদের হতাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তায়ালা অকল্পনীয়ভাবে সাহায্য পাঠাতে পারেন।

১১। স্বামী-স্ত্রীর আচরণে সহনশীলতা

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে হযরত ওমর (রাঃ) এর নিকট নালিশ করতে ও তাঁর পরামর্শ নিতে এলো। এসে হযরত ওমরের (রাঃ) বাস ভবনের দরজায় দাঁড়াতেই শুনতে পেল তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় ও উচ্চস্বরে তাঁকে তিরষ্কার করছে, আর হযরত ওমর নিরবে তা শুনছেন। লোকটি তৎক্ষণাৎ ফিরে যেতে উদ্যত হলো। সে ভাবলো, হযরত ওমরের (রাঃ) মত কঠোর মেজাজের মানুষের যখন এই অবস্থা এবং তিনি খলীফা, তখন আমি আর কে? ঠিক এই সময়ে হযরত ওমর বাইরে বেরিয়ে দেখলেন এক ব্যক্তি তার দরজা থেকে ফিরে যাচ্ছে। তিনি তাকে ডেকে ফেরালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জন্য এসেছ? সে বললোঃ "আমীরুল মুমিনীন, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম নিজের স্ত্রীর বদমেজাজ ও কঠোর ব্যবহার সম্পর্কে নালিশ করতে। কিন্তু এসে নিজ কানে যা শুনতে পেলাম, তাতে মনে হলো আপনার স্ত্রীরও একই অবস্থা। তাই এই সান্তনা নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম যে, খোদ্ আমীরুল মুমিনীনের যখন নিজের স্ত্রীর সাথে এরূপ অবস্থা, তখন আমি আর কোথাকার কে?

হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ ওহে দ্বীনি ভাই, শোন। আমি আমার স্ত্রীর এরূপ আচরণ সহ্য করি দুটি কারণে- প্রথমতঃ আমার কাছে তার অনেক অধিকার পাওনা আছে। দ্বিতীয়তঃ সে আমার খাবার রান্না করে, রুটি বানায়, কাপড় ধোয় এবং আমার সন্তানকে দুধ খাওয়ায়। অথচ এর কোনটি তার কাছে আমার প্রাপ্য নয় এবং সে এগুলো করতে বাধ্য নয়। এ সবের কারণে আমার মনে শান্তি বিরাজ করে এবং আমি হারাম উপার্জন থেকে রক্ষা পাই।

এ কারণেই আমি তাকে সহ্য করি। লোকটি বললোঃ হে আমীরুল মুমিনীন, আমার স্ত্রীও তদ্রুপ। হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ তাহলে সহ্য করতে থাকো ভাই। দুনিয়ার জীবন তো অল্প কটা দিনের!

শিক্ষা ঃ ইসলাম যে নারীর প্রতি কত উদার ও সহনশীল হওয়ার শিক্ষা দেয় তা এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়।

এই ঘটনা থেকে শরীয়তের এই বিধিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নিছক প্রথাগতভাবে আমাদের সমাজে মনে করা হয় যে, রান্না বান্না করা, কাপড় ধোয়া ও গৃহস্থালির যাবতীয় কাজ করা স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু আসলে তা তার কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য নয়। এ সব কাজ করা স্ত্রীর ইচ্ছাধীন। শুধু স্বামী ও সন্তানের মঙ্গলাকাংখা থেকেই স্ত্রীরা নিজের ইচ্ছায় এ সব কাজ করে থাকে। এ সব কাজে কোন ক্রটি হলে সে জন্য তাকে কোন শাস্তি বা বকাঝকা করা জায়েজ নয়। তবে স্বামীর সম্পদ ও সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান অবশ্যই স্ত্রীর দায়িত্ব।

১২। রাসূলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যানকারী এক মুরতাদের শাস্তি

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, মদীনায় বিশর নামক একজন মুনাফিক বাস করতো। একবার জনৈক ইহুদীর সাথে তার বিবাদ বেধে যায়। ইহুদী বললোঃ চল, আমরা মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কাছে গিয়ে এর মীমাংসা করিয়ে আসি। বিশর প্রথমে এ প্রস্তাবে সম্মত হলো না। সে ইহুদী নেতা কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে মীমাংসার জন্য যাওয়ার প্রস্তাব করলো। কা'ব ইবনে আশরাফ ছিল মুসলমানদের কট্টর দুশমন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এই ইহুদী নেতার কাছ থেকে মীমাংসা কামনা করছিল মুসলমান পরিচয় দানকারী বিশর। অথচ ইহুদী লোকটি স্বয়ং রাসূল এর ওপর এর বিচারের ভার অর্পণ করতে চাইছিল। আসলে এর কারণ ছিল এই যে, রাসূল (সাঃ) এর বিচার যে পুরোপুরি ন্যায়সংগত হবে তা উভয়েই জানতো। কিন্তু ন্যায়সংগত মীমাংসা হলে মুনাফিক হেরে যেত, আর ইহুদী জয়লাভ করতো।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত ইহুদীর মতই স্থির হলো। উভয়ে রাসূল (সাঃ) এর কাছে গিয়ে বিবাদটার মীমাংসার ভার তাঁর ওপর অর্পণ করলো। রাসূল (সাঃ) মামলার ব্যাপক তদন্ত চালিয়ে ইহুদীর পক্ষে রায় দিলেন এবং বিশর হেরে গেল। সে এ মীমাংসায় মনে মনে অসন্তুষ্ট হয় এবং ইহুদীকে এই মর্মে সম্মত করে যে, বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য তারা হযরত ওমরের নিকট যাবে। বিশর ভেবেছিল যে, হযরত ওমর যেহেতু

কাফেরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন, তাই তিনি ইহুদীর মুকাবিলায় তার পক্ষে রায় দেবেন।

দু'জনেই হযরত ওমরের নিকট উপস্থিত হলো। ইহুদী তাঁকে পুরো ঘটনা জানালো এবং বললো, এ ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) যে ফায়সালা করেছেন, তা আমার পক্ষে। কিন্তু এ লোকটি তাতে সম্মত নয়। তাই আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছে।

হযরত ওমর বিশরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঘটনা কি এরূপ? সে বললো, হাঁ। তখন হযরত ওমর বললেন, তাহলে একটু অপেক্ষা কর। এই বলে তিনি ঘরের ভেতর থেকে একখানা তলোয়ার নিয়ে এলেন এবং "যে লোক রাসূলের ফায়সালা মেনে নিতে রাযী হয় না, ওমরের কাছে তার ফায়সালা হলো এই......." এই বলে চোখের নিমেষে বিশরকে দ্বিখন্ডিত করে ফেললেন।

এরপর বিশরের উত্তরাধিকারীরা রাসূল (সাঃ) এর নিকট হযরত ওমরের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেন যে, তিনি শরীয়ত সম্মত কারণ ব্যতীত একজন মুসলমানকে হত্যা করেছেন। এ সময় রাসূল (সাঃ) এর মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কথা বেরিয়ে আসে যে, "ওমর কোন মুসলমানকে হত্যা করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে এটা আমি মনে করি না।"

আসলে হযরত ওমর (রাঃ) তাকে এই মনে করে হত্যা করেছেন যে, সে যখন আল্লাহর রাসূলের ফায়সালা প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন সে স্পষ্টতই মুরতাদ ও কাফের হয়ে গেছে। ইসলামী শরীয়তে মুরতাদের সর্বসম্মত শাস্তি যে মৃত্যুদন্ড সেটাই তিনি তাকে দিয়েছিলেন। আর এর অব্যবহিত পর সূরা নিসার ৬০ থেকে ৬৮ নং আয়াত নাযিল হয়ে হযরত ওমরের অভিমতকে সঠিক প্রমাণিত করে।

শিক্ষা ঃ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর আদেশ, নিষেধ বা সিদ্ধান্তকে যারা প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে মুসলমান বলে মনে করা বৈধ নয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকলে এ ধরনের লোকদের মৃত্যুদন্ড দেয়া অপরিহার্য। অন্যথায়, এ ধরনের মুরতাদদেরকে সমাজচ্যুত করা ও নিন্দা প্রতিবাদের মাধ্যমে কোনঠাসা করে রাখতে হবে, যাতে আর কেউ মুরতাদ হবার ধৃষ্ঠতা না দেখায়।

১৩। জাবালার ঔদ্ধত্য ও হযরত ওমর (রাঃ)

একবার হযরত ওমর (রাঃ) হজ্জ করতে মক্কায় এলেন। তিনি কা'বার চারপাশে তওয়াফ করছিলেন। তাঁর সাথে সাথে একই কাতারে তওয়াফ

করছিলেন সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী প্রতিবেশী এক রাজা জাবালা ইবনে আইহাম। জাবালা কা'বার চারপাশ প্রদক্ষিণ করার সময় সহসা আরেক তওয়াফকারী জনৈক দরিদ্র আরব বেদুঈনের পায়ের তলে চাপা পড়ে জাবালার বহু মূল্যবান ইহরামের চাদরের এক কোণা। চাদরটি রাজার কাঁধের ওপর থেকে টান লেগে নীচে পড়ে যায়।

ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন জাবালা। লোকটির কোন ওজর আপত্তি না শুনে জাবালা তার গালে প্রবল জোরে এক চড় বসিয়ে দেন।

লোকটি তৎক্ষণাৎ খলিফার নিকট গিয়ে নালিশ করে এবং এই অন্যায়ের বিচার চায়। খলিফা জাবালাকে তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞাসা করেন যে, অভিযোগ সত্য কিনা। জাবালা উদ্ধত স্বরে জবাব দেন, "সম্পূর্ণ সত্য। এই পাজিটা আমার চাদর পদদলিত করে আল্লাহর ঘরের সামনে আমাকে প্রায় উলংগ করে দিয়েছে।"

খলিফা দৃঢ়তার সাথে জবাব দেন, "কিন্তু এটা ছিল একটা দুর্ঘটনা।" জাবালা স্পর্ধিত কণ্ঠে বললেন, "আমি তার পরোয়া করিনে। কা'বা শরীফের সম্মানের খাতিরে ও কা'বার চত্তরে রক্তপাত নিষিদ্ধ থাকার কারণে আমি যথেষ্ট ক্রোধ সংবরণ করেছি। নচেত ওকে আমি চপেটাঘাত নয় হত্যাই করতাম।"

জাবালা হযরত ওমরের একজন শক্তিশালী মিত্র ও ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। খলিফা তাই একটু থামলেন এবং কিছু চিন্তাভাবনা করলেন। অতঃপর শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "জাবালা, তুমি নিজের অপরাধ স্বীকার করেছ। এখন বাদী ক্ষমা না করলে তোমাকে ইসলামী আইনের শাস্তি মাথা পেতে নিতে হবে এবং বাদীর হাতে পাল্টা একটা চপেটাঘাত খেতে হবে।"

স্তম্ভিত হয়ে জাবালা বললেন, "আমি একজন রাজা। আর ও হচ্ছে একজন সাধারণ কৃষক।"

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "তোমরা উভয়ে মুসলমান এবং আইনের চোখে সবাই সমান।"

জাবালা বললো, "যে ধর্মে রাজা ও একজন সাধারণ প্রজাকে সমান চোখে দেখা হয়, আমি তার আনুগত্য করতে পারিনে। ঐ চাষা যদি আমাকে চপেটাঘাত করে, তবে আমি ইসলাম ত্যাগ করবো।" (নাউযু বিল্লাহ)

হযরত ওমর ততোধিক কঠোর স্বরে জবাব দিলেন, "তোমার মত হাজার জাবালাও যদি ইসলাম ত্যাগ করে চলে যায়, তবে সেই ভয়ে ইসলামের একটি ক্ষুদ্রতম বিধিও লংঘিত হতে পারে না। তোমাকে এ শাস্তি পেতেই

হবে। আর এ কথাও জেনে রেখ যে, ইসলাম কাউকে জোরপূর্বক মুসলমান বানায় না। তোমাকেও বানায়নি। কিন্তু ইসলাম ত্যাগ করা সহজ নয়। মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড।"

হযরত ওমরের শেষোক্ত কথাটা শুনে জাবালা রাগে ও ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। হযরত ওমরের নির্দেশে বাদী তৎক্ষণাত জাবালার মুখে ঠাস্ করে একটি চড় বসিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নিয়ে নিল।

জাবালা ক্রোধে চক্ষু লাল করে বাদীর দিকে একবার তাকালো। অতঃপর রাগে গরগর করতে করতে কা'বার চত্তর ত্যাগ করে নীরবে চলে গেল। জানা যায়, এরপর জাবালা ইবনে আইহাম ইসলাম ত্যাগ করে প্রাণের ভয়ে সোজা রোম সম্রাটের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং সেখানেই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটায়।

১৪। হযরত খাব্বাব (রাঃ) এর ত্যাগ ও কুরবানী

হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নগ্ন তরবারী হাতে নিয়ে যেদিন রাসূল (সাঃ) কে হত্যা করতে রওয়ানা হয়েছিলেন, সেইদিন পথিমধ্যে নিজের বোন ও ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণের খবর পেয়ে সাময়িকভাবে গন্তব্য স্থান পরিবর্তন করেন এবং প্রথমে বোন ভগ্নিপতিকে ইসলাম গ্রহণের শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বোনের বাড়ীতে গিয়ে দেখতে পান তারা কুরআন পড়ছে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পড়াচ্ছিল তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী খাব্বাব ইবনুল আরত। হযরত ওমর বাড়ীতে প্রবেশ করা মাত্রই খাব্বাব প্রাণভয়ে আত্মগোপন করেন। কেননা বোন ভগ্নিপতি রক্তের টানে প্রাণে রক্ষা পেলেও সেদিন খাব্বাবের বাঁচার কোন আশা ছিলনা ওমরের নগ্ন তরবারী থেকে। সেদিন যা হবার তা হলো। প্রথম সাক্ষাতে বোন ভগ্নিপতি কিছু মার খেলেও কুরআনের আয়াত ক'টি পড়ে তাঁর আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি রাসূলের (সাঃ) কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। খাব্বাবের সাথে হযরত ওমরের সেইদিন হয়েছিল প্রথম সাক্ষাত। তারপর দরিদ্র খাব্বাবের ওপর মক্কার কোরেশদের আরো অনেক নির্যাতন হয়েছে। হযরত ওমর শুনেছেন, কিন্তু প্রতিকার করতে পারেননি।

কিন্তু আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে হযরত ওমরের সামনে বসে আছেন মহান ত্যাগী সাহাবী খাব্বাব। আজ ইসলাম বিজয়ী আসনে অধিষ্ঠিত। হযরত ওমর আজ মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা। তাওহীদ ও রিসালাতের সাথে সংঘর্ষে কুফর ও শিরক চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। জাহেলিয়াতের অন্ধকার দূর

হয়ে ইসলামের আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত। কিন্তু হযরত ওমরের (রাঃ) প্রবল ইচ্ছা, খাব্বাবের সেই নির্যাতনের কাহিনীগুলো শুনবেন। তাই জিজ্ঞাসা করলেন, "ইসলাম গ্রহণের পর আপনার ওপর কি ধরনের নির্যাতন হয়েছে, একটু বলবেন?"

হযরত ওমরের প্রশ্ন হযরত খাব্বাবকে আবার দূর অতীতে টেনে নিয়ে গেল এবং মক্কার ১৩ বছরের সেই রক্তক্ষরা দিনগুলোকে তার চোখের সামনে হাজির করলো। সে নির্যাতন ঈমান ও একীনে উজ্জীবিত মর্দে মুমিনরা ছাড়া আর কেউ তেরো বছর তো দূরের কথা, তেরো দিনও বরদাশত করতে পারতো না। হযরত খাব্বাব কোন্ কাহিনী দিয়ে শুরু করবেন এবং কোন্‌টা বাদ দিয়ে কোন্‌টা বলবেন। তাই ভেবে ভেবে কয়েক মুহূর্ত নিরবে কাটিয়ে দিলেন। শেষে বলতে চেয়েও বলতে পারলেন না। অবশেষে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নিজের জামা খুলে কোমরের একটি অংশ আমীরুল মুমিনীনকে দেখালেন। জায়গাটা ছিল যখমের চিহ্নে পরিপূর্ণ। আমীরুল মুমিনীন দেখা মাত্র চিৎকার করে বলে উঠলেন ঃ

"আল্লাহু আকবার! এই নাকি আপনার কোমর। আমি তো আজ পর্যন্ত কোন মানুষের এমন্ কোমর দেখিনি।"

খাব্বাব বললেন, "জি, আমীরুল মুমিনীন, কতবার যে আমাকে লোহার বর্মসহ তপ্ত মরুভূমিতে টেনে হিচড়ে বেড়ানো হয়েছে এবং কতবার যে আমার কোমরের চর্বিতে ওদের আগুন নিভেছে, তা আমি স্মরণ করতে পারিনা। তারপর আল্লাহর শোকর যে, একদিন আমরা সমস্ত নির্যাতন থেকে মুক্তি পেলাম।"

সহসা হযরত খাব্বাব কান্না শুরু করে দিলেন।

হযরত ওমর বললেন, "খাব্বাব, আজ কেন কাঁদছেন?"

হযরত খাব্বাব চোখের পানি ফেলতে ফেলতে জবাব দিলেন ঃ

"আমি কাঁদছি এজন্য যে, জেহাদের পর জেহাদ করে বিজয় অর্জন করার পর আল্লাহ আমাদের জন্য সুখ সমৃদ্ধি ও ধন দৌ লতের দ্বার খুলে দিয়েছেন। আমাদের মাথার ওপর সম্মান ও মর্যাদার পতাকা উড়ছে। আমার আশংকা হয় যে আমাদের ক্ষুদ্র ও সৎ কাজগুলোর প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হচ্ছে কিনা এবং আখেরাতে আমাদের খালি হাতে উঠতে হবে কিনা।"

এই নিঃস্বার্থ ত্যাগী পুরুষ ইন্তিকালের সময় ওসিয়ত করেন, "আমাকে তোমরা লোকালয়ে নয়, কুফার জংগলে কবর দিও। জংগল আমাকে ডাকছে।"

তাঁর ইন্তিকালের পর একদিন হযরত আলী তাঁর কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বললেন, "আল্লাহ খাব্বাবের ওপর রহমত করুন। তিনি সেচ্ছায় ও সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করেন, সানন্দে হিজরত করেন, জেহাদে জীবন কাটান এবং মুসিবতের পর মুসিবত বরদাশত করেন। অথচ নিজের প্রয়োজনের চেয়ে এক চুল পরিমাণও বেশী সম্পদ যোগাড় করেননি।"

১৫। হযরত ওমরের (রাঃ) শাসনে প্রজাদের সম-অধিকার

মিশর বিজয়ী সেনাপতি আমর ইবনুল আস তখন মিশরের গভর্ণর। তাঁর শাসনে মিশরের জনগণ বেশ শান্তিতেই কাটাচ্ছিল। কিন্তু তাঁর একটা বেয়াড়া ছেলে তাঁর ন্যায়পরায়নতার সুনাম প্রায় নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছিল। সে যখনই পথে বেরুত, সবাইকে নিজের চালচলন দ্বারা বুঝিয়ে দিত যে, সে কোন সাধারণ মানুষ নয়, বরং গভর্ণরের ছেলে।

একদিন সে জনৈক মিশরীয় খৃস্টানের ছেলেকে প্রহার করলো। দরিদ্র মিশরীয় গভর্ণরের কাছে তার ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সাহস পেল না। তাই নীরবে হজম করলো। কয়েকদিন পর তার জনৈক প্রতিবেশী মদীনা থেকে ফিরে এসে জানালো যে, খলিফা ওমর অত্যন্ত ন্যায়পরায়ন শাসক। তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সম-অধিকার নিশ্চিত করেন এবং কেউ কারো ওপর যুলুম করেছে জানলে তাকে কঠোর শাস্তি দেন। এ কথা শুনে ঐ মিশরীয় খৃস্টান একটি উটের পিঠে চড়ে দীর্ঘ সতেরো দিন চলার পর মদীনায় খলিফার কাছে পৌঁছলো এবং গভর্ণরের ছেলের বিপক্ষে মোকদ্দমা দায়ের করলো। হযরত ওমর তৎক্ষণাৎ হযরত আমর ইবনুল আস ও তার ছেলেকে মদীনায় ডাকিয়ে আনলেন। অতঃপর বিচার বসলো।

সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা হযরত আমর ইবনুল আসের (রাঃ) ছেলে দোষী সাব্যস্ত হলো। খলিফা ওমর (রাঃ) অভিযোগকারীর ছেলেকে দেখিয়ে বললেন, সে তোমাকে যেভাবে যে কয়বার প্রহার করেছে তুমিও সেই কয়বার তদ্রুপ প্রহার কর। ছেলেটি যথাযথভাবে প্রতিশোধ নিল।

তারপর খলিফা বললেন, "প্রজারা শাসকের দাস নয়। শাসকরা প্রজাদের সেবক। প্রজারা ঠিক তেমনি স্বাধীন যেমন তাদের মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট হবার সময় স্বাধীন ছিল।"

১৬। হযরত ওমর (রাঃ) ও গভর্ণর হরমুযান

পারস্যের নাহাওয়ান্দ্র প্রদেশের গভর্ণর হরমুযান ইসলামের এক কট্টর দুশমন ছিল। সে মুসলমানদের সাথে পারস্যের যুদ্ধ বাধানোর প্রধান হোতা

ছিল। সে নিজেও খুবই শৌ র্য বীর্যের সাথে যুদ্ধ করেছিল। অবশেষে হরমুযান মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে ও কারাবন্দী হয। কারাবন্দী হবার পর সে ভেবেছিল, এবার আর তার রেহাই নেই। মুসলমানরা হয় তাকে দাস হিসাবে বিক্রী করে দেবে, নচেত মৃত্যুদন্ড দেবে। কারণ তার অতীত কার্যকলাপ দ্বারা সে মুসলমানদের সাথে নিজের সম্পর্ক খুবই খারাপ করে ফেলেছিল। কিন্তু তাকে এই দুই শাস্তির কোনটাই দেয়া হলো না। তাকে কিছু করের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হলো। হরমুযান নিজের রাজধানীতে ফিরে এল, তৎক্ষণাৎ আরো দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে বিদ্রোহী তৎপরতা শুরু করলো এবং এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে ফিরে এলো। এবারও হরমুযান ধরা পরে বন্দী হলো। হরমুযানকে পাকড়াও করে যখন হযরত ওমরের কাছে আনা হলো তখন হযরত ওমর তাঁর উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করছিলেন। বন্দী এবার তার মৃত্যুদন্ড সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত ছিল। প্রতি মুহূর্তে সে তাই মৃত্যুর আশংকা করছিল।

সহসা হযরত ওমর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমিই নাহাওয়ান্দ্রের বিদ্রোহী গভর্ণর?

হরমুযান ঃ জ্বী, আমিই।

হযরত ওমর ঃ তুমিই কি সেই ব্যক্তি, যে বারবার মুসলমানদের সাথে চুক্তি ভংগ করে?

হরমুযান ঃ জ্বী, আমিই।

হযরত ওমর ঃ এ ধরনের অপরাধের শাস্তি যে মৃত্যুদন্ড, তা তুমি জান?

হরমুযান ঃ জ্বী, জানি।

হযরত ওমর ঃ বেশ, তাহলে তুমি কি এই শাস্তি এক্ষুনি নিতে প্রস্তুত?

হরমুযান ঃ আমি প্রস্তুত। তবে মৃত্যুর পূর্বে আপনার নিকট আমার একটি মাত্র আবেদন আছে।

হযরত ওমর ঃ সেটি কী?

হরমুযান ঃ আমি খুব পিপাসা বোধ করছি। আমি এক গ্লাস পানি চাইতে পারি?

হযরত ওমর ঃ অবশ্যই।

এই সময় হযরত ওমরের নির্দেশে তাঁকে এক গ্লাস পানি দেয়া হলো।

হরমুযান ঃ আমীরুল মু'মিনীন, আমি আশংকা করছি যে, আমি পানি খাওয়ার সময়েই আমার মস্তক ছিন্ন করা হতে পারে।

হযরত ওমর ঃ কখনো নয়। তোমার এই পানি খাওয়া শেষ হবার আগে কেউ তোমার চুলও স্পর্শ করবে না।

হরমুযান ঃ (একটু থেমে) আমীরুল মু'মিনীন, আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন যে আমি এই পানি খাওয়া শেষ না করা পর্যন্ত আপনারা আমার চুলও স্পর্শ করবেন না। আমি পানি পান করবো না। (এই বলেই সে পানি ঢেলে ফেলে দিল।) এখন আপনি আমাকে হত্যা করতে পারেন না।

হযরত ওমর ঃ (মুচকি হেসে) ওহে গভর্ণর, এটা তোমার চালাকী! যাহোক, ওমর যখন কথা দিয়েছে, তখন সে তার কথা রাখবেই। যাও, তুমি মুক্ত।

এর কিছুকাল পরে একদিন হরমুযান একদল সঙ্গী পরিবেষ্টিত হয়ে আবার মদীনায় এল এবং হযরত ওমরের সাথে সাক্ষাত করলো। সে বললো, "আমীরুল মুমিনীন, এবার আমি নতুন জীবনের সন্ধানে এসেছি। আমাদের সবাইকে ইসলামে দীক্ষিত করুন।"

১৭। হযরত ওমরের (রাঃ) ন্যায় বিচারের আর একটি উদাহরণ

একবার কিছু সুগন্ধী দ্রব্য বাহরাইন থেকে হযরত ওমরের নিকট পাঠানো হলো। তিনি সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এই সুগন্ধী দ্রব্যটিকে মেপে সমান ভাগ করে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করতে পারে?"

তাঁর স্ত্রী হযরত আতেকা বললেন, "আমিরুল মুমিনীন, আমি পারবো।"

হযরত ওমর বললেন, "আতেকা ছাড়া আর কেউ আছে কি?"

হযরত আতেকা বললেন, "আমীরুল মুমিনীন, আমি মেপে দিলে অসুবিধা কী?"

হযরত ওমর বললেন, "আমার আশংকা হয় যে, মাপার সময় জিনিসটা তুমি হাত দিয়ে ধরবে এবং তোমার হাত সুবাসিত হয়ে যাবে। অতঃপর সেই সুবাসিত হাত তুমি মুখে মেখে নেবে এবং সুগন্ধী উপভোগ করবে। অন্যদের চাইতে এতটুকু বাড়তি সুবিধাও তুমি পেয়ে যাও, তা আমি পছন্দ করি না।"

শিক্ষাঃ

একজন সাধারণ মুসলমানের জন্য স্বীয় স্ত্রী বা অধীনস্থদের ওপর এত কঠোরতা আরোপ না করলেও চলতো। কিন্তু খলীফা বা যে কোন স্তরের নেতৃবৃন্দের পক্ষে এরূপ কঠোর ও সূক্ষ্ম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। কারণ নেতামাত্রই আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তি। তার পক্ষে নিজেকে ও নিজের ঘনিষ্ঠজনদেরকে বিন্দুমাত্রও ছাড় দেয়ার অবকাশ নেই।

১৮। হযরত ওমর কর্তৃক স্বীয় পুত্রের বিচার

একবার হযরত ওমরের নিকট একটা অভিযোগ এল যে, তার পুত্র আবু শাহমা মদ খেয়েছে। অভিযোগটা অন্যান্য লোকেরও কানে গেল। অনেকে ফিসফিসানি শুরু করে দিল যে, এবার দেখবো খলিফার আইনের শাসন নিজের ছেলের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকর হয়। কিন্তু তাদের ধারণাটা অচিরেই মাঠে মারা গেল। কেননা অন্যরা শৈথিল্য দেখাতে পারে এই আশংকায় হযরত ওমর তাঁর ছেলের মামলা আদালতে না পাঠিয়ে নিজের হাতে তুলে নিলেন।

ছেলের মদ খাওয়ার সত্যতা প্রমাণিত হলো। ইসলামী আইনে এর শাস্তি ৮০ ঘা বেত্রদন্ড। এবারও হযরত ওমর অন্যের ওপর নির্ভর করলেন না। কেননা অন্যরা দুর্বলতা দেখাতে পারে। তিনি নিজ হাতেই পুরো ৮০টা বেত্রাঘাত নিজের ছেলের পিঠে লাগালেন। আবু শাহমা এই শাস্তিতে মারা গেল। কিন্তু হযরত ওমর আল্লাহর শোকর আদায় করলেন যে, তিনি তাকে এমন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ৮০টি বেত্রাঘাতের কয়েকটি বাকী থাকতেই ছেলে মারা গেলে হযরত ওমর তার কবরের ওপর বাকী বেত্রাঘাতগুলো করেন।

শিক্ষাঃ

ইসলামী আইন ও নীতিমালা প্রয়োগের ব্যাপারে কোন আপোষের অবকাশ নেই। আল্লাহ বলেনঃ 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর সাক্ষী হিসাবে ইনসাফ কায়েম কর, এমনকি তা যদি তোমাদের নিজেদের, পিতামাতার ও ঘনিষ্ঠজনদের বিরুদ্ধেও যায়।'

১৯। সততার পুরস্কার

রাত প্রায় দুপুর গড়িয়ে চলেছে। ঘুমন্ত মদীনা নগরী। এরই অলিগলি দিয়ে প্রতিদিনের মত ধীর পদে হেটে চলেছেন ছদ্মবেশী খলীফা হযরত ওমর। খোঁজ খবর নিচ্ছেন প্রজাদের। হঠাৎ একটি কুঁড়েঘর থেকে ফিসফিস করে একটি কথোপকথন তার কানে ভেসে এল। খলীফা দাঁড়িয়ে গেলেন পুরো কথোপকথন শুনতে। এক বৃদ্ধা মহিলা তার মেয়েকে বলছেঃ "দুধ বেঁচতে দেয়ার সময় একটু পানি মিশিয়ে দিসনে কেন? তুই তো জানিস, কী অভাব আমাদের। ঐটুকু দুধে আর ক'টা পয়সা হবে। একটু পানি মেশালে কিছুটা সচ্ছলতার মুখ দেখা যেত।"

"কিন্তু তুমি খলীফার আদেশ ভুলে গেল, আম্মী? তিনি যে বলেছেন কেউ যেন দুধের সাথে পানি না মেশায়।"

"বলেছেন, তাতে কী হয়েছে? খলীফা বা তার কোন কর্মচারী তো আর দেখতে আসছেন না আমরা কী করছি।"

"কিন্তু আম্মী, তিনি বা তার কোন কর্মচারী দেখুক বা না দেখুক, তার আদেশ তো প্রত্যেক মুসলমানের মেনে চলা দরকার। তা ছাড়া খলীফা যদি নাও জানেন, আল্লাহ তো জানবেন। তিনি তো সব কিছু দেখেন, শোনেন এবং জানেন।"

খলীফা নীরবে প্রস্থান করলেন। নিজের সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "শুনলে তো? এই মেয়েটাকে কী পুরস্কার দেয়া যায় তার সততার জন্য?"

"তাকে বেশ বড়সড় একটা পুরস্কার দেয়া উচিত। ধরুন, এক হাজার দিরহাম।"

"না, তা যথেষ্ট নয়। আমি তাকে সততার সর্বোচ্চ পুরস্কার দেব। আমি তাকে আপন করে নেব।"

খলীফার সঙ্গী অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো, খলীফা কী পুরস্কার দিতে চান?

পরদিন সকালে খলীফা মেয়েটাকে তার দরবারে ডেকে পাঠালেন। মেয়েটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এসে হাজির হলো মুসলিম সাম্রাজ্যের মহাশক্তিধর শাসকের সামনে।

খলীফা তাঁর ছেলেদের ডাকলেন। তাদেরকে শোনালেন গত রাতে তার শোনা আলাপচারিতার কথা। তারপর বললেনঃ "হে আমার ছেলেরা, আমি চাই তোমাদের কোন একজন এই মেয়েটিকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করুক। কেননা এর চেয়ে ভালো কোন পাত্রী আমি তোমাদের জন্য যোগাড় করতে পারবো বলে মনে হয় না।"

একটি ছেলে পিতার প্রস্তাবে রাজী হলো। মেয়েটিও সম্মতি দিল। আর সে খলীফার সম্মানিত পুত্রবধুতে পরিণত হলো। বর্ণিত আছে যে, পরবর্তীকালে দ্বিতীয় ওমর নামে পরিচিত ও পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ নামে আখ্যায়িত মহান শাসক ওমর বিন আবদুল আযীয এই মেয়েরই দৌহিত্র ছিলেন।

শিক্ষা ঃ এই ঘটনাটি একদিকে যেমন প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের সততার এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরে, অপরদিকে তেমনি মুসলিম নেতৃবৃন্দ সততার কেমন মর্যাদা দিতেন ও কদর করতেন, তাও এ ঘটনা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। মনে রাখতে হবে, গুণের কদর দিতে না পারলে সমাজে সদগুণের বিকাশ ঘটা সম্ভব নয়।

২০। কাযী শুরাইহের ন্যায় বিচার

একবার হযরত ওমর (রাঃ) জনৈক বেদুইনের কাছ থেকে একটি ঘোড়া কিনলেন। ঘোড়ার দাম পরিশোধ করেই তিনি ঘোড়ায় চড়লেন এবং তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে গেলেন। কিছুদূর যেতেই ঘোড়াটি হোঁচট খেয়ে খোঁড়া হয়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোড়াকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে ঐ বেদুইনের কাছে নিয়ে গেলেন। হযরত ওমর ভেবেছিলেন ঘোড়াটির আগে থেকেই পায়ে কোন খুত ছিল, যা সামান্য ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে গেছে। তিনি ঘোড়ার মালিককে বললেনঃ "তোমার ঘোড়া ফেরত নাও। এর পা ভাঙ্গা।"

সে বললো ঃ "আমীরুল মু'মিনীন! আমি ফেরত নিতে পারবোনা। কারণ আমি যখন বিক্রী করেছি, তখন ঘোড়াটি ভালো ছিল।"

হযরত ওমর বললেনঃ "ঠিক আছে। একজন শালিশ মানা হোক। সে আমাদের বিরোধ মিটিয়ে দেবে।"

লোকটি বললো ঃ শুরাইহ বিন হারিস কান্দী নামে একজন ভালো জ্ঞানী লোককে আমি চিনি। তাকেই শালিশ মানা হোক। হযরত ওমর রাজী হলেন। উভয়ে শুরাইহের নিকট উপস্থিত হলেন। প্রথমে বেদুইন বাদী হয়ে নালিশ করলে শুরাইহ খলিফাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আমীরুল মুমিনীন! আপানি কি ঘোড়াটি সুস্থ অবস্থায় কিনেছিলেন?

হযরত ওমর বললেন, হ্যাঁ।

শুরাইহ বললেন ঃ তাহলে হয় আপনি ঘোড়াটির মূল্য দিয়ে কিনে নিন। নচেত যে অবস্থায় কিনেছিলেন সেই অবস্থায় ফেরত দিন।

এ কথা শুনে খলিফা ওমর (রাঃ) চমৎকৃত হয়ে বললেন ঃ "এটাই সঠিক বিচার বটে। তুমি সম্পূর্ণ নির্ভুল মত ও ন্যায্য রায় দিয়েছ। তুমি কুফা চলে যাও। আজ থেকে তুমি কুফার বিচারপতি।"

সেই থেকে দীর্ঘ ষাট বছর যাবত পর্যন্ত তিনি মুসলিম জাহানের বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। যতদূর জানা যায়, হযরত আলীর সময়ে তিনি খলিফার বিরুদ্ধে অনুরূপ আর একটি রায় দিয়ে প্রধান বিচারপতির পদে উন্নীত হন। তার পর উমাইয়া শাসনামলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের অবর্ণনীয় অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে তিনি নিজে পদত্যাগ না করা পর্যন্ত কোন শাসকই তাকে পদচ্যুত করতে সাহস পায়নি।

হযরত আলী (রাঃ) একবার তার অতিপ্রিয় একটি বর্ম হারিয়ে ফেলেন। কিছুদিন পর জনৈক ইহুদীর হাতে সেটি দেখেই চিনে ফেলেন। লোকটি কুফার বাজারে ওটা বিক্রয় করতে এনেছিল। হযরত আলী তাকে বললেন ঃ

"এতো আমার বর্ম! আমার একটি উটের পিঠ থেকে এটি অমুক রাত্রে অমুক জায়গায় পড়ে গিয়েছিল।"

ইহুদী বললো ঃ "আমীরুল মুমিনীর! ওটা আমার বর্ম এবং আমার দখলেই রয়েছে।"

হযরত আলী পুনরায় বললেন ঃ "এটি আমারই বর্ম। আমি এটাকে কাউকে দানও করিনি, কারো কাছে বিক্রয়ও করিনি। এটি তোমার হাতে কিভাবে গেল?"

ইহুদী বললো ঃ "চলুন, কাযীর দরবারে যাওয়া যাক।"

হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ "বেশ, তাই হোক। চলো।"

তারা উভয়ে গেলেন বিচারপতি শুরাইহের দরবারে।

বিচারপতি শুরাইহ্ উভয়ের বক্তব্য জানতে চাইলে উভয়ে বর্মটি নিজের বলে যথারীতি দাবী জানালেন।

বিচারপতি খলিফাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "আমীরুল মুমিনীন! আপনাকে দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে।"

হযরত আলী বললেন ঃ "আমার ভৃত্য কিম্বার এবং ছেলে হাসান সাক্ষী আছে।"

শুরাইহ্ বললেন ঃ "আপনার ভৃত্যের সাক্ষ্য নিতে পারি। কিন্তু ছেলের সাক্ষ্য নিতে পারবো না। কেননা বাপের জন্য ছেলের সাক্ষ্য শরীয়তের আইনে অচল।"

হযরত আলী বললেন ঃ "বলেন কি আপনি? একজন বেহেস্তবাসীর সাক্ষ্য চলবে না? আপনি কি শোনেননি, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, হাসান ও হোসেন বেহেস্তের যুবকদের নেতা?"

শুরাইহ্ বললেন ঃ "শুনেছি আমীরুল মুমিনীন! তথাপি আমি বাপের জন্য ছেলের সাক্ষ্য গ্রহণ করবো না।"

অনন্যোপায় হযরত আলী ইহুদীকে বললেন ঃ "ঠিক আছে। বর্মটা তুমিই নিয়ে নাও। আমার কাছে এই দু'জন ছাড়া আর কোন সাক্ষী নেই।"

ইহুদী তৎক্ষণাৎ বললো ঃ "আমীরুল মুমিনীন ! আমি স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ওটা আপনারই বর্ম। কি আশ্চর্য! মুসলমানদের খলিফা আমাকে কাযীর দরবারে হাজির করে আর সেই কাযী খলিফার বিরুদ্ধে রায় দেয়। এমন সত্য ও ন্যায়ের ব্যবস্থা যে ধর্মে রয়েছে আমি সেই ইসলামকে গ্রহণ করছি। আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ....।"

অতঃপর বিচারপতি শুরাইহকে সে জানালো যে, "খলিফা সিফফীন যুদ্ধে যাওয়ার সময় আমি তার পিছু পিছু যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তার উটের পিঠ থেকে এই বর্মটি পড়ে গেলে আমি তা তুলে নেই।"

হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ "বেশ! তুমি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছ, তখন আমি ওটা তোমাকে উপহার দিলাম।"

এই লোকটি পরবর্তীকালে নাহরাওয়ানে হযরত আলীর নেতৃত্বে খারেজীদের সাথে যুদ্ধ করার সময় শহীদ হয়।

আর একবার কাযী শুরাইহের ছেলে জনৈক আসামীর জামিন হয়। আসামী জামিনে মুক্তি পেয়ে পালিয়ে গেলে শুরাইহ আসামীর বিনিময়ে ছেলেকে জেলে আটকান। যতদিন আসামীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি ততদিন সে জেলে আটক এবং কাযী সাহেব স্বয়ং বন্দী ছেলের জন্য জেলখানায় খাবার এগিয়ে দিয়ে আসতেন।

কাযী শুরাইহের আর এক ছেলে একবার এক গোত্রের সাথে জমীজমা সংক্রান্ত ব্যাপারে মোকদ্দমার সম্মুখীন হন। মোকদ্দমাটি শুরাইহের আদালতেই আসার কথা ছিল। তাই পিতার সাথে আগেভাগেই পরামর্শ করার জন্য ছেলেটি একদিন বললোঃ আব্বা, আপনি আমার মামলার বিবরণটি পুরোপুরি শুনে আমাকে বলুন আমার জেতার সম্ভাবনা আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে আমি মামলাটি রুজু করবো। নচেত বিরত থাকবো।

বিচারপতি শুরাইহ পুরো ঘটনা শুনে ছেলেকে মামলা রুজু করার পরামর্শ দিলেন।

যথা সময়ে মামলার শুনানী শুরু হলো। শুনানী শেষে শুরাইহ নিজের ছেলের বিরুদ্ধে রায় দিলেন।

রাত্রে বাসায় এসে ছেলে পিতার কাছে অনুযোগের সুরে বললো ঃ "আব্বা, আপনি আমাকে এভাবে অপমান করলেন! আমি যদি আগেভাগে আপনার পরামর্শ না নিতাম, তা হলেও একটা সান্তনা ছিল। কিন্তু ......।"

কাযী শুরাইহ বললেন ঃ "হে বৎস! তুমি আমার কাছে পৃথিবীর সবার চাইতে প্রিয়; কিন্তু তোমার চেয়েও আল্লাহ আমার কাছে অনেক বেশী প্রিয়। আমি জানতাম, তোমার বিপক্ষের দাবীই সঠিক ও ন্যায়সংগত। কিন্তু তোমাকে সেটা জানিয়ে দিলে তুমি তাদের সাথে এমনভাবে আপোষ করে নিতে পারতে, যার ফলে তাদের প্রাপ্যের অংশ বিশেষ তোমাকে দিতে হতো। তেমনটি ঘটলে আমার ওপর আল্লাহ নারাজ হতেন। এজন্যই আমি তোমাকে মামলা আদালতে আনবার পরামর্শ দিয়েছিলাম। এখন তোমার খুশী হওয়া উচিত যে, তুমি অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পত্তি দখল করা থেকে রক্ষা পেলে।"

বর্ণিত আছে যে, বিচারপতি শুরাইহ যখনই কোন মামলার শুনানী গ্রহণ করতেন, তখন সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্য দানের ভয়াবহ পরিণাম স্বরণ

করিয়ে দিতেন এবং বলতেন, "তোমাদের সাক্ষ্যের ওপরই এই মামলার রায় নির্ভরশীল। এখনো সময় আছে, তোমরা ইচ্ছা করলে সাক্ষ্য না দিয়েও চলে যেতে পারো।"

এরপরও যখন সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিতে চাইতো; তিনি সাক্ষ্য নিতেন এবং রায় দেয়ার সময় বিজয়ী পক্ষকে হুশিয়ার করে দিতেন যে, "শুধুমাত্র সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই আমি এই রায় দিলাম। আল্লাহ যা হারাম করেছেন,এই রায় দ্বারা তা হালাল হবে না।"

সম্ভবতঃ এসব দুর্লভ গুণ বৈশিষ্ট্যের কারণেই হাজার হাজার জ্ঞানীগুণী সাহাবী বেঁচে থাকা সত্ত্বেও হযরত ওমরের আমল থেকে শুরু করে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসনামল পর্যন্ত দীর্ঘ ৬০ বছর ব্যাপী কাযী শুরাইহ মুসলিম জাহানের প্রধান বিচারপতির পদে বহাল থাকেন।

২১। হযরত উসমানের দানশীলতা ও মিতব্যয়িতা

একদিন এক নিঃস্ব লোক রাসূলের নিকট এসে কিছু সাহায্য চাইল। তখন রাসূলের নিকট কিছুই ছিল না, তিনি লোকটাকে হযরত উসমানের নিকট পাঠালেন। দরিদ্র ব্যক্তিটি হযরত উসমানের গৃহে উপস্থিত হয়ে দেখে যে একদল পিঁপড়ে বেশ কিছু শস্য একটি স্তুপ থেকে গর্তে নিয়ে যাচ্ছে। হযরত উসমান শস্যগুলো একত্রিত করে কিছু শস্য পিঁপড়ের গর্তের কাছে ছড়িয়ে বাকীগুলো আবার স্তুপে রেখে দিচ্ছিলেন। লোকটি ধারণা করলো যে হযরত উসমান বড় কৃপণ। সে মনে মনে ভাবলো যে দরিদ্র হওয়া স্বত্ত্বেও সে নিজে পিঁপড়ের মুখ থেকে শস্য কেড়ে নিতো না। তাই কিছুই না চেয়ে লোকটি চলে গেল।

পরদিন লোকটি আবার রাসূলের নিকট উপস্থিত হল এবং কিছু চাইল। সে রাসূলকে জানাল যে, কৃপণ উসমানের (রাঃ) নিকট কিছুই আশা করা যায় না, তাই সে কিছুই চায়নি। রাসূল (সাঃ) তাকে আবার হযরত উসমানের নিকট পাঠালেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকটি গেল এবং দেখতে পেল যে হযরত উসমান তার চাকরকে বাতির সলতে উঁচু করে দেওয়ার দায়ে বকাঝকা করছেন। কারণ তাতে অধিক তেল খরচ হয়। দরিদ্র লোকটি মনে মনে ভাবলো যে তার বাড়ীতে আলো আরও উজ্জ্বলভাবে জ্বলে এবং সে কখনও এরূপ তেলের হিসাব করে না। হযরত উসমানের কৃপণতা সম্বন্ধে তার ধারণা আরো জোরদার হলো। কিছু না চেয়েই লোকটি আবার রাসূলের নিকট ফিরে গেল। হযরত উসমানের বিরুদ্ধে কৃপণতার অভিযোগ শুনে রাসূল (সাঃ) মৃদু

হাসলেন এবং লোকটিকে আবার বললেন হযরত উসমানের কাছে ফিরে যেতে এবং কিছু চাইতে।

তৃতীয়বার লোকটি উসমানের নিকট এসে দেখে যে হযরত উসমানের বাড়ীতে তুলা শুকাতে দেয়া হয়েছে। ঢেকে দেয়া হয়েছিল জাল দিয়ে। জালের নিচ হতে কিছু কিছু তুলা বাতাসে উড়িয়ে নিচ্ছিল। হযরত উসমান সেই তুলাগুলোকে সংগ্রহ করে এনে আবার জালের নিচে রাখছিলেন। লোকটির মন অত্যন্ত বিরূপ হয়ে উঠলো। ভাবলো এমন কৃপণও কি কিছু দান করতে পারে? তবুও যেহেতু রাসূল তাকে তিনবার উসমান (রাঃ)-এর কাছে পাঠিয়েছেন, তাই সে গিয়ে কিছু চাইল।

হযরত উসমান (রাঃ) ভাবলেন, লোকটিকে কি দেওয়া যায়, যে লোককে রাসূল তার নিকট সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছেন, তার চাইতে সাহায্য নেয়ার যোগ্য আর কে হতে পারে? তখন দেখা গেল বেশ দূরে একটি সরু রেখা। রেখাটিকে একটি উটের কাফেলা বলেই মনে হল। কিছুক্ষণ পর হযরত উসমান বুঝতে পারলেন, যে কাফেলা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গিয়েছিল সেটাই ফিরে আসছে। হযরত উসমান তাকে লিখে দিলেন যে ঐ কাফেলার সবচেয়ে ভাল উটটি এবং যার ওপর সবচেয়ে বেশী দ্রব্য সম্ভার আছে সেটিই সে নিতে পারে। লোকটি প্রথম মনে করল যে হযরত উসমান তামাসা করছেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরও লোকটি তার দান সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারল না। সন্দিগ্ধ চিত্তে লোকটি গেল কাফেলার নিকট। সবচেয়ে ভালো এবং প্রথম উটটিই তার পছন্দ হল। সেটি সে নিতে চাইল। কাফেলার পরিচালক অনুমতি দিল। কিন্তু মরুভূমিতে চলাকালে প্রথম উটটিকে কাফেলা থেকে সরিয়ে নেওয়া সহজ নয়। সবগুলো উটই প্রথমটিকে অনুসরণ করল। কাফেলার পরিচালক তখন লোকটিকে বললো যে আস্তানায় ফিরে যাওয়ার পর উটটি দেয়া হবে। হযরত উসমানের নিকট খবর দেওয়া হলো যে একটি উটকে কাফেলা থেকে সরিয়ে নেয়া সম্ভব হয়নি। তাই তখন তার নির্দেশ পালন করা হয়নি। খবর শুনে হযরত উসমান (রাঃ) বললেন, হয়ত আল্লাহর ইচ্ছা এই যে, কাফেলার সবগুলো উটই লোকটি পাবে। অতঃপর তিনি কাফেলার পরিচালককে নির্দেশ দিলেন যে সবগুলো উটই যেন লোকটিকে দিয়ে দেয়া হয়। লোকটি তো বিস্ময়ে অবাক। অতো বড় কৃপণের কি করে এতো বড় দান করা সম্ভব হলো? হতবাক হয়ে সে তার পূর্ববর্তী তিন অভিজ্ঞতা জানাল এবং দু'প্রকার ব্যবহারের তাৎপর্য কি জানতে চাইল।

হযরত উসমান যে জওয়াব দিলেন তার সারমর্ম এই যে, আল্লাহ বিশ্বের সমস্ত সম্পদের মালিক, মানুষ হলো তত্ত্বাবধানকারী বা পাহারাদার। সে শুধুমাত্র আল্লাহর ইচ্ছানুসারে সম্পদ নিজের জন্য এবং সমাজের অপরাপর

ব্যক্তির কল্যাণের জন্য ব্যয় করতে পারবে। মানুষের কাজ হল আল্লাহর সম্পদ নিজের মর্জিমত রক্ষণাবেক্ষণ করা। যদি কোনো ব্যক্তির তত্ত্বাবধানকালে কোনো সম্পদের এক কণামাত্র বিনষ্ট হয় তবে তার জন্য আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে। সম্পদের অধিকার শুধু বিশেষ সুবিধা নয়, বরং একটি বিরাট দায়িত্ব।"

শিক্ষা ঃ মুমিনকে অবশ্যই দানশীল হতে হবে, কিন্তু সে কখনো অপচয়কারী ও অপব্যয়কারী হতে পারবে না। কেননা "অপচয় ও অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই।" (আল-কুরআন)

২২। সাতশো গুণ লাভ

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর খেলাফতকালে এক দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়। খাদ্যদ্রব্য একেবারেই দুর্লভ হয়ে পড়ে এবং মানুষের দুঃখ দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে। এই সময়ে হযরত ওসমানের প্রায় এক হাজার মন গমের একটি চালান বিদেশ থেকে মদীনায় পৌঁছলো। শহরে কয়েকজন ব্যবসায়ী তাঁর কাছে এলো। তারা তাঁর সমস্ত গমের চালান শতকরা ৫০ ভাগ লাভে কিনে নেয়ার প্রস্তাব দিল। সেই সাথে তারা এও ওয়াদা করলো যে, তারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের দুর্দশা লাঘবের জন্যই এটা কিনতে চাইছে।

হযরত ওসমান বললেন, "তোমরা যদি আমাকে এক হাজার গুণ লাভ দিতে পার, তবে আমি দিতে পারি। কেননা অন্য একজন আমাকে সাতশো গুণ লাভ দিতে চেয়েছে।"

ব্যবসায়ীরা বললো, "বলেন কি? চালান মদীনায় আসার পর তো আমরাই প্রথম আপনার কাছে এলাম। সাতশো গুণ লাভের প্রস্তাব কে কখন দিলো?"

হযরত ওসমান বললেন, "এই প্রস্তাব আমি পেয়েছি আল্লাহর কাছ থেকে। আমি এই চালানের সমস্ত গম বিনা মূল্যে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করবো। এর বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে সাতশো গুণ বেশী পূণ্য দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন।"

শিক্ষা ঃ পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ২৬১ নং আয়াতে এই ওয়াদার উল্লেখ রয়েছে। হযরত ওসমান (রাঃ) সম্ভবতঃ ঐদিকেই ইংগিত করেছেন। হযরত ওসমানের মহানুভবতার এই ঘটনা বিপন্ন মানুষের সেবাকে ইসলাম কত গুরুত্ব দেয়, তারই প্রমাণ বহন করে। জনসেবা ও ত্যাগের এই মনোভাব বিশেষভাবে ধনীদের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া খুবই জরুরী।

২৩। হযরত আলীর (রাঃ) খোদাভীতি

হযরত আলী (রাঃ) তখন মুসলিম জাহানের খলিফা। একদিন তার ছোট ভাই আকীল তার কাছে এসে নিজের অনেক অভাব অভিযোগের কথা জানালেন এবং তাকে কিছু সাহায্য দেয়ার অনুরোধ করলেন। হযরত আলী বললেন, জনগণের সম্পদের কোষাগার বাইতুল মাল থেকে আমি তোমাকে এক কপর্দকও দিতে পারবো না। মাসের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আমি বেতন পেলে তা থেকে তোমাকে কিছু দেয়া যাবে। হযরত আকীল বললেন, আপনি নিজের বেতন অগ্রিম নিয়ে নিন। হযরত আলী বললেন, আমার বেতন অন্য সকলের বেতনের সাথে আসবে। অগ্রিম নেয়ার কোন অধিকার আমার নেই। হযরত আকীল নাছোড় বান্দা। তিনি বললেন, একটা কিছু করুন। আমার সংসার চলছে না। যেভাবেই হোক আমাকে কিছু সাহায্য দিন। হযরত আলী বললেন, বাজারের কোন দোকান থেকে তালা ভেঙ্গে কিছু নিয়ে যাও। আকীল বললেন, ওটা তো চুরি বা ডাকাতি বলে গণ্য হবে। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, এই মুহূর্তে আমি যদি তোমাকে বাইতুল মাল থেকে কিছু নিয়ে দেই তবে তাও চুরি বা ডাকাতি বলে গণ্য হবে। কেননা ওটা জনগণের সম্পদ এবং জনগণ আমাকে ওখান থেকে নেয়ার অনুমতি দেয়নি।

অগত্যা হযরত আকীল হযরত মোয়াবিয়ার নিকট গেলে তিনি তাকে একশো দিরহাম দিয়ে বললেন, তুমি মসজিদে দাঁড়িয়ে সকলকে জানাবে যে, আলীর কাছে সাহায্য চেয়ে পাইনি, কিন্তু মোয়াবিয়ার কাছে চেয়ে পেয়েছি।

ইত্যবসরে আকীল হযরত আলীর বক্তব্যের যৌ ক্তিকতা বুঝতে পারলেন। তিনি মসজিদে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আলীর কাছে অন্যায়ভাবে সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি খোদভীতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর মোয়াবিয়ার কাছে সাহায্য চাইলে তিনি খোদভীতির পরিবর্তে আমাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

২৪। অধিক সম্পদের মোহ ও কৃপণতার পরিণাম

একবার সালাবা ইবনে হাতেম আনসারী নামক এক সাহাবী রাসূল (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ), আমার জন্য দোয়া করুন, যেন আমি অনেক বড় ধনী হতে পারি। রাসূল (সাঃ) বললেনঃ আমি যে নীতি অনুসরণ করে চলছি, তা কি তোমার পছন্দ নয়? আল্লাহর কসম, আমি ইচ্ছা করলে মদীনার পাহাড়গুলো সোনা হয়ে আমার সাথে সাথে ঘুরতো। কিন্তু এমন ধনী হওয়া আমার পছন্দ নয়। এ কথা শুনে লোকটি

ফিরে গেল, কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এল। এবার সে বললোঃ হে রাসূল (সাঃ), আমি ওয়াদা করছি যে, আমি যদি ধনী হয়ে যাই তাহলে প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য পৌঁছে দেব। এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ) তার বিপুল ধনসম্পদ হোক- এই মর্মে দোয়া করলেন। এর ফলে তার ছাগল ভেড়া ইত্যাদিতে অসাধারণ প্রবৃদ্ধি দেখা দিল। ফলে মদীনার যে জায়গায় সে বাস করতো তাতে তার আর স্থান সংকুলান হলো না। সে মদীনার বাইরে চলে গেল। তবে যোহর ও আসরের নামায মদীনার মসজিদে নববীতে পড়তো। আর অন্যান্য নামায সে নিজের বাসস্থানেই পড়তো।

এরপর তার গৃহপালিত পশুর সংখ্যা আরো বেড়ে গেল। এর ফলে নতুন জায়গাটিও তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে দাঁড়ালো। তাই সে মদীনা থেকে আরো দূরে যেয়ে থাকতে আরম্ভ করলো। সেখান থেকে সে শুধু জুমার নামায মদীনায় এসে পড়তে পারতো। অন্যান্য নামায নিজের বাসস্থানেই পড়তো। ক্রমে তার সম্পদ আরো বেড়ে গেলে তাকে আরো দূরে চলে যেতে হলো। সেখান থেকে সে জুমার নামাযেও মসজিদে আসতে পারতো না।

কিছুদিন পর রাসূল (সাঃ) সালাবা সম্পর্কে লোকদের কাছে খোঁজ-খবর জানতে চাইলেন। তাঁকে জানানো হলো যে, সালাবার সম্পদ এত বেশী হয়েছে যে, শহরের কাছে কোথাও তার স্থান সংকুলান হয়নি। তাই এখন সে আর এদিকে আসে না। এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ) তিনবার বললেন, "ইয়া ওয়াইহা সালাবা!" অর্থাৎ সালাবার জন্য আফসোস!

ঠিক এই সময় যাকাতের আয়াত নাযিল হয়। তাতে রাসূল (সাঃ) কে মুসলমানদের কাছ থেকে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি যাকাত আদায়ের জন্য মুসলমানদের কাছে লোক পাঠালেন। কয়েকজন লোককে সালাবার কাছে পাঠালেন। আর কয়েকজনকে বনু সুলাইমের আর এক ধনীর কাছেও পাঠালেন।

যখন আদায়কারীরা সালাবার কাছে গিয়ে যাকাত চাইল এবং রাসূল (সাঃ) এর লিখিত ফরমান দেখালো; তখন সালাবা বলতে লাগলো, এতো জিযিয়া কর হয়ে গেল, যা অমুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা হয়। তারপর বললো, এখন আপনারা যান। ফেরার পথে আসবেন। তখন তারা চলে গেলেন।

পক্ষান্তরে বনু সুলাইমের ধনী লোকটি রাসূল (সাঃ) এর আদেশ শুনে নিজের গৃহপালিত পশুর মধ্য থেকে বেছে বেছে উৎকৃষ্ট মানের পশু যাকাত হিসেবে দিলেন। আদায়কারীরা বললেন, আমাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে,

উৎকৃষ্ট মানের পশু যেন না নেই। বনু সুলাইমের ধনী লোকটি বললো, আমি নিজের ইচ্ছায় দিচ্ছি। দয়া করে গ্রহণ করুন।

অতঃপর আদায়কারীগণ সালাবার কাছে গেলে সে বললোঃ "কই, দেখি যাকাতের আইন আমাকে দেখাও। তারপর তা দেখে আবার বলতে লাগলোঃ আমি তো মুসলমান। অমুসলমানদের মত জিযিয়া কেন দিতে যাবো? যা হোক, আপনারা এখন যান। আমি পরে ভেবে চিন্তে জানাবো।

যখন আদায়কারীরা রাসূল (সাঃ) এর কাছে ফিরে গেল। তখন সকল বৃত্তান্ত শুনে রাসূল (সাঃ) আবার তিনবার বললেন, 'সালাবার জন্য আক্ষেপ!' আর সুলাইমের জন্য দোয়া করতে লাগলেন। এরপর সালাবার প্রতি ইঙ্গিত করে সুরা তাওবার একটি আয়াত নাযিল হয়। তাতে এই ধরনের লোকদের নিন্দা করা হয়, যারা সম্পদশালী হলে হকদারদের হক দেবে বলে ওয়াদা করেছে, কিন্তু পরে সেই ওয়াদা ভুলে গিয়ে কৃপণতা করতে আরম্ভ করেছে। আয়াতে বলা হয় যে, এ ধরনের লোকদের মনে আল্লাহ মোনাফেকী গভীরভাবে বদ্ধমূল করে দিয়েছেন।

রাসূল (সাঃ) যখন সালাবার জন্য তিনবার আক্ষেপ প্রকাশ করলেন এবং কুরআনের আয়াতও নাযিল হলো, তখন সেখানে সালাবার একজন আত্মীয় ছিল। সে গিয়ে সালাবাকে সব জানালো এবং তাকে তার আচরণের জন্য তিরস্কার করলো। সালাবা ভীষণ ঘাবড়ে গেল এবং মদীনায় হাজির হয়ে বললো, 'হে রাসূল, আমার যাকাত গ্রহণ করুন। রাসূল (সাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমার যাকাত গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এ কথা শুনে সালাবা আফসোস করতে লাগলো।

রাসূল (সাঃ) বললেনঃ এটা তো তোমার নিজের কৃতকার্যের ফল। আমি তোমাকে হুকুম করেছিলাম। তুমি তা মাননি। এখন আর তোমার যাকাত কবুল হতে পারে না। তখন সালাবা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেল। এর কিছুদিন পরই রাসূল (সাঃ) ইন্তেকাল করেন। এরপর সালাবা যথাক্রমে হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) কে যাকাত গ্রহণ করার আবেদন জানায়। কিন্তু তারা রাসূল (সাঃ) এর নীতি অনুসরণ করেন। হযরত ওসমানও তার যাকাত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। হযরত উসমানের খেলাফত আমলেই তার মৃত্যু হয়। (মায়া'রিফুল কুরআনের সৌ জন্যে)

শিক্ষা ঃ হালাল সম্পদে ধনী হওয়ার আশা ও চেষ্টা করা যদিও বৈধ। তথাপি এত বেশি সম্পদের লোভ করা উচিত নয়, যা মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আর প্রাপ্ত সম্পদের যাকাত ও সদকা দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করা উচিত নয়।

২৫। হযরত আবু যার গিফারীর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবু যার গিফারী তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেনঃ আমি যখন জানতে পারলাম যে, মক্কায় এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন, তখন আমি আমার ভাইকে ঐ ব্যক্তির (মুহাম্মাদ সাঃ) নিকট পাঠালাম এবং তাঁর সম্পর্কে সর্বস্তরে জেনে আসতে বললাম। সে গেল, তাঁর সাথে দেখা করলো এবং ফিরে এসে আমাকে জানালো যে, তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি সৎ কাজের আদেশ দেন এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন। কিন্তু আমি তার এই বিবরণে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।

অগত্যা আমি নিজে কিছু খাবার ও একটা লাঠি নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওনা হলাম। মক্কায় পৌঁছে আমি এক বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গেলাম। আমি তাকে চিনতামও না, আবার কোরেশদের ভয়ে কাউকে তার কথা জিজ্ঞাসাও করতে পারছিলাম না। তাই আমি যমযমের পানি পান করে দিন কয়েক মসজিদুল হারামেই কাটিয়ে দিলাম।

একদিন আলী আমার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় আমার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ মনে হয় তুমি বহিরাগত। আমি বললামঃ সত্যিই তাই। তিনি বললেনঃ তবে আমার বাড়ী চল। আমি তার সাথে চললাম। পথে তিনিও আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, আমিও তাকে কিছু বললাম না। আলীর বাড়ীতে রাত কাটিয়ে ভোর বেলা আবার মসজিদুল হারামে গিয়ে হাজির হলাম। ভাবলাম, সুযোগমত কাউকে জিজ্ঞাসা করবো। কিন্তু এদিনও তেমন সুযোগ হলো না।

আলী আজও আমার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেনঃ লোকটা কি থাকার কোন জায়গাই পেলনা যে, মসজিদুল হারামেই ক্রমাগত থাকতে আরম্ভ করেছে? আমি বললামঃ না ভাই, জায়গা পাইনি। তিনি বললেন, আমার সাথে চল। পথিমধ্যে তিনি বললেন, তোমার হয়েছেটা কী? কী চাও এখানে? আমি বললাম, আমার ব্যাপারটা যদি গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন তাহলে বলতে পারি। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমি তখন তাকে সমস্ত কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন, ঠিক আছে। তুমি আমার সাথে চল। আমি সেই ব্যক্তির কাছেই যাচ্ছি। আমি যেখানে প্রবেশ করবো, তুমিও সেখানে প্রবেশ করবে। আর পথিমধ্যে যদি তোমার জন্য ক্ষতিকর কোন লোক দেখি, তাহলে আমি জুতো ঠিক করার ভান করে বসে পড়বো, তুমি চলতে থাকবে। তাহলে কেউ তোমাকে আমার সাথী বলে সন্দেহ করবে না।

এরপর আমি তাকে অনুসরণ করে চলতে লাগলাম। অবশেষে তিনি রাসূল (সাঃ) এর কাছে উপনীত হলেন এবং আমিও উপনীত হলাম। আমি নবীকে বললাম, আমার সামনে ইসলাম পেশ করুন। তিনি পেশ করলেন। আমি তৎক্ষণাত ইসলাম গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আবু যার, তোমার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা আপাততঃ কারো কাছে প্রকাশ না করে সরাসরি নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে যাও। তারপর আমাদের বিজয় হলে এসো। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, এই বাণী আমি নিশ্চয়ই লোক সমক্ষে প্রকাশ করবো। এই বলে মসজিদুল হারামে এসে কুরাইদেরকে সম্বোধন করে বললামঃ হে কুরাইশগণ, শোন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

আর যায় কোথায়। আমাকে ধর্মত্যাগী বলে গাল দিয়ে সবাই ধর ধর বলে তেড়ে এলো এবং আমাকে পিটিয়ে আধমরা করে ফেললো। আব্বাস এসে আমাকে রক্ষা করলেন। পরদিন আবার একইভাবে ঘোষণা করলাম এবং কুরাইশদের হাতে একইভাবে গণপিটুনি খেলাম। এই ছিল আমার ইসলাম গ্রহণের প্রথম অবস্থা।

শিক্ষা ঃ অতিমাত্রায় বৈরী পরিবেশে নিজের ইসলামী পরিচয় প্রকাশ করে বিপদ ডেকে আনা অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার কাজ। হযরত আবু যাবের সিদ্ধান্ত টি ছিল নিতান্ত ব্যক্তিগত ও ব্যতিক্রমধর্মী। সাধারণ মানুষের পক্ষে এরূপ করা উচিত নয়।

২৬। পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করার পরিণাম

ইমাম তাবরানী ও ইমাম আহমাদ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সাঃ) এর যুগে আলকামা নামে মদীনায় এক যুবক বাস করতো। সে নামায, রোযা ও সদকার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত বন্দেগীতে অতিশয় অধ্যবসায় সহকারে লিপ্ত থাকতো। একবার সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে তার স্ত্রী রাসূল (সাঃ) এর কাছে খবর পাঠালো যে, "আমার স্বামী আলকামা মুমূর্ষ অবস্থায় আছে। হে রাসূল, আমি আপনাকে তার অবস্থা জানানো জরুরী মনে করছি।" রাসূল (সাঃ) তৎক্ষণাৎ হযরত আম্মার, সুহাইব ও বিলাল (রাঃ) কে তার কাছে পাঠালেন। তাদেরকে বলে দিলেন যে, "তোমরা তার কাছে গিয়ে তাকে কালেমায়ে শাহাদাত পড়াও।" তারা গিয়ে দেখলেন, আলকামা মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছে। তাই তারা তাকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পড়াতে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সে কোন মতেই কলেমা উচ্চারণ করতে পারছিল না।

অগত্যা তারা রাসূল (সাঃ) কে খবর পাঠালেন যে, আলকামার মুখে কলেমা উচ্চারিত হচ্ছে না। যে ব্যক্তি এই সংবাদ নিয়ে গিয়েছিল, তার কাছে রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আলকামার পিতামাতার মধ্যে কেউ কি জীবিত আছে?" সে বললোঃ "হ্যাঁ রাসূল, তার কেবল বৃদ্ধা মা বেঁচে আছে।" রাসূল (সাঃ) তৎক্ষণাত তাকে আলকামার মায়ের কাছে পাঠালেন এবং বললেনঃ 'তাকে গিয়ে বল যে, তুমি যদি রাসূল (সাঃ) এর কাছে যেতে পার তবে চল, নচেত অপেক্ষা কর, তিনি তোমার সাথে সাক্ষাত করতে আসছেন।" দূত আলকামার মায়ের কাছে উপস্থিত হয়ে রাসূল (সাঃ) যা বলেছিলেন তা জানালে আলকামার মা বললেন ঃ রাসূল (সাঃ) এর জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক। তার কাছে বরং আমিই যাবো।" বৃদ্ধা লাঠি ভর দিয়ে রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে সালাম করলেন। রাসূল (সাঃ) সালামের জবাব দিয়ে বললেনঃ "ওহে আলকামার মা, আমাকে আপনি সত্য কথা বলবেন। আর যদি মিথ্যা বলেন, তবে আল্লাহর কাছ থেকে আমার কাছে ওহি আসবে। বলুন তো, আপনার ছেলে আলকামার স্বভাব চরিত্র কেমন ছিল?" বৃদ্ধা বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল, সে প্রচুর পরিমাণে নামায, রোযা ও সদকা আদায় করতো।" রাসূল (সাঃ) বললেনঃ তার প্রতি আপনার মনোভাব কী? বৃদ্ধা বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল, আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট।" রাসূল (সাঃ) বললেন, "কেন?" বৃদ্ধা বললেনঃ, "সে তার স্ত্রীকে আমার ওপর অগ্রাধিকার দিত এবং আমার আদেশ অমান্য করতো।" রাসূল (সাঃ) বললেনঃ "আলকামার মায়ের অসন্তোষ হেতু কলেমা উচ্চারণে আলকামার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে গেছে।" তারপর রাসূল (সাঃ), বললেনঃ "হে বিলাল, যাও, আমার জন্য প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠ যোগাড় করে নিয়ে এস।"

বৃদ্ধা বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল, কাষ্ঠ দিয়ে কী করবেন?" রাসূল (সাঃ) বললেনঃ "আমি ওকে আপনার সামনেই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেব।" বৃদ্ধা বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমার সামনেই আমার ছেলেকে আগুন দিয়ে পোড়াবেন। তা আমি সহ্য করতে পারবো না।" রাসূল (সাঃ) বললেনঃ "ওহে আলকামার মা, আল্লাহর আযাব এর চেয়েও কঠোর এবং দীর্ঘস্থায়ী। এখন আপনি যদি চান যে, আল্লাহ্ আপনার ছেলেকে মাফ করে দিক, তাহলে তাকে আপনি মাফ করে দিন এবং তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। নচেত যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ তার কসম, যতক্ষণ আপনি তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকবেন, ততক্ষণ নামায-রোযা ও সদকা দিয়ে আলকামার কোন লাভ হবে না।" একথা শুনে আলকামার মা বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল, আমি

আল্লাহকে, আল্লাহর ফেরেশতাদেরকে এবং এখানে যে সকল মুসলমান উপস্থিত তাদের সকলকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি আমার ছেলে আলকামার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছি।" রাসূল (সাঃ) বললেনঃ "ওহে বিলাল, এবার আলকামার কাছে যাও। দেখ, সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে পারে কিনা। কেননা, আমার মনে হয়, আলকামার মা আমার কাছে কোন লাজ-লজ্জা না রেখে যথার্থ কথাই বলেছে।" হযরত বিলাল (রাঃ) তৎক্ষণাত গেলেন। শুনতে পেলেন, ঘরের ভেতর থেকে আলকামা উচ্চস্বরে উচ্চারণ করছে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। অতঃপর বিলাল গৃহে প্রবেশ করে উপস্থিত জনতাকে বললেনঃ শুনে রাখ, আলকামার মা অসন্তুষ্ট থাকার কারণে সে প্রথমে কলেমা উচ্চারণ করতে পারেনি। পরে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়ায় তার জিহ্বা কলেমা উচ্চারণে সক্ষম হয়েছে। অতঃপর আলকামা সেই দিনই মারা যায় এবং রাসূল (সাঃ) নিজে উপস্থিত হয়ে তার গোসল ও কাফনের নির্দেশ দেন, জানাযার নামায পড়ান এবং দাফনে শরীক হন। অতঃপর তার কবরে দাঁড়িয়ে রাসূল (সাঃ) বলেনঃ "হে আনসার ও মুহাজেরগণ! যে ব্যক্তি মায়ের ওপর স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দেয় তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও সকল মানুষের অভিসম্পাত! আল্লাহ তার পক্ষে কোন সুপারিশ কবুল করবেন না। কেবল তওবা করে ও মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করলেই নিস্তার পাওয়া যাবে। মনে রাখবে, মায়ের সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তোষ এবং মায়ের অসন্তোষেই আল্লাহর অসন্তোষ।"

শিক্ষাঃ

১। আল্লাহর ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গে পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট রাখার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া উচিত এবং মৃত্যুর পূর্বে পিতা-মাতার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত।

২। মুমূর্ষ ব্যক্তিকে কালেমা পড়ানোর চেষ্টা করা ঘনিষ্ঠ লোকদের কর্তব্য।

২৭। কুরাইশ নেতাগণের গোপনে রাসূলুল্লাহর কুরআন পাঠ শ্রবণ

বর্ণিত আছে যে, একদিন রাতে আবু সুফিয়ান বিন হারব, আবু জাহল বিন হিশাম এবং আখনাস বিন শুরাইক-এই তিনজন শীর্ষস্থানীয় কুরাইশ নেতা রাসূল (সাঃ) এর কুরআন পাঠ শ্রবণের কৌ তুহল কোনভাবেই চেপে রাখতে না পেরে গোপনে বেরিয়ে পড়লো। এ সময় তিনি নিজের বাড়ীতে তাহাজ্জুদের নামাযে কুরআন পড়ছিলেন। এই তিনজনের প্রত্যেকে এমন একটি জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লো, যেখান থেকে সহজেই তেলাওয়াত

শুনা যায়। অথচ নিজেদের অবস্থা গোপন থাকে। তারা এমন দূরত্বে অবস্থান করতে লাগলো যে, কে কোথায় বসেছে তা কেউ জানতে পারেনি। রাতভর তারা পরম আগ্রহ সহকারে কুরআন পাঠ শুনলো। সকালে বাড়ীর দিকে ফেরার পথে পরস্পরের সাক্ষাত হলো। প্রত্যেকে পরস্পরকে তিরস্কার করে বলতে লাগলোঃ "ছি, ছি, এমন কাজ আর কখনো করো না। তোমাদের বখাটে চেলা-চামুন্ডাদের কেউ যদি তোমাদের এভাবে দেখে ফেলে, তাহলে আর রক্ষা নেই। তারা একটা খারাপ ধারণা নিয়ে বসবে।" তারপর সবাই চলে গেল।

পরদিন রাতে আবার তিনজনই নিজ নিজ গোপন জায়গায় এসে বসলো এবং সারারাত ধরে রাসূল (সাঃ) এর কুরআন পড়া শুনলো। সকাল বেলা আবার পরস্পরে সাক্ষাত এবং একই ধরনের আলাপ বিনিময় হলো। তারপর সবাই চলে গেল। তৃতীয় দিনও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। এবার তারা চূড়ান্তভাবে অঙ্গীকার করলো যে, এমন কাজ আর কখনো করবো না। তারপর সবাই বিদায় নিলো।

পরদিন সকালে বৃদ্ধ আখনাস তার লাঠিটা ভর করে রওনা হলো। প্রথমে আবু সুফিয়ানের কাছে হাজির হলো। সে বললোঃ "ওহে হানযালার বাবা! মুহাম্মাদের কাছ থেকে যা শুনলে সে সম্পর্কে তোমার মতামত কি?" আবু সুফিয়ান বললোঃ "আল্লাহর কসম, আমি কিছু কথা এমন শুনেছি, যা আমি জানি এবং তার অর্থও বুঝি। আবার কিছু কথা এমনও শুনলাম যার অর্থ বুঝলাম না। আখনাস বললোঃ "আল্লাহর কসম, আমার অবস্থাও তদ্রুপ।"

এরপর তার কাছ থেকে বিদায় নিযে সে আবু জাহলের কাছে গেল। আবু জাহলকে বললোঃ "ওহে আবুল হিকাম, মুহাম্মাদের কাছ থেকে যা শুনলে সে সম্পর্কে তোমার কি অভিমত?" সে বললো ঃ "কি আর বলবো। আমরা আর বনু আবদ মানাফ-এ দুটি কুরাইশী গোত্র আবহমান কাল ধরে মান ইজ্জত নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসেছি। আপ্যায়ন ও ভোজের আয়োজন তারাও করেছে, আমরা করছি। সামাজিক দায়দায়িত্ব তারাও বহন করেছে, আমরা করেছি। সব কিছুতে যখন আমরা সমানে সমানে টক্কর দিয়ে চলেছি, তখন হঠাৎ তারা বলে উঠলোঃ আমাদের ভেতর একজন নবী আছে, যার কাছে আকাশ থেকে ওহী আসে। এত বড় একটা জিনিসে আমরা তাদের সমকক্ষ হব কি করে? আল্লাহর কসম, আমরা তার ওপর কক্ষনো ঈমান আনবো না এবং কক্ষনো তাকে স্বীকৃতি দেবো না।" ও কথা শুনে তার কাছ থেকে বিদায় নিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

শিক্ষাঃ এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আল্লাহর দ্বীনের বিরোধীতা যারাই করে, তারা তাকে (দ্বীনকে) সত্য জেনেই নিছক কায়েমী স্বার্থের কারণেই করে। তাছাড়া তাদের ভেতরে একটা হীনমন্যতা সক্রিয় থাকে। আবু জাহল প্রমুখ কুরাইশ নেতাদের মধ্যে হীনমন্যতার কারণ ছিল এই যে, ওহির কারণে বনু হাশেমের সাথে তাদের সমকক্ষতা ও ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং বনু হাশেমের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়। আর এ যুগে কোন ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীরা হীনমন্যতায় ভুগবে এ জন্য যে, ইসলামী আন্দোলনের লোকেরা এত উন্নত মানের চরিত্র ও নিঃস্বার্থ জনসেবার নমুনা পেশ করে থাকে, যার সমকক্ষ তাঁরা কখনো হতে পারবে না। তাই ইসলামী চরিত্র সম্পন্ন লোকদের হাতে কখনো ক্ষমতা গেলে দেশবাসী দুর্নীতিমুক্ত শাসনের স্বাদ পাবে। ফলে ধর্মহীন শক্তিগুলোকে জনগণ আর কক্ষনো ক্ষমতায় আসতে দেবে না। এ কারণে এ যুগের প্রতিষ্ঠিত জাহেলী শক্তিও সর্বশক্তি দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা করে থাকে।

এ ঘটনা থেকে আরো জানা যায় যে, ইসলামের শত্রুদেরও সাধারণ মনস্তত্ব হলো ইসলামের তাত্ত্বিক বিষয় তাদের জানার প্রচ্ছন্ন কৌ তুহল থাকে। নেতৃস্থানীয় লোকেরা এ কৌ তুহল পার্থিব স্বার্থের কারণে দমন করে থাকে। কিন্তু শত্রুতা যতই তীব্র হয়, তাদের প্রভাবাধীন সাধারণ মানুষের মনে ইসলামকে জানার আগ্রহ ততই প্রবল হয়ে থাকে।

২৮। তাবুক অভিযানে অনুপস্থিত তিন সাহাবীর তওবার কাহিনী

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেনাপতিত্বে যে কয়টি যুদ্ধ বা যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে তাবুক যুদ্ধাভিযান অন্যতম। যদিও প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতির কারণে এ যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত সংঘটিত হয়নি। কিন্তু তথাপি যুদ্ধের নির্দ্ধারিত স্থান তাবুক-এ মুসলিম বাহিনীকে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে ও সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সদলবলে যেতে হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের পর এটাই ছিল ইসলামের সর্বশেষ বৃহত্তম যুদ্ধাভিযান। এই অভিযানের জন্য সাহাবায়ে কেরামের কারো শারীরিক অনুপস্থিতির অনুমতি তো ছিলই না, অধিকন্তু প্রত্যেক সাহাবীকে সাধ্যমত সর্বোচ্চ পরিমাণ আর্থিক সাহায্য দেয়ার আহবান জানানো হয়েছিল। তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে যখন আর্থিক সাহায্য চাওয়া হয়, তখন হযরত ওমর (রাঃ) নিজের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তির অর্ধেক আর হযরত আবু বকর (রাঃ) সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি দান করেছিলেন।

কিন্তু তিনজন সাহাবী এই যুদ্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে বিনা ওজরে অনুপস্থিত ছিলেন। তারা হলেন কা'ব বিন মালেক, হিলাল ইবনে উমাইয়া ও মুরারা বিন রাবী'। এই তিনজন সাহাবী সম্পর্কে অপর কোন সাহাবীর এমনকি স্বয়ং রাসূল (সাঃ)-এরও কখনো কোন অভিযোগ বা সংশয় ছিল না। তাঁদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় কখনো কোন খাদ ছিল না। তথাপি সর্বোচ্চ গুরুত্ববহ এই অভিযানে তারা সম্পূর্ণ বিনা ওজরে অনুপস্থিত থাকেন। এ সংক্রান্ত বিশদ ঘটনা স্বয়ং হযরত কা'ব ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

কা'ব বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নেতৃত্বে যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তন্মধ্যে তাবুক ও বদর ছাড়া আর কোনটাতেই আমি অনুপস্থিত থাকিনি। তবে বদর যুদ্ধে যারা অনুপস্থিত ছিলেন তাদের কাউকে আল্লাহর আক্রোশের সম্মুখীন হতে হয়নি। কেননা বদর যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) এর উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের কাফেলাকে ধাওয়া করা। এরূপ করতে গিয়ে হঠাৎ এক সময় যুদ্ধ বেঁধে যায়। আকাবার রাতে রাসূল (সাঃ) ইসলামের ওপর দৃঢ়ভাবে টিকে থাকা এবং ইসলাম ও রাসূল (সাঃ) কে সাহায্য করার জন্য মোট যে ৭০ জনের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। ঐ রাতটি আমার কাছে যুদ্ধের চেয়েও প্রিয় ছিল।

তাবুক যুদ্ধের সময় আমি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ও স্বচ্ছল অবস্থায় ছিলাম। এ সময় আমার কাছে দুটো সওয়ারী ছিল, যা এর আগে কখনো ছিল না। রাসূল (সাঃ)-এর নিয়ম ছিল, যখনই কোন যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিতেন, কখনো পরিস্কারভাবে স্থান, এলাকা বা কোন্ দিকে যাওয়া হবে তাও পর্যন্ত জানাতেন না। কিন্তু তাবুক যুদ্ধের সময়টা ছিল ভীষণ গরমের সময়। পথও ছিল দীর্ঘ এবং তার কোথাও গাছপালা, লতাপাতা ও পানি ছিল না আর শত্রুর সংখ্যাও ছিল অত্যধিক। তাই রাসূল (সাঃ) মুসলমানদেরকে যুদ্ধের সকল প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, যাতে তারা ভালোভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। এ সময় রাসূল (সাঃ) এর সহযোদ্ধার সংখ্যা ছিল বিপুল। তবে তাদের নাম ধাম লেখার জন্য কোন খাতাপত্র বা রেজিষ্ট্রার ছিল না। এ যুদ্ধ থেকে অনুপস্থিত থাকতে চায় - এমন লোক একজনও ছিল না। তবে সকল সাহাবী এও মনে করতেন যে, কেউ যদি অনুপস্থিত থাকে, তবে আল্লাহর ওহী না আসা পর্যন্ত রাসূল (সাঃ) তা জানতে পারতেন না।

রাসূল (সাঃ) যখন এ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, তখন ফল পেকে গিয়েছিল এবং ছায়া খুবই ভালো লাগতো। রাসূল (সাঃ) ও তার সাথী

মুসলমানগণ পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন। আমিও প্রতিদিন ভাবতাম প্রস্তুতি নিব। কিন্তু কোন প্রস্তুতিই নেয়া হতো না। এমনিই দিন কেটে যেত। আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতাম, আমি তো যে কোন সময় প্রস্তুতি নিতে পারবো। ব্যস্ত হওয়ার দরকার কি? এভাবে দিন গড়িয়ে যেতে থাকে। একদিন ভোরে তিনি মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে চলে গেলেন। তখনো আমার প্রস্তুতি নেয়া হয়নি। আমি মনে মনে বললাম, ওরা চলে যায় যাক। আমি পথেই তাদেরকে ধরতে পারবো। তাদের রওনা হয়ে যাওয়ার পরের দিন আমি রওনা হতে চাইলাম। কিন্তু দিনটা কেটে গেল, আমার রওনা দেয়া হয়ে উঠলো না। পরদিন সকালে আবার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু এবারও পারলাম না রওনা দিতে। এভাবে গড়িমসির মধ্য দিয়ে দিনের পর দিন কেটে গেল। ততক্ষণে মুসলিম বাহিনী অনেক দূরে চলে গেছে। আমি কয়েকবার বেরিয়ে দ্রুত বেগে তাদেরকে ধরে ফেলার সংকল্প করেও পিছিয়ে থাকলাম। আফসোস তখনো যদি কাজটি করে ফেলতাম। কিন্তু আসলে তা বোধ হয় আমার ভাগ্যে ছিল না। রাসূল (সাঃ) ও মুসলমানদের চলে যাওয়ার পর আমি যখন মদীনায় জনসাধারণের মধ্যে বেরুতাম, তখন পথে ঘাটে মুনাফিক ও পিড়াব্যাধিগ্রস্ত লোক ছাড়া আর কাউকে দেখতাম না। এ পরিস্থিতিতে নিজেকে দেখে আমার খুবই দুঃখ লাগতো।

রাসূল (সাঃ) তাবুক যাওয়ার পথে আমার সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করেননি। তবে তাবুকে পৌ ছে জিজ্ঞেস করেন যে, কা'বের কি হয়েছে? বনু সালামার এক ব্যক্তি বললোঃ হে রাসূলুল্লাহ! নিজের সম্পদের মায়া ও আত্মাভিমানের কারণে সে আসেনি। মুয়াজ ইবনে জাবাল এ কথা শুনে বললেনঃ "ছি, কি একটা বাজে কথা তুমি বললে! আল্লাহর কসম, তার সম্পর্কে আমরা কখনো কোন খারাপ কথা শুনিনি।" রাসূল (সাঃ) উভয়ের বাক্য বিনিময়ের মধ্যে চুপ করে থাকলেন।

কা'ব ইবনে মালেক বলেনঃ যখন আমি জানতে পারলাম যে, রাসূল (সাঃ) ফিরে আসছেন, তখন ভাবলাম, এমন কোন মিথ্যে ওজর বাহানা করা যায় কিনা, যাতে আমি তাঁর অসন্তোষ থেকে রক্ষা পেতে পারি। কিন্তু পরক্ষণেই এসব চিন্তা আমার দূর হয়ে গেল। আমি মনে মনে বললাম যে, মিথ্যে ওজর দিয়ে আমি রেহাই পাব না। কারণ রাসূল (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে জেনে ফেলবেন। কাজেই পুরোপুরি সত্য কথা বলবো বলে স্থির করলাম। রাসূল (সাঃ) পরদিন সকালে ফিরে এসে মসজিদে নববীতে বসলে তাবুক যুদ্ধে যারা যায়নি তারা একে একে আসতে লাগলো এবং প্রায় ৮০ জন

(মতান্তরে ৮২ জন) নানা রকম ওজর বাহানা পেশ করে কসম খেতে লাগলো। রাসূল (সাঃ) তাদের ওজর মেনে নিলেন, তাদের কাছ থেকে পুনরায় বায়য়াত নিলেন, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং তাদের গোপন বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ কর্‌লেন। আমিও তাঁর কাছে এলাম। আমি সালাম দিলে তিনি ঈষৎ ক্রোধ মিশ্রিত মুচকি হাসিসহ জবাব দিলেন। তারপর বসতে বলে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার কি হয়েছিল যে তাবুকে যেতে পারলে না? তুমি না সওয়ারী কিনে নিয়েছিলে? আমি বললামঃ জি, সওয়ারী কিনে নিয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি যদি আপনি ছাড়া অন্য কারো সামনে বসতাম, তাহলে তার আক্রোশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মিথ্যে মিথ্যে ওজর পেশ করে চলে যেতাম। কারণ কথা বলার দক্ষতা আমারও আছে। কিন্তু আমি জানি, আজ আপনার কাছে মিথ্যা বলে আপনাকে খুশী করা গেলেও আল্লাহ তায়ালা কালই সব ফাঁস করে দিয়ে আপনাকে আমার ওপর অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আর যদি সত্য বলি, তবে তাতে আপনি অসন্তুষ্ট হলেও আল্লাহর ক্ষমা লাভের আশা আছে। আল্লাহর কসম, আমার না যাওয়ার জন্য কোন ওজর ছিল না। আল্লাহর কসম, আমি এ সময়ে সর্ব প্রকারে সুস্থ, সবল ও সক্ষম ছিলাম।

রাসূল (সাঃ) আমার কথা শুনে বললেনঃ কা'ব সত্য কথা বলেছে। বেশ, তুমি এখন যাও। দেখ, আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত দেন।

আমি বিদায় নিলাম। বনু সালামার লোকেরাও আমার সাথে চলতে লাগলো তারা আমাকে বললোঃ "আমরা তো আজ পর্যন্ত তোমার কোন পাপ কাজের কথা শুনিনি। অন্যান্যদের মত তুমিও একটা ওজর পেশ করে দিলেই তো পারতে। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমার জন্য ক্ষমা চাইতেন এবং তাতেই তোমার গুনাহ মাফ হয়ে যেত।" তারা এভাবে আমাকে ক্রমাগত তিরস্কার করতে লাগলো। ফলে এক পর্যায়ে মনে মনে স্থির করে ফেললাম, রাসূল (সাঃ) এর কাছে ফিরে যাই এবং আগে যা বলেছি তা ভুল প্রতিপন্ন করে আসি। সহসা আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলামঃ আচ্ছা, আমার মত অকপটে সত্য বলে ভুল স্বীকার করতে তোমরা কি আর কাউকে দেখেছ? তার বললোঃ হাঁ, হিলাল বিন উমাইয়া ও মুরারা বিন রবীও তোমার মতই কথা বলেছে। এই দুজনকে আমি ভালোভাবে জানতাম। তারা ছিলেন খুবই সৎ লোক এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। তাদের দু'জনের কথা শুনে আমি আমার পূর্বের বক্তব্যে অবিচল থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এদিকে রাসূল (সাঃ) তাবুকে অনুপস্থিত থাকা লোকদের মধ্যে আমাদের তিনজনের সাথে কথা বলা সকল মুসলমানের জন্য নিষিদ্ধ করে দিলেন। তাই

লোকেরা আমাদেরকে বয়কট করে চললো। যেন আমরা তাদের একেবারেই অচেনা মানুষ। দুনিয়াটাই যেন আমার কছে বদলে গেল। এভাবে পঞ্চাশ দিন কেটে গেল। অন্য দু'জন তো ঘরেই বসে রইল এবং কান্নাকাটি করতে লাগলো। কিন্তু আমি বাইরে বেরুতাম। মসজিদে নববীতে নামায পড়তাম ও বাজারে ঘুরতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতো না। আমি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে যেতাম। তিনি নামাযের পর মজলিসে বসলে সেখানেও তাকে সালাম দিতাম, আর দেখতাম, সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট নড়লো কিনা। আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তাম। আমি বাঁকা দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতাম আমি নামায পড়ার সময় তিনি আমার দিকে তাকাতেন, আর আমি তাকালেই মুখ ফিরিয়ে নিতেন। এ অবস্থায় অনেকদিন কেটে গেল। ক্রমে আমি অস্থির ও দিশাহারা হয়ে পড়লাম। একদিন আমার অতি প্রিয় চাচাতো ভাই আবু কাতাদাহকে সালাম করলাম। কিন্তু সে সালামের জবাব পর্যন্ত দিল না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলামঃ হে আবু কাতাদাহ! আমি যে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসি, তা কি তুমি স্বীকার কর না? সে এ কথার কোন জবাব দিল না। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেও জবাব দিল না। তৃতীয়বার আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে শুধু বললোঃ আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন। আমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। আমি তার কাছ থেকে ফিরে এলাম। এই সময় একদিন মদীনার বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এই সময় সিরিয়ার একজন খৃস্টান কৃষক মদীনার বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রী করতে এসেছিল। সে লোকজনের কাছে আমার ঠিকানা সন্ধান করছিল। লোকেরা আমাকে দেখিয়ে দিলে সে গাসসানের রাজার একটি চিঠি আমার হাতে দিল। চিঠিতে রাজা লিখেছেঃ আমি জানতে পেরেছি যে, আপনার নেতা আপনাকে খুব কষ্ট দিচ্ছেন। অথচ আল্লাহ আপনাকে লাঞ্চনা ও অবমাননার যোগ্য রাখেননি। আপনি আমাদের এখানে চলে আসুন। আমরা আপনাকে সম্মানের সাথে রাখবো। চিঠিটা পড়ার সাথে সাথে আমি মনে মনে বললাম, এ আর এক পরীক্ষা। আমি তৎক্ষণাত তা চুলোর মধ্যে নিক্ষেপ করলাম।

এভাবে চল্লিশ দিন কেটে গেলে রাসূল (সাঃ)-এর এক দূত আমার কাছে এসে বললোঃ রাসূল (সাঃ) তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে যাবার আদেশ দিয়েছেন। আমি বললামঃ ওকে তালাক দেব নাকি? দূত বললেনঃ না, তালাক দিতে হবে না, তবে তার কাছে যাবে না। আমার অন্য দু'জন সাথীকেও একই হুকুম দেয়া হলো। আমি আমার স্ত্রীকে বললামঃ তুমি বাপের বাড়ীতে চলে যাও এবং আল্লাহর ফয়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। হিলাল

ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে বললেনঃ হে রাসূল! আমার স্বামী বুড়ো হয়ে গেছে। তার কোন ভৃত্য নেই। আমি যদি তার দৈনন্দিন কাজ কর্ম করে তার সেবা করে দেই, তাতে কি আপত্তি আছে? রাসূল (সাঃ) বললেন, আপত্তি নেই। তবে সে যেন তোমার কাছে না আসে। আমাকেও কেউ কেউ বললো যে, তুমি রাসূল (সাঃ) এর কাছে গিয়ে স্ত্রীর জন্য অনুমতি নিয়ে এস, যেমন হেলালের স্ত্রী এনেছে। আমি বললামঃ না, আমি কোন অনুমতি আনতে যাব না। জানি না তিনি কি ভাববেন। কারণ হেলাল বিন উমাইয়া বুড়ো, আর আমি যুবক।

এভাবে আরো দশটি দিন কেটে গেলে একদিন ফজরের নামায পড়ে অত্যন্ত বিষন্ন মনে বসেছিলাম। সহসা কে একজন চিৎকার করে বলতে বলতে ছুটে আসতে লাগলোঃ ক্বাব ইবনে মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি তৎক্ষণাত সিজদায় পড়ে গেলাম। বুঝলাম, আমাদের মুসিবত কেটে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঐদিন ফজরের পর ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করে নিয়েছেন। লোকেরা দলে দলে এসে আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগলো। এরপর আমি রাসূল (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম। আমি দেখলাম, তিনিও আমার সুসংবাদে আনন্দিত। আমি বললামঃ হে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমার তওবা কবুলের জন্য শুকরিয়া স্বরূপ আমার সমস্ত ধনসম্পদ আল্লাহ ও রাসূলের পথে সদকা করে দিতে চাই। রাসূল (সাঃ) বললেনঃ সব নয়, কিছু অংশ নিচের জন্য রেখে দাও। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ এবার আমাকে সত্য কথা বলার কারণে ক্ষমা করেছেন। কাজেই এরপর বাকী জীবন আমি সর্বদা সত্য কথাই বলতে থাকবো। আল্লাহ যেন আমাকে মিথ্যা থেকে রক্ষা করেন।

শিক্ষাঃ

(১) এ ঘটনার সবচেয়ে বড় শিক্ষা এই যে, ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্য কথা বলার নীতিতে অবিচল থাকতে হবে। চাই তাতে যত কঠিন পরীক্ষাই আসুক না কেন।

(২) আল্লাহ মোনাফেকদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন না বরং মুমিনদেরকেই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। এই তিন মুমিন ব্যতিত বাকী ৮২ জন মিথ্যে ওজুহাত পেশ পরলেও তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়নি। কারণ তারা ছিল মুনাফিক। তাই আল্লাহ তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে চাননি।

(৩) ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্বের অধিকার রয়েছে কুরআন হাদীসের সীমার মধ্যে নিষ্টাবান কর্মীদেরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য পরীক্ষার সম্মুখীন করা

বা গুরুতর ভুল কাজের জন্য শাস্তি দেয়ার। এ সব ক্ষেত্রে আনুগত্যের পরিচয় দিয়ে এবং কোন দিক থেকে কু-প্ররোরচনা এলে তা উপেক্ষা করে পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার চেষ্টা করতে হবে।

(৪) ইসলামী আন্দোলনের কোন পর্যায়ে কারো কোন সাফল্য বা কৃতিত্ব প্রমাণিত হলে তার জন্য যাতে অন্তরে গর্ব ও অহমিকার সৃষ্টি না হয় সে জন্য সম্ভব হলে সদকা করা উত্তম। আর সেই সাথে তাওবা ইসতিগফারও অব্যাহত রাখা উচিত।

(৫) অলসতা ও সিদ্ধান্তহীনতা এই তিনজন মোজাহিদের জীবনে চরম সংকট সৃষ্টি করেছিল। কাজেই অলসতা, গড়িমসি ও সিদ্ধান্তহীনতা সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য।

২৯। হযরত সালমান ফারসীর ইসলাম গ্রহণ

হযরত সালমান ফারসী প্রথম জীবনে একজন অগ্নি উপাসক ছিলেন। পরে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং সর্বশেষে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি পারস্যের ইসফাহান প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তার পিতা ছিলেন একজন বিত্তশালী গ্রাম্য মোড়ল। তিনি তাকে এত বেশী স্নেহ করতেন যে, তাকে বাড়ী থেকে কোথাও যেতে দিতেন না। তিনি জানান যে, এই সময়ে তিনি অগ্নি উপাসকদের ধর্মে গভীর দক্ষতা অর্জন করেন। এক মুহূর্তের জন্যও যাতে আগুন নিভতে না পারে- এভাবে কুন্ডলী জ্বালিয়ে রাখতে তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এ সময়ে ঘটনাক্রমে একটি জমি দেখাশুনার দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত হয়। সেই জমি দেখতে তিনি পিতার অনুমতিক্রমে বাড়ীর বাইরে যাওয়া আসা করতে লাগলেন। এই সময় তার যাওয়া আসার পথের পাশে একটি খৃস্টান গীর্জা তার নজরে পড়ে। লোকজনের হৈ চৈ শুনে কৌ তুহলে বশতঃ তিনি সেই গীর্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। সেখানে তাদের উপাসনা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান এবং মনে মনে বলেন, অগ্নি উপাসকদের ধর্মের চেয়ে এই ধর্ম অনেক ভাল। ঐ দিন তার আর জমি দেখতে যাওয়া হলো না। তিনি সারাদিন গীর্জায় কাটিয়ে দিলেন। গীর্জার লোকদের কাছে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, এই ধর্মের উৎস কোথায়? তারা জানালো যে, সিরিয়ায়। এরপর তিনি তাঁর পিতার কাজে ফিরে গেলেন? তাঁর পিতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি সারাদিন কোথায় ছিলে? সালমান গীর্জার ঘটনা খুলে বলেদিলেন। সেই সাথে এ কথাও বললেন যে, ঐ ধর্ম তার কাছে ভালো লেগেছে। একথা শুনে তার পিতা বললেন, না বাবা, তোমার জন্য তোমার বাপ দাদার ধর্মই ভাল।

সালমান বললেন, না বাবা, ঐ ধর্মই ভাল। এতে তিনি তাঁকে নিয়ে ভীত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর পায়ে শিকল পরিয়ে দিলেন। এই সময় সালমান গোপনে গীর্জায় খৃস্টানদের নিকট খবর পাঠান যে, আপনাদের কাছে সিরিয়া থেকে কোন কাফেলা এলে আমাকে জানাবেন। কিছুদিন পর সিরিয়া থেকে একটা কাফেলা এল। তারা যথাসময়ে সালমানকে সে খবর জানালো। সালমান বলে পাঠালেন যে, এই কাফেলার কাজ যখন শেষ হবে এবং তারা সিরিয়ায় ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেবে, তখন আমাকে জানাবেন। তারপর কাফেলার কাজ শেষে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করলে তা সালমানকে জানানো হলো। সালমান তৎক্ষণাত স্বীয় পিতার স্নেহের শিকল ভেংগে গোপনে তাদের সাথে সিরিয়ায় চলে গেলেন। সিরিয়ায় গিয়ে তিনি লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেনঃ এই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী কে? তারা তাকে জানালো যে, গীর্জার পাদ্রীই সবচেয়ে জ্ঞানী।

সালমান পাদ্রীর নিকট হাজির হয়ে বললেনঃ আমি এই ধর্মের প্রতি আগ্রহী। আমি আপনার সহচর হয়ে আপনার সেবা করতে চাই এবং আপনার কাছে থেকে ধর্ম শিখতে ও উপাসনা করতে চাই। পাদ্রী সালমানকে স্বীয় গীর্জায় থাকতে দিলেন এবং সালমান খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিতে লাগলেন। এই সময় সালমান বুঝতে পারলেন যে, উক্ত পাদ্রী খুবই অসৎ। সে জনসাধারণের কাছ থেকে ছদকা আদায় করে এবং তা গরীবদের মধ্যে বিতরণ না করে নিজে আত্মসাৎ করে। এভাবে সে বিপুল সম্পদ সঞ্চয় করে। সালমান এরপর থেকে তাকে ঘৃণা করতে লাগলেন এবং ঐ স্থান ত্যাগ করার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

এই পাদ্রী মারা গেলে খৃস্টানরা তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য সমবেত হলো। সালমান তাদেরকে বললেনঃ এই লোকটি চরম দুর্নীতিবাজ ছিল। সে তোমাদেরকে ছদকা দিতে উপদেশ দিত। কিন্তু নিজে তোমাদের দেয়া ছদকাগুলো আত্মসাত করতো। তারা সালমানকে বললোঃ তোমার এ সব অভিযোগ যে সত্য, তার প্রমাণ কী? তিনি এর প্রমাণ স্বরূপ তার জমা করা সাতটা সোনা রূপা ভর্তি কলসি বের করে দেখালেন। তা দেখে সমবেত জনতা ক্রুদ্ধ স্বরে বললোঃ আমরা এ নরাধমকে কবর দেব না। তারপর লাশকে তারা শূলে চড়ালো। তার ওপর পাথর ছুঁড়লো এবং তারপর একজন নতুন যাজক নিয়োগ করলো।

নতুন যাজক ছিল একজন নিরেট সৎ লোক। পৃথিবীর ধন-সম্পদের প্রতি তার কোন লালসা ছিল না। সালমান কিছুদিন তার কাছে থাকলেন। তারপর

তার মৃত্যু কাছাকাছি হলে সালমান তাকে বললেনঃ জনাব, আমি তো এতদিন এখানে কাটালাম। এখন আপনার পর আমি কোথায় কার কাছে যাবো বলে দিন।

তিনি বললেনঃ বাবা! আমি যতটা খাঁটি ধর্মের অনুসারী ছিলাম, এখন তেমন আর কাউকে দেখি না। ভালো লোকেরা সব পরপারে পাড়ি জমিয়েছে। এখন যারা আছে, তাদের অধিকাংশই ধর্মকে খানিকটা বিকৃত করেছে, আর খানিকটা পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছে। তবে মুসেলে একজন আছে খাঁটি ধর্মের অনুসারী। তুমি তার কাছে চলে যাও।

সালমান মুসেলের যাজকের কাছে গেলেন। সেখানে কিছুদিন থাকার পর তিনিও মারা গেলেন। মারা যাওয়ার আগে তাকে নাসিবাইনের এক ব্যক্তির সন্ধান দিয়ে গেলেন। অতঃপর সালমান নাসিবাইনে গেলেন। সেখানকার পাদ্রীর কাছে কিছুদিন থাকার পর তিনিও মারা গেলেন। মারা যাওয়ার সময় আম্মুরিয়ার আর একজন যাজকের সন্ধান দিয়ে গেলেন। সালমান আম্মুরিয়ায় চলে গেলেন।

আম্মুরিয়ায় কিছুদিন থাকার পর সেখানকার যাজকও মারা গেলেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে সালমান তার কাছে একজন সৎ যাজকের সন্ধান চাইলে তিনি বললেনঃ এখন আর আমার জানামতে সঠিক ধর্মের অনুসারী কোন যাজক পৃথিবীতে জীবিত নেই। তবে একজন নতুন নবীর আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি ইবরাহীম (আঃ) এর দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। তিনি আরব ভূমিতে আবির্ভূত হবেন এবং দুই মরুর মাঝে খেজুরের বাগানে পরিপূর্ণ জায়গায় হিজরত করবেন। তিনি হাদিয়া নেবেন। কিন্তু ছদকা গ্রহণ করবেন না। তার দুই কাঁধের মাঝে নবুয়তের সীল থাকবে। তুমি যদি সেই দেশে যেতে পার তবে যেও।

আম্মুরিয়ায় হযরত সালমান অনেক ছাগল ভেড়া পুষতেন। তারই এক পাল ছাগল ভেড়া একদল আরব বণিককে দিয়ে তাদের সাথে তিনি আম্মুরিয়া থেকে আরব চলে গেলেন। ওয়াদিল কুরাতে তারা তাকে এক ইহুদীর নিকট বিক্রী করে দিল। সালমান এই ইহুদীর খেজুরের বাগানে কাজ করতে লাগলেন। ঐ খেজুরের বাগান দেখে তিনি ভেবেছিলেন, এটাই সেই আখেরী নবীর আবির্ভাব স্থান। তাই তিনি ইহুদীর কাছেই থাকতে লাগলেন।

হযরত সালমান বলেনঃ "এই সময় একদিন মদীনা থেকে আমার ইহুদী মনিবের এক আত্মীয় এল। বনু কুরায়যা গোত্রীয় ঐ ইহুদী আমাকে কিনে নিয়ে মদীনায় চলে গেল। মদীনাকে দেখেই আমি চিনতে পারলাম যেন ওটা

অবিকল আমার আম্মুরিয়ার ওস্তাদের বর্ণিত জায়গা। তাই আমি ওখানেই থাকে লাগলাম। এই সময় মক্কায় রাসূল (সাঃ) নবুয়ত লাভ করেছেন বলে শুনলাম। তবে তার সম্পর্কে বিস্তারিত খবরাখবর জানতে পারলাম না। কিছুদিন পর তিনি মদীনায় হিজরত করে আসলেন।

একদিন আমি খেজুর ভর্তি গাছের মাথায় চড়ে আমার মনিবের জন্য কিছু কাজ করছি। মনিব তখন আমার নিচে বসা ছিলেন। সহসা তার এক চাচাতো ভাই এসে তাকে বললোঃ আল্লাহ কায়লার বংশধরকে ধ্বংস করুন। (আওস ও খাজরাজ এই দুই গোত্রের মায়ের নাম কায়লা। তাই কায়লার বংশধর বলতে ঐ দুই গোত্রকে বুঝানো হয়েছে।) ওরা এখন মক্কা থেকে আগত এক ব্যক্তির চারপাশে ভিড় জমিয়েছে। লোকটি আজই এসেছে। আওস ও খাজরাজ মনে করে সে নাকি এ যুগের নবী এবং সর্বশেষ নবী। হযরত সালমান বলেনঃ খেজুর গাছের ওপরে বসে আমি যখন এ খবর শুনলাম, তখন আনন্দে ও উত্তেজনায় এত বেসামাল হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমি মনিবের ঘাড়ের ওপর পড়ে যাবো বলে আশংকা হচ্ছিল। অনেক কষ্টে ধীরে ধীরে গাছ থেকে নেমে এসে ঐ লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনি কার কথা যেন বলছিলেন? অমনি আমার মনিব আমাকে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিল। সে বললোঃ তোর তা দিয়ে কি দরকার? আমি বললামঃ কিছু না, কৌ তুহল বশতঃ জিজ্ঞেস করেছিলাম।

হযরত সালমান বলেনঃ এরপর আমি নিজের কাছে সঞ্চিত কিছু খাবার জিনিস নিয়ে সন্ধ্যা বেলায় গোপনে কুবাতে রাসূল (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত হলাম। তাকে বললামঃ আমি শুনেছি, আপনার সাথে অনেক দরিদ্র লোক রয়েছে। তাদের জন্য আমি কিছু ছদকা এনেছি। এই বলে উক্ত খাদ্য হাযির করলে তিনি সাহাবীদেরকে তা খেতে বললেন। কিন্তু নিজে খেলেন না। তখন আমি মনে মনে বললামঃ আম্মুরিয়ার যাজক যে তিনটে আলামতের কথা বলেছে, তার একটি পেয়ে গেলাম। অতঃপর আমি সেদিনকার মত চলে এলাম।

আর একদিন আরো কিছু খাবার নিয়ে তা হাদিয়া হিসাবে পেশ করলাম। রাসূল (সাঃ) তা নিজেও খেলেন এবং অন্যদেরকেও খাওয়ালেন। এরপর আমি দ্বিতীয় আলামতটিও পেয়ে গেলাম।

এরপর যখন তিনি বাকীয়ুল গারকাদ নামক কবরস্থানে তাঁর জনৈক সাহাবীর দাফন সম্পন্ন করে ফিরে আসছিলেন, তখন আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। সেই সময় রাসূল (সাঃ) এর গায়ে ঢিলেঢালা পোশাক ছিল। আমি নবুয়তের মোহরটি দেখার জন্য তার ঘাড়ের ওপর চোখ বুলাতে

লাগলাম। রাসূল (সাঃ) আমার চাহনির হাবভাব দেখে বুঝে ফেললেন এবং তাঁর পিঠের ওপর থেকে চাদর উঠিয়ে ফেলে দিলেন। আমি তখন বনুয়তের মোহর দেখে চিনতে পারলাম। আমি মোহরটিতে চুমু খাওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়লাম এবং কাঁদতে লাগলাম। রাসূল (সাঃ) আমাকে বললেনঃ সামনে এস। আমি সামনে গিয়ে বসে পড়লাম। অতঃপর অতীতের সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম।

এরপর রাসূল (সাঃ) আমাকে ইহুদীর দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার জন্য ৪০ আউন্স স্বর্ণ দিলেন। ঐ স্বর্ণ ইহুদীকে দিয়ে আমি মুক্তি লাভ করলাম। কিন্তু বদর ও ওহুদ যুদ্ধ আমার দাসত্বের আমলে সংঘটিত হয়। তাই আমি তাতে অংশগ্রহণ করতে পারিনি।

শিক্ষাঃ হযরত সালমান ফারসীর ইসলাম গ্রহণের এই ঘটনা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। এর সর্ব প্রধান শিক্ষা এই যে, মুহাম্মদ (সাঃ) ছাড়া পৃথিবীতে আল্লাহর প্রেরিত আর কোন নবীর শরীয়ত অবিকৃত অবস্থায় নেই। তাই ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম সঠিক ও নির্ভুল নয়। এই সত্য ও সঠিক দ্বীনের সন্ধান লাভের জন্য হযরত সালমান ফারসী প্রথম দিন থেকেই অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন। আল্লাহ তাঁর অক্লান্ত সাধনাকে সফল করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা সত্যের সন্ধানরত প্রত্যেক মানুষকেই সত্যের সন্ধান দিয়ে থাকেন।

৩০। মিথ্যা সকল পাপের জননী

একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বললোঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার মধ্যে তিনটি বদ অভ্যাস রয়েছেঃ মিথ্যা বলা, চুরি করা ও মদ খাওয়া। আমি তিনটি বদ অভ্যাসই ছেড়ে দিতে চাই। কিন্তু এক সাথে এর সব ক'টি ছাড়তে পারছি না। আমাকে এক একটি করে এগুলো পরিত্যাগ করার সুযোগ দিন এবং কোনটি আগে ত্যাগ করবো, তা বলে দিন।

রাসূল (সাঃ) একটু চিন্তা করে বললেনঃ তুমি প্রথমে মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস ত্যাগ কর। আর এই ত্যাগ করার ওপর বহাল আছ কিনা, তা জানানোর জন্য মাঝে মাঝে আমার কাছে এসো।

সে এতে রাজী হয়ে চলে গেল এবং কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলবে না বলে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলো।

রাত্রে সে অভ্যাসমত চুরি করতে বেরিয়ে পড়লো। কেননা এটা সে বাদ দেওয়ার ওয়াদা করেনি। কিন্তু কিছুদূর গেলেই তার মনে হলোঃ রাসূল (সাঃ)

এর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি যদি চুরি করেছি কিনা জিজ্ঞাসা করেন তা হলে মিথ্যা তো বলা যাবে না। কাজেই সত্য বলে স্বীকারোক্তি দিতে হবে। আর তাহলে রাসূলের (সাঃ) দরবারে অপমান তো সহ্য করতেই হবে। উপরন্তু হাতটাও কাটা যাবে। অনেক ভেবে চিন্তে সে ফিরে এল। চুরি করতে যাওয়া হলো না।

এরপর সে মদ খাওয়ার জন্য গ্লাস হাতে নিয়ে তাতে মদ ঢাললো। কিন্তু মুখে নিতে গিয়ে আবার ঐ একই প্রশ্ন তার মনে উদিত হলো। রাসূল (সাঃ) এর দরবারে তো আজ হোক কাল হোক যেতেই হবে। তিনি যদি জিজ্ঞেস করেন, মদ খাওয়া চলছে কিনা, তাহলে কি জবাব দেব? মিথ্যা তো বলা যাবে না। আর সত্য বললে অপমান ও ৮০ ঘা বেত্র দন্ড। অতএব, মদও সে ছেড়ে দিল।

এভাবে একমাত্র মিথ্যা ছেড়ে দিয়ে সে একে একে সব কয়টি চারিত্রিক দোষ থেকে মুক্তি পেল। রাসূল (সাঃ) সত্যই বলেছেনঃ মিথ্যা হলো সকল পাপের জননী।

শিক্ষাঃ এই ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করার একটি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত চমকপ্রদ কৌশল শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সেই শিক্ষাটি এই যে, ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ড ও চরিত্র যখন কারো অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, তখন তাকে রাতারাতি শুধরে পবিত্র করা সম্ভব হয় না। এজন্য ধীরে ধীরে ও পর্যায়ক্রমে চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। এতে সফলতা লাভ করা সহজতর হবে। এ কথা ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন সঠিক, জাতির ক্ষেত্রেও তেমনি অভ্রান্ত।

৩১। মসজিদে যেরারের ঘটনা

মদীনায় আবু আমের নামে একজন খৃস্টান পাদ্রী বাস করতো। তার ছেলে ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত হানযালা (রাঃ)। শহীদ হওয়ার পর ফেরেশ্‌তারা তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতা খৃস্টধর্মের ওপর অবিচল ছিল।

রাসূল (সাঃ) হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার পর আবু আমের তাঁর সাথে সাক্ষাত করে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন আপত্তি ও সন্দেহ উথাপন করে। রাসূল (সাঃ) তার সকল আপত্তির জবাব দেন। কিন্তু তবু সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

সে বললোঃ আমাদের দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন অভিশপ্ত ও আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। সে রাসূল (সাঃ) কে একথাও জানিয়ে দিল যে, সে রাসূল (সাঃ) এর শত্রুদেরকে সব সময় সাহায্য করতে থাকবে। নিজের এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সে বদর থেকে হুনাইন পর্যন্ত সকল যুদ্ধে মুসলমানদের শত্রুদের পক্ষ অবলম্বন করে। হুনায়েনের যুদ্ধে যখন হাওয়াযেনের মত বিশালাকায় গোত্র মুসলমানদের কাছে হেরে গেল, তখন সে ভগ্ন হৃদয়ে তৎকালীন খৃস্টধর্মের ঘাটি সিরিয়ায় চলে যায় এবং আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। এভাবে তার নিজের বদদোয়া ও অভিশাপ দ্বারা সে নিজেই ঘায়েল হয়।

জীবদ্দশায় আবু আমের পাদ্রী আজীবন ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুতা করে। এমনকি সে রোম সম্রাটকে মদীনায় আক্রমণ চালিয়ে মুসলমানদের নাম নিশানা মুছে ফেলার প্ররোচনাও দিয়েছিল।

মদীনার মুসলমানদের মধ্যে যারা বর্ণচোরা, ভন্ড ও মোনাফেক ছিল, সর্বকালের ও সর্বদেশের মোনাফেকদের মতই তারাও ইহুদী ও খৃস্টানদের ক্রীড়নক ছিল। বিশেষতঃ আবু আমেরের তারা খুবই ভক্ত ও অনুগত ছিল। আবু আমের এই মোনাফেকদের কাছে চিঠি লিখলো যে, আমি রোম সম্রাটকে মদীনা আক্রমণ করার অনুরোধ জানিয়েছি। কিন্তু সম্রাটের বাহিনীকে সহযোগিতা করে এমন একটি দল মদীনাতেও সংগঠিত হওয়া জরুরী। এ জন্য তোমরা মদীনায় মসজিদের নাম দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ কর, যেন মদীনার মুসলমানদের মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি না হয়। সেই গৃহে নিজেরা সমবেত হও, কিছু অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম তাতে সংগ্রহ করে রাখ।

তার এ চিঠির ভিত্তিতে বারোজন মোনাফেক মদীনার কোবা মহল্লায় একটি মসজিদ নির্মাণ করলো। এই মহল্লায় রাসূল (সাঃ) হিজরত করে এসে প্রথম অবস্থান করেছিলেন এবং একটি মসজিদ তৈরী করেছিলেন। অতঃপর তারা স্থির করলো যে, ঐ মসজিদে রাসূল (সাঃ) এর দ্বারা এক ওয়াক্ত নামায পড়াবে। এতে মুসলমানদের মনে আর কোন সন্দেহ থাকবে না। তারা বুঝবে এটাও অন্যান্য মসজিদের মতই একটা মসজিদ।

তাদের একটি প্রতিনিধি দল রাসূল (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করে বুঝালো যে, কোবার বর্তমান মসজিদটি অনেক দূরে অবস্থিত। দুর্বল ও অসুস্থ লোকেরা অত দূরে যেতে পারে না। তাছাড়া ওখানে সব লোকের সংকুলানও হয় না। তাই আমরা আর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি এতে এক ওয়াক্ত নামায পড়ে উদ্বোধন করে দিয়ে যান।।

রাসূল (সাঃ) তখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাই ওয়াদা করলেন যে, যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তিনি ওখানে নামায পড়বেন। কিন্তু তাবুক থেকে ফেরার পথে সূরা তাওবার সংশ্লিষ্ট আয়াত কয়টি নাযিল করে আল্লাহ তাতে নামায পড়তে নিষেধ করলেন এবং তাকে 'মসজিদে যেরার' (ক্ষতিকর মসজিদ) নামে আখ্যায়িত করলেন। রাসূল (সাঃ) এই নির্দেশ অনুসারে নামায তো পড়লেনই না, অধিকন্তু কতিপয় সাহাবীকে পাঠিয়ে দিয়ে মসজিদটি আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিলেন।

সূরা তাওবার সংশ্লিষ্ট আয়াতে এই মসজিদকে তিনটি কারণে মসজিদে যেরার বলা হয়েছেঃ এক, তা দ্বারা ইসলামের ক্ষতি সাধন ও কুফরী প্রতিষ্ঠার সংকল্প করা হয়েছিল। দুই, তা দ্বারা মুসলামনদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছিল। তিন, সেখানে ইসলামের শত্রুদেরকে আশ্রয় দেয়ার ফন্দি আটা হয়েছিল।

উল্লিখিত তিনটি উদ্দেশ্যে যখন যেখানেই কোন গৃহ নির্মাণ, কোন দল বা প্রতিষ্ঠান গঠন কিংবা আর কোন ধরনের স্থাপনার কাজ করা হবে, তখন তা মসজিদে যেরারেরই পর্যায়ভুক্ত হবে এবং মুসলমানদের কর্তব্য হবে তা প্রথম সুযোগেই ধ্বংস করা, চাই তা সমজিদ বা অন্য কোন আকারেই গঠিত হোক। এ কারণে হযরত ওমর (রাঃ) এক মসজিদের পার্শ্বে আর একটি মসজিদ নির্মাণ করতে নিষেধ করেন। অনুরূপভাবে কোন প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নিয়োজিত দল বা সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করা বৈধ হবে না।

শিক্ষাঃ (১) মুসলমান নাম ধারন করেও ইসলামের চিহ্নিত শত্রুদের আনুগত্য করা সুস্পষ্ট মোনাফেকীর লক্ষণ।

(২) অজ্ঞতা বা ভুলবশত কোন অন্যায় কাজের ওয়াদা করলে সেই ওয়াদা ভংগ করা শুধু জায়েজ নয় বরং ওয়াজিবও।

৩২। মানুষের পরিণাম তার শেষ কর্মের ওপর নির্ভরশীল

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা খয়বরের যুদ্ধে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে দাবী করতো এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বললেনঃ "এই ব্যক্তি দোজখবাসী।" তারপর যুদ্ধ শুরু হলে লোকটি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করলো এবং আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হলো। এক সময় আঘাতের চোটে সে অচল

হয়ে পড়লো। তখন এক সাহাবী এসে রাসূল (সাঃ)-কে বললেনঃ "হে আল্লাহর রসূল! ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার মত কী? যে ব্যক্তিকে আপনি দোজখবাসী বলেছিলেন, সেতো প্রচন্ডভাবে যুদ্ধ করেছে এবং আহত হয়েছে।" নবী করিম (সাঃ) বললেনঃ "শুনে রাখোও, সে দোজখবাসী।" এতে কোন কোন মুসলমান সন্দেহ পোষণ করতে লাগলেন।

ইত্যবসরে লোকটি ক্ষত স্থানের তীব্র যন্ত্রনা অনুভব করলো। অতঃপর সে নিজের তীর হাতে নিয়ে তা দ্বারা নিজের গলা ফুঁড়ে আত্মহত্যা করলো। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বহু সংখ্যক সাহাবী রাসূল (সাঃ)-এর নিকট ছুটে গিয়ে বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনার কথাকে সত্যে পরিণত করেছেন। অমুক লোকটি তো নিজের গলা ফুঁড়ে আত্মহত্যা করেছে।" তখন রাসূল (সাঃ) বললেনঃ "ওহে বিলাল! ওঠো। জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, মুমিন ব্যতীত কেউ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পাপী লোক দ্বারাও আল্লাহ কখনো কখনো এ দ্বীনের সাহায্য করে থাকেন।"

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, রাসূল (সাঃ) বললেনঃ কোন কোন বান্দা দোযখীর ন্যায় আমল করে, অথচ সে বেহেশ্‌তবাসী। আবার কোন কোন বান্দা বেহেশতবাসীর ন্যায় কাজ করে, অথচ সে দোজখবাসী। আর মনে রাখবে, কর্মের ফলাফল শেষ কর্মের ওপর নির্ভরশীল।

শিক্ষাঃ আত্মহত্যা কবীরা গুনাহ তথা মহাপাপই শুধু নয়, বরং তা ঈমানকেও ধ্বংস করে দেয় এবং সকল কৃত সৎ কাজ বিনষ্ট করে দেয়। তাই আত্মহত্যাকারী শত ভালো কাজ করলেও দোজখবাসী হয়ে থাকে।

৩৩। বিনা তদন্তে কারো সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ ও অপপ্রচার

মুসনাদে আহমাদের বরাদ দিয়ে ইবনে কাছীর বর্ণনা করেন যে, বনুল মুস্তালিক গোত্রের সরদার, উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়াইরিয়ার পিতা হারেছ ইবনে যেরার রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হলে তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং যাকাত প্রদানের আদেশ দিলেন। হারেস ইসলামের দাওয়াত কবুল এবং যাকাত প্রদানের ওয়াদা করে বললেনঃ এখন আমি নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদেরকেও ইসলাম ও যাকাত প্রদানের দাওয়াত দেব। যারা আমার কথা মানবে ও যাকাত দেবে, আমি তাদের যাকাত একত্রিত করে আমার কাছে জমা রাখবো। আপনি অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্যন্ত কোন দূত আমার কাছে পাঠাবেন। আমি তার কাছে যাকাতের জমাকৃত অর্থ

দিয়ে দেব। এরপর হারেস ওয়াদা অনুযায়ী যাকাতের অর্থ জমা করলেন এবং দূত আগমনের নির্ধারিত মাস ও তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোন দূত না আসায় হারেসের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হলো। তিনি ভাবলেন, হয়তো রাসূল (সাঃ) কোন কারণে আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। নতুবা ওয়াদা অনুযায়ী দূত না পাঠানোর কোন কারণ থাকতে পারে না। হারেস তার এই আশংকার কথা ইসলাম গ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছেও ব্যক্ত করলেন। অতঃপর সবাই মিলে একদিন রাসূল (সাঃ) এর কাছে যাবেন বলে স্থির করলেন।

এদিকে রাসূল (সাঃ) নির্ধারিত তারিখে ওলীদ বিন উকবাকে যাকাত গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু ওলীদের মনে এই ধারণা জন্মে যে, যেহেতু এই গোত্রের সাথে তার পুরানো শত্রুতা রয়েছে, তাই তারা হয়তো তাকে একা পেয়ে হত্যা করে ফেলবে। এই আশংকার ভিত্তিতে তিনি আর অগ্রসর না হয়ে সেখান থেকেই ফিরে আসেন এবং রাসূল (সাঃ) কে গিয়ে বলেন যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকেও হত্যা করার হুমকি দিয়েছে। তখন রাসূল (সাঃ) রাগান্বিত হয়ে হযরত খালেদ বিন ওলীদের নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ প্রেরণ করেন। ঠিক এই সময়ে হারেস মদীনার উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়ে এই মুজাহিদ বাহিনীকে দেখতে পান। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কোন গোত্রের দিকে রওনা হয়েছেন। তারা বললেন, আমরা তোমার গোত্রের দিকেই যাচ্ছি। হারেস কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাকে ওলীদ বিন উকবার কথিত পুরো কাহিনী শুনানো হলো। তাকে বলা হলো যে, বনুল মুস্তালিক গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে ওলীদকে হত্যা করার ফন্দি এঁটেছে। এ কথা শুনে হারেস বললেন, আল্লাহর কসম, আমি ওলীদ বিন উকবাকে দেখিওনি। সে আমার কাছে যায়নি। অতঃপর হারেস রাসূল (সাঃ) এর সামনে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি যাকাত দিতে অস্বীকার করেছ এবং আমার দূতকে হত্যা করতে চেয়েছ? হারিস বললেন, কখনো নয়। আল্লাহর কসম, সে আমার কাছে যায়নি এবং আমি তাকে দেখিওনি। নির্ধারিত সময়ে আপনার দূত যায়নি দেখে আমার আশংকা হয় যে, আপনি হয়তো কোন ত্রুটির কারণে আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ওলীদ বিন উকবা রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশ মোতাবেক বনুল মুস্তালিক গোত্রে পৌঁছেন। গোত্রের লোকেরা আগেই জানতো যে, রাসূল (সাঃ) এর দূত অমুক তারিখে আসবে। তাই তারা

অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে বস্তি থেকে বেরিয়ে আসে। ওলীদ সন্দেহ করলেন যে, তারা বোধ হয় পুরানো শত্রুতার কারণে তাকে হত্যা করতে এগিয়ে আসছে। তাই তিনি সেখান থেকেই ফিরে আসেন এবং রাসূল (সাঃ) এর কাছে নিজ ধারণা অনুযায়ী অভিযোগ পেশ করলেন যে, তারা যাকাত দেয়ার পরিবর্তে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে। তখন রাসূল (সাঃ) খালেদ বিন ওলীদকে প্রেরণ করলেন এবং বলে দিলেন যে পূর্ণ তদন্ত ও অনুসন্ধানের পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। খালেদ বিন ওলীদ রাতের বেলায় বস্তির নিকট পৌঁছে গোপনে কয়েকজন গুপ্তচর পাঠিয়ে দিলেন। তারা ফিরে এসে সংবাদ দিল যে তারা সবাই ঈমান ও ইসলামের ওপর কায়েম আছে এবং যাকাত দিতে প্রস্তুত আছে। তাদের মধ্যে ইসলামের বিপরীত কিছু নেই। খালেদ ফিরে এসে রাসূল (সাঃ) এর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনের সূরা আল-হুজরাত নাযিল হয়। বিশেষতঃ এই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত আয়াতটি হলোঃ

"হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।"

শিক্ষাঃ এই ঘটনা ও এই ঘটনা উপলক্ষে অবতীর্ণ সূরার সংশ্লিষ্ট আয়াতের প্রধান শিক্ষা এই যে, কোন প্রচারণা- চাই তা মৌখিক হোক বা লিখিত হোক - বক্তা বা লেখকের চারিত্রিক মান এবং খবরের গুরুত্ব বিবেচনা করে গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে। খবর যদি এমন গুরুতর হয় যে, তার ভিত্তিতে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সংঘটিত হতে পারে তবে তা তদন্ত ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না। সংবাদদাতা অসৎ হলে তো নয়ই, এমন কি সৎ হলেও নয়। কেননা খবরটি তার ইচ্ছাকৃত অপপ্রচার না হয়ে ভুল বুঝাবুঝির কারণেও উদ্ভূত হতে পারে। আর ফাসেক বা অসৎ লোক হলে তো গ্রহণ করাই যাবে না তদন্ত ছাড়া। কেননা তা একটা নিরেট মিথ্যাচারও হতে পারে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, একজন লোকের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই বলে বেড়ায়।

৩৪। বদর যোদ্ধাদের মর্যাদা

বিভিন্ন সহীহ রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, বদর যুদ্ধের পর মক্কা বিজয়ের কিছু আগে মক্কার সারা নাম্মী একজন গায়িকা মহিলা মদীনায়

আগমন করে। রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি হিজরত করতে এসেছ? সে বললো, না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, তবে কি মুসলমান হয়ে এসেছ? সে বললো, না। রাসূল (সাঃ) বললেন, তাহলে কি করতে এসেছ? সে বললো, আপনারা মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। আপনাদের ওপর নির্ভর করেই আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন মক্কার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে। আর আপনারাও এখানে চলে এসেছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। আমি অনন্যোপায় হয়ে আপনাদের সাহায্য চাইতে এসেছি। রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি মক্কার পেশাদার গায়িকা। যে যুবকরা তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে তোমাকে অনেক অর্থ দিত তারা কোথায়? সে বললো, বদর যুদ্ধের পর তাদের গান বাজনার জৌ লুস শেষ হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তারা কেউ আমার খোঁজ নেয়নি। অতঃপর রাসূল (সাঃ) কোরেশ বংশীয় মোহাজেরদেরকে তাকে সাহায্য করার জন্য উৎসাহ দিলেন। তাঁরা তাকে কিছু নগদ অর্থ ও কাপড় চোপড় দিয়ে বিদায় দিল।

এ সময় মক্কার কাফেররা হুদাইবীয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করেছে। ফলে রাসূল (সাঃ) কাফেরদের বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত অভিযান পরিচালনার সংকল্প নিয়ে গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই প্রস্তুতির কথা যেন কিছুতেই মক্কার লোকেরা আগে ভাগে জানতে না পারে, সে জন্য তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে গোপনীয়তা রক্ষা করে যাচ্ছিলেন।

মদীনায় যারা প্রথম প্রথম হিজরত করেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী হাতেব ইবনে আবি বালতা'য়া। ইয়েমেনী বংশোদ্ভূত এই সাহাবী ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায়ই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। মক্কায় তাঁর রক্ত সম্পর্কীয় বা ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয় স্বজন ছিল না। তিনি হিজরত করে মদীনায় চলে যাওয়ার পর তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা মক্কাতেই ছিল। রাসূল (সাঃ) ও অন্যান্য সাহাবীর হিজরতের পর মক্কায় বসবাসকারী মুসলমানদের ওপর কাফেররা নানাভাবে জুলুম করতো। যে সব মোহাজিরের আত্মীয় স্বজন মক্কায় ছিল, তাদের সন্তান-সন্ততিরা কোন রকমে নিরাপদে থাকতো। হাতেবের তেমন কোন আত্মীয়-স্বজন না থাকায় তার পরিবার পরিজন মারাত্মক ঝুঁকি ও নির্যাতনের সম্মুখীন ছিল। তাই তিনি ভাবলেন, তার পরিবারকে রক্ষা করার মত কেউ যখন নেই, তখন তিনি যদি মক্কাবাসীদের কোন উপকার করে তাদের সহানুভূতি অর্জন করেন, তাহলে তারা হয়তো তার পরিবারের ওপর জুলুম করবে না। তাই ঐ গয়িকা মহিলার মক্কা গমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন।

হাতেবের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, রাসূল (সাঃ) কে আল্লাহ তায়ালা মক্কা অভিযানে বিজয় দান করবেন। তাই তিনি যদি আগে ভাগে মক্কা অভিযানের বিষয়টি মক্কাবাসীর নিকট ফাঁস করে দেন, তাহলে তাঁর কিংবা ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি ভাবলেন, একটি পত্র লিখে মক্কাবাসীকে জানিয়ে দেবেন যে, রাসূল (সাঃ) মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এতে তাঁর পরিবারের হেফাযতের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তাই তিনি একটি চিঠি লিখে গায়িকা সারার হাতে দিয়ে দিলেন, যাতে সে মক্কার বিশিষ্ট লোকদের নিকট তা পৌঁছিয়ে দেয়। গায়িকা চিঠিটি নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। (তাফসীরে কুরতুবী, মাযহারী)

এদিকে রাসূল (সাঃ) কে আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলেন এবং মহিলাটি কোন্ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাও জানালেন।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) হযরত আলী, আবু মুরসাদ ও যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে আদেশ দিলেন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মহিলাকে ধরার জন্য। তার কাছে মক্কাবাসীর নামে হাতেব ইবনে আবি বাল'তায়ার চিঠি রয়েছে। তাকে পাকড়াও করে চিঠিটা উদ্ধার করে নিয়ে এস। তারা দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে পথিমধ্যেই তাকে ধরে ফেললেন। তারা মহিলাকে বললেন, তোমার কাছে একটা চিঠি আছে ওটা দিয়ে দাও। সে বললো, আমার কাছে কোন চিঠি নেই। তারা প্রাথমিক তল্লাশীতে চিঠি পেলেন না। কিন্তু তারা দমলেন না। কেননা রাসূল (সাঃ) এর কথা মিথ্যা হতে পারে না। তাই তারা কঠোর ভাষায় বললেন, চিঠিটা বের করে দাও। নচেত আমরা তোমাকে নগ্ন করে তল্লাশী চালাবো।

সে নিরুপায় হয়ে চিঠিটা বের করে দিল। আমরা চিঠিটা নিয়ে রাসূল (সাঃ) এর কাছে হাজির হলাম। হযরত ওমর (রাঃ) ঘটনা শুনেই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেনঃ হে রাসূল, এই ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও সকল মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমাদের গোপন তথ্য কাফেরদের কাছে লিখে পাঠিয়েছে। অতএব, অনুমতি দিন। আমি ওর গর্দান উড়িয়ে দেই।

রাসূল (সাঃ) হাতেবকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এই কাজের কারণ কি? হাতেব বললেন, হে রাসূল, আমার ঈমানে কোন ত্রুটি হয়নি। ব্যাপার এই যে, আমি ভাবলাম, আমি যদি মক্কাবাসীর একটু উপকার করি, তাহলে তারা আমার পরিবারের কোন ক্ষতি করবে না। ভেবে দেখুন, আমিই একমাত্র মোহাজের, যার কোন আপনজন মক্কায় নেই, অথচ তার

পরিবার মক্কায় রয়েছে। অন্য সবার স্বগোত্রীয়রা তাদের পরিবারের তদারকী করে। কিন্তু আমার তেমন কেউ নেই।

রাসূল (সাঃ) হাতেবের বক্তব্য শুনে বললেন, সে সত্য বলেছে। অতএব, তোমরা তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া মন্দ বলো না। হযরত ওমর (রাঃ) তথাপি ঈমানের আবেগে অধীর হয়ে তার আগের উক্তিটি পুনরায় উচ্চারণ করলেন। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, সে একজন বদর যোদ্ধা। আল্লাহ তায়ালা বদর যোদ্ধাদের সকল গুনাহ মাফ করেছেন ও তাদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রাসূল (সাঃ) বলেন, "আল্লাহ হয়তো বদর যোদ্ধাদের বলে দিয়েছেন, তোমরা যা খুশী তাই কর।" এ কথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) চোখের পানি ফেলে বললেন, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই ভালো জানেন। (ইবনে কাছির) কোন কোন রেওয়ায়েতে হাতেবের এই উক্তিও বর্ণিত হয়েছে যে, আমি এ কাজ ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য করিনি। কেননা আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, রাসূল (সাঃ) বিজয়ী হবেনই। মক্কাবাসী জেনে গেলেও ক্ষতি হবে না।

শিক্ষা ঃ (১) এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বদর যুদ্ধের ন্যায় ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সাহাবায়ে কেরামের ভুলত্রুটি আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর এ ধরনের পরীক্ষায় উত্তির্ণ মুমিনদেরকে তাদের ভুল ত্রুটির জন্য সন্দেহের চোখে দেখা উচিত নয় এবং বিনা তদন্তে ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেয়াও উচিত নয়।

(২) ক্ষমার ঘোষণা সত্ত্বেও এটা মানতে হবে যে, এ ধরনের কাজ ভুল। মুসলমানদের স্বার্থের ক্ষতিকর কোন কাজ কোন অবস্থায়ই করা চাই না। হযরত হাতেবের এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে সূরা মুমতাহিনা নাযিল হয় এবং তাতে এ কাজের কঠোর সমালোচনা করে মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাহায্য ও সহানুভূতি গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়। কাজটি যদি ভুল ও অন্যায় না হতো তাহলে রাসূল (সাঃ) চিঠিটা আটকাতেন না এবং সূরা মুমতাহিনায় এর সমালোচনা করা হতো না।

৩৫। সুরাকার বিবেক জেগে উঠলো

সুরাকা ইবনে মালেক। কুরাইশ বংশের এক দুঃসাহসী যুবক। রাসূল (সাঃ) যেদিন হযরত আলীকে বিছানায় শুইয়ে রেখে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে সাথে নিয়ে মদীনায় হিজরত করার জন্য মক্কা থেকে বেরুলেন, সেই দিনই কুরাইশ নেতারা ঘোষণা দিল যে, মুহাম্মদকে যে ব্যক্তি খুঁজে ধরে আনতে পারবে, তাকে একশো উট পুরস্কার দেয়া হবে। এই পুরস্কার লাভের

নেশায় চারদিকে ঘোড়া ছুটাতে লাগালো দুর্ধর্ষ যুবক সুরাকা ইবনে মালেক এবং আরো অনেকে। রাসূল (সাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) দিন কয়েক মক্কায় পার্শ্ববর্তী সূর পর্বত গুহায় কাটিয়েছিলেন। সে সময় অনেকেই তাদের ঘোড়ার পদচিহ্ন ধরে সূর পর্বত গুহার কাছে গিয়েছিল। কিন্তু গুহার মুখে আল্লাহ নিযুক্ত রক্ষী মাকড়সা জাল বুনে তাদের গতি রুখে দেয়। সবাই মনে করলো যে, তারা এই গুহার ভেতরে থাকলে মাকড়সার জাল ছিঁড়ে যেত। অগত্যা সবাই ওখান থেকে ফিরে যায়। এর পর মুহাম্মদ (সাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) কে খোঁজার চেষ্টা থেকে সুরাকা ছাড়া আর সবাই বিরত হয়। একা সুরাকা মক্কার চারপাশের মরুভূমিতে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে।

যেদিন আল্লাহর হুকুমে হযরত আবু বকরকে সাথে নিয়ে রাসূল (সাঃ) সূর পর্বত গুহা থেকে বেরিয়ে মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন। সেদিন সহসা সূরাকার নজরে পড়ে গেলেন। তারা দু'জন যাচ্ছিলেন উটের পিঠে সওয়ার হয়ে। তাই সূরাকা ঘোড়া ছুটিয়ে খুব দ্রুত তাদের কাছে পৌঁছে গেল। পেছনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে উভয়ে চমকে উঠলেন। দেখলেন পেছনে অতি নিকটেই যমদূতের মত ছুটে আসছে সূরাকা ইবনে মালেক। হযরত আবু বকর যিনি সূর পর্বতের গুহায় বসেও এক একবার কাফেরদের পদ শব্দে চমকে উঠে রাসূল (সাঃ)কে নিজের অজানা আশংকার কথা জানাচ্ছিলেন, তখন রাসূল (সাঃ) তাকে এই বলে প্রবোধ দিচ্ছিলেন যে, "আবু বকর চিন্তা করোনা, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" সেই প্রবোধ বাক্যে আবু বকর শান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এখন? সে সময় আর যা হোক, কাফেররা তাঁদেরকে সাক্ষাত দেখতে পায়নি। কিন্তু এখন কী হবে? এখন যে শত্রু তাদেরকে সরাসরি দেখতে পাচ্ছে, দিনের আলোয় দেখে চিনতেও পারবে এবং ঘোড়সওয়ারের পক্ষে উষ্ট্রারোহীকে ধরা একবারেই সহজ। ওদিকে সূরাকা বিকট শব্দে শাসাচ্ছে আর বলছে, আবু বকর, এখন তোমাদের আর নিস্তার নেই। ছুটাছুটি করে লাভ নেই। থামো। রাসূল (সাঃ) আবু বকরের বিহ্বল অবস্থা দেখে আবারও তাকে শান্ত হতে বললেন এবং বললেন "ভয় পেয়োনা, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন"।

আবু বকর যতটা দ্রুত সম্ভব উটকে হাঁকাতে লাগলেন। ওদিকে সূরাকা যখন একেবারে তাদের কাছে এসে পড়লো, অমনি ঘটে গেল এক অভাবনীয় ঘটনা। সূরাকার ঘোড়ার পা হাঁটু সমান মাটিতে ডেবে গেল। সূরাকা অনেক চেষ্টা করে তাকে ওঠালো। ইত্যবসরে রাসূল (সাঃ) ও আবু বকর আরো বেশ খানিকটা দূরে চলে গেলেন। সূরাকা আবার প্রবল জোরে ঘোড়া হাঁকালো।

আবার কাছে এসে গেল। কিন্তু আবার সেই একই ঘটনা ঘটলো। আবারো সূরাকার ঘোড়ার পা হাঁটু সমান মাটিতে ডেবে গেল। সূরাকা আবার তাকে ওঠালো এবং আবারো হাঁকিয়ে কাছে গেল। আবারো একই ঘটনা ঘটলো। এভাবে ক্রমাগত কয়েকবার ঘটার পর সূরাকার বিবেক জেগে উঠলো। সে আর তাদের পদানুসরণ না করে ফিরে গেল আবু জাহলের কাছে। তখন আবু জাহলের নাম ছিল "আবুল হিকাম" অর্থাৎ বুদ্ধিমান বা প্রাজ্ঞ। আবু জাহল যখন তাকে তার অভিযান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলো। সে একটি কবিতার মাধ্যমে পুরো ঘটনা বিবৃত করলো। কবিতাটির প্রথম কয়টি লাইন এরূপঃ

"ওহে আবুল হিকাম, তুমি যদি আমার ঘোড়ার অবস্থা স্বচোখে দেখতে যে, কিভাবে তার পাগুলো মাটিতে দেবে যাচ্ছিল, তাহলে তুমি অবাক হতে এবং তোমার কোন সন্দেহ থাকতোনা যে, মুহাম্মদ (সাঃ) একজন নবী ও পথ প্রদর্শক, তাঁর মোকাবিলা করার ক্ষমতা কারো নেই।"

যতদূর জানা যায়, সূরাকা এরপর ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু নিজের মুসলমান হওয়ার কথা গোপন রাখেন এবং মক্কাতেই অবস্থান করেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি রাসূল (সাঃ) এর সাথে দেখা করেন এবং প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন।

শিক্ষাঃ সত্যকে উপলব্ধি করার পর সত্যের বিরোধীতা থেকে বিরত হলে আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা পাওয়া ও হেদায়াত লাভ করার আশা করা যায়।

৩৬। হযরত খুবাইবের শাহাদাত

ওহুদ যুদ্ধের পর আযল ও কারাহ গোত্রের একদল লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এসে বললোঃ হে রাসূল! আমাদের গোত্রে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই আপনার সাহাবীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। তারা আমাদেরকে কুরআন পড়াবেন এবং ইসলামের বিধিসমূহ শিখাবেন। রাসূল (সাঃ) তাদের কথামত সরল বিশ্বাসে আসেম ইবনে সাবেত, খুবাইব ইবনে আদী ও যায়েদ ইবনে দাখিনা সহ ছয়জন মতান্তরে দশজন সাহাবীকে পাঠিয়ে দিলেন। তারা মক্কা ও উসফানের মধ্যবর্তী হুদাত নামক স্থানে পৌঁছলে আযল ও কারাহ গোত্রের লোকেরা বিশ্বাস ঘাতকতা করে তরবারী সজ্জিত হয়ে সাহাবীদেরকে ঘেরাও করে ফেললো। সাহাবীগণ শত্রুদের এই আকস্মিক বিশ্বাস ঘাতকতায় হতবাক হলেও ঘাবড়ালেন না। তারা তাৎক্ষণিকভাবে তরবারী হাতে নিয়ে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। শত্রুরা বললোঃ তোমরা নেমে এস। আল্লাহর কসম, আমরা তোমাদেরকে হত্যা করবো না।

আসেমসহ তিনজন তাদের এই প্রতিশ্রুতি অগ্রাহ্য করলেন। তারা বললেন, বিশ্বাসঘাতক কাফেরদের ওয়াদায় বিশ্বাস করা যায় না। তারা লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। শহীদ হবার পূর্বে তিনি দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! আমাদের খবর রাসূল (সাঃ) কে জানিয়ে দিও।"

আসেমের শাহাদাতের পর শত্রুরা তার মাথা কেটে নিতে চাইল। ওহুদ যুদ্ধে তাদের দু'জন আসেমের হাতে নিহত হয়েছিল। তাই তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, আসেমের মাথার খুলিতে মদ খাবে। কিন্তু এক ঝাঁক বোলতা এমনভাবে আসেমের মাথাটা ঘিরে রাখলো যে, তারা তার মাথা বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হলো না। কারণ মৃত্যুর পূর্বে তিনি এই দোয়াও করেছিলেন যে, কোন কাফের যেন তার দেহকে স্পর্শ করতে না পারে।

এরপর যায়েদ ইবনে দাখিনা, খুবাইব ইবনে আদী ও আব্দুল্লাহ ইবনে তারিক কিছুটা নমনীয় হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং শত্রুদের কাছে আত্মসমর্পন করলেন। তারা তাদেরকে বন্দী করে মক্কায় নিয়ে চললো। পথিমধ্যে হাজরানে গিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে তারিক রশি খুলে তরবারী নিয়ে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। শত্রুরা তাকে পাথর মেরেই শহীদ করে ফেললো। অবশিষ্ট খুবাইব ও যায়েদকে তারা মক্কায় নিয়ে কুরায়েশদের কাছে বিক্রি করে দিল।

অতঃপর কুরায়েশরা খুবাইব ও যায়েদকে বদর ও ওহুদের প্রতিশোধ স্বরূপ হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। যায়েদকে হত্যা করার আগে আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে যায়েদ! বল, তোমার জায়গায় যদি মুহাম্মদ থাকতো, তোমার পরিবর্তে আমরা তাকে হত্যা করতাম এবং তুমি নিরাপদে বাড়ী চলে যেতে, তাহলে কেমন হতো? যায়েদ বললেন, আল্লাহর কসম, তাঁর গায়ে একটা কাটাও যদি ফোটে, তবে আমি নিজের মুক্তির বিনিময়েও তা সহ্য করবো না। একথা শুনে আবু সুফিয়ান বললোঃ "মুহাম্মদের সংগীরা তাকে যেমন ভালোবাসে, এমন ভালোবাসতে আমি আর কাউকে দেখিনি।" অতঃপর তাকে শহীদ করে দেয়া হয়।

সবার শেষে খুবাইবের পালা। পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কুরাইশদের এমন এক দাসী মাবিয়া বলেনঃ খুবাইব আমার কাছে আমার একটি ঘরে বন্দী ছিলেন। আমি একদিন তার কাছে গেলাম। দেখলাম, বিরাট এক থোকা আঙ্গুর তার হাতে। তিনি তা থেকে আঙ্গুর ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছেন। অথচ ঐ সময় দেশের কোথাও আঙ্গুর ছিল না। হত্যার পূর্বে খুবাইব আমার কাছে একটা ক্ষুর চাইলেন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হবার জন্য। একটি ছেলের হাতে আমি ক্ষুর পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

এরপর কাফেররা খুবাইবকে নিয়ে তানঈমে গেল। হত্যার পূর্বে তিনি তাদের কাছে দু'রাকাত নামায পড়ার অনুমতি চাইলে তারা অনুমতি দিল। খুবাইব সংক্ষেপে দু'রাকাত নামায পড়ে বললেনঃ তোমরা হয়তো ভাববে, আমি মৃত্যুর ভয়ে নামায লম্বা করছি। তা না হলে আরো লম্বা নামায পড়তাম। সেই থেকে শাহাদাতের পূর্বে সুযোগ পেলে দু'রাকাত নামায পড়া মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে গেছে।

এরপর তারা তাকে শূলে চড়ালো। শূলে চড়ার পূর্ব মুহূর্তে তিনি দোয়া করলেনঃ "হে আল্লাহ! আমরা আপনার রাসূলের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছি। তবুও আমাদের সাথে এরা যে আচরণ করলো, সে খবর রাসূলের কাছে পৌঁছে দাও। হে আল্লাহ! এদের সকলকে গুণে গুণে এক এক করে খতম করে দিও। কাউকে রেহাই দিওনা।

শাহাদাতের পূর্বে খুবাইব একটি কবিতাও আবৃত্তি করেছিলেন। তার কয়েকটি লাইনের অনুবাদ নিম্নরূপঃ

"আমি যখন মুসলমান অবস্থায় নিহত হই, তখন কোন্ দিকে শুইয়ে আমাকে হত্যা করা হয়, তার আমি কোন পরোয়া করিনা। ওহে আরশের অধিপতি, আমার প্রতি তাদের যে অভিপ্রায়, তাতে আমাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দাও। তারা আমার গোশত টুকরো টুকরো করার সংকল্প করেছে। তখন আমার জীবনের আর কোন আশা নেই। এ সব তো আল্লাহরই উদ্দেশ্যে, তিনি চাইলে আমার ছিন্ন ভিন্ন দেহেও বরকত দিতে পারেন। তারা আমাকে কুফরী কিংবা মৃত্যু- এর যে কোন একটি বেছে নিতে বলেছে। আমার দু'চোখে যে অশ্রু বয়ে যাচ্ছে, তা মৃত্যুর ভয়ে নয় বরং আল্লাহর ভয়ে বইছে। আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। আমাকে মরতে তো একদিন হবেই। আমি কেবল জাহান্নামের লেলিহান শিখাকে ভয় করি। আমি শত্রুর সামনে কোন দুর্বলতা ও অস্থিরতা প্রকাশ করবো না। কেননা আল্লাহর কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন।" এরপর তারা খুবাইবকে হত্যা করে।

শিক্ষাঃ হযরত খুবাইবের শাহাদাত আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকারীদের জন্য অত্যন্ত শিক্ষনীয় ও প্রেরণাদায়ক একটি ঘটনা। এমন লোমহর্ষক নির্যাতন ও হত্যার মুখে অবিচল থাকা অত্যন্ত মজবুত ঈমানের পরিচায়ক যা আল্লাহর রহমত ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এই ঘটনার আরো একটি শিক্ষা এই যে, ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের শত্রুর দুরভিসন্ধি, চক্রান্ত ও ধাপ্পাবাজী সম্পর্কে সাবধান হতে হবে। আল্লাহর রাসূলের জীবদ্দশায় এরূপ ঘটনা ঘটিয়ে আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

৩৭। আবু জাহলের যুলুম প্রতিরোধে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

জাহেলিয়াত যুগে আবু জাহল জনৈক ইয়াতীমের অভিভাবক ছিল। সে ঐ ইয়াতীমের পৈতৃক সম্পত্তি দেখাশুনার নামে নিজেই ভোগ দখল করতো এবং ইয়াতীমকে তার কোন অংশই দিত না। একদিন সেই ইয়াতীম বালক তার কাছে এসে পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির কিছু অংশ চাইল। তার গায়ে তখন কাপড় চোপড়ও ছিল না। কিন্তু পাষন্ড আবু জাহল তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করলো না, ছেলেটি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে হতাশ হয়ে ফিরে চললো। কোরায়েশ নেতাদের কয়েকজন দুষ্টামি করে তাঁকে বললোঃ "মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কাছে যেয়ে নালিশ করে দে। সে আবু জাহলের কাছ থেকে সুপারিশ করে তোর সম্পত্তি আদায় করে দেবে।" আসলে তাদের মতলব ছিল আবু জাহলের সাথে একটা টক্কর লাগিয়ে দিয়ে রাসূল (সাঃ) কে জব্দ করা। ছেলেটি জানতোই না যে, আবু জাহলের সাথে তার সম্পর্ক কী এবং তারা কোন্ উদ্দেশ্যে তাকে এই পরামর্শ দিচ্ছে। সে সরল মনে রাসূল (সাঃ) এর কাছে হাজির হলো এবং নিজের পুরো ঘটনা বর্ণনা করলো।

রাসূল (সাঃ) তৎক্ষণাত উঠলেন এবং তাঁর কট্টর দুশমন আবু জাহলের কাছে চলে গেলেন। তাঁকে দেখে আবু জাহল স্বাগত জানালো। তিনি যখন বললেন যে, এই ছেলেটার পাওনা দিয়ে দাও, তখন সে নির্বিবাদে মেনে নিল এবং তার পাওনা দিয়ে দিল। ওদিকে কোরায়েশ নেতারা অপেক্ষায় ছিল আবু জাহল ও মুহাম্মাদের (সাঃ) মধ্যে কী কান্ড ঘটে তা জানার জন্য। তারা একটা মজার সংঘর্ষ ঘটার খবরের আশায় প্রহর গুনছিল। কিন্তু যখন পুরো ঘটনার খবর পেল, তখন অবাক হয়ে গেল এবং আবু জাহলকে এসে ভর্ৎসনা করতে লাগলো যে, সে এমন সুযোগ হাতছাড়া করলো কেন এবং সেও ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে বলে চিৎকার দিতে লাগলো। আবু জাহল তাদেরকে বললোঃ "আল্লাহর কসম, আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করিনি। কিন্তু আমি দেখতে পেলাম যেন মুহাম্মদের ডানে ও বামে এক একটা বর্শা রয়েছে, আমি তার কথামত কাজ না করলে তা আমার বুকের মধ্যে ঢুকে যাবে।"

শিক্ষা ঃ ইয়াতীম ও দুস্থ মানুষের ওপর কেউ অত্যাচার করলে তা নীরবে বরদাশত করা উচিত নয়। সমাজের প্রভাবশালী লোকদের উচিত আল্লাহর ওপর ভরসা করে যুলুম প্রতিরোধের চেষ্টা করা। যালেমদের সাধারণতঃ মনোবল কম থাকে। দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলে তারা প্রায়ই হার মানে। এ কাজে একাকী অগ্রসর হলেও আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার আশা করা যায়।

৩৮। বীরে মাউনার হৃদয় বিদারক ঘটনা

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে নাজদ থেকে আবু বারা নামক এক ব্যক্তি মদীনায় আগমন করলো। সে রাসূল (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করলে রাসূল তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে দাওয়াত গ্রহণও করলোনা, প্রত্যাখানও করলোনা। সে বললোঃ হে মুহাম্মদ! আপনি আমার সাথে কিছু সংখ্যক সাহাবীকে নাজদে পাঠালে ভালো হয়। তারা সেখানে গিয়ে ইসলাম প্রচার করলে অনেকে তা গ্রহণ করতে পারে। রাসূল (সাঃ) বললেন, নাজদবাসী যে তাদের ক্ষতি করবে না তার নিশ্চয়তা কী? আবু বারা বললো, তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমিই নিচ্ছি।

রাসূল (সাঃ) মুনযির বিন আমরের (রাঃ) নেতৃত্বে চল্লিশজন সাহাবীকে নাজদে পাঠিয়ে দিলেন। তারা চলতে চলতে বীরে মাউনা নামক কুয়ার কিনারে পৌঁছলেন। সেখানে সবাই অবস্থান গ্রহণ করে তাদের অন্যতম সংগী হারাম ইবনে মিলহান (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহর পত্রসহ এলাকার বিশিষ্ট গোত্রপতি আমের বিন তোফায়েলের কাছে পাঠালেন। আমের রাসূল (সাঃ) এর চিঠি তো পড়ে দেখলই না. অধিকন্তু দূত হারাম ইবনে মিলহানকে হত্যা করে বসলো। এরপর বাদবাকীদেরকেও হত্যা করার জন্য বনু সুলাইম গোত্রের একাংশের সাহায্য নিয়ে তাদেরকে ঘেরাও করে ফেললো। সাহাবীগণ শত্রুদের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করলেন এবং একজন ব্যতীত সবাই শহীদ হয়ে গেলেন।

আমের ইবনে তুফায়েল পরবর্তীকালে লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আমি নিহতদের মধ্যে একজনের লাশকে আকাশে উঠে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছি। এই লোকটি কে? লোকেরা বললোঃ আমের ইবনে ফুহাইয়া। (হযরত আবু বকর সিদ্দীকের মুক্ত সাবেক ক্রীতদাস এবং রাসূল (সাঃ) ও আবু বকরের মদীনায় হিজরতকালীন পথ প্রদর্শক।)

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, আমের ইবনে তোফায়েলের সহযোগী জাবার পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তার ইসলাম গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেনঃ বীরে মাউনার ঘটনার সময় আমি বর্শা দিয়ে একজন সাহাবীর দু'কাঁধের মাঝখানে যখন আঘাত করলাম এবং বর্শা যখন তার বুক ভেদ করে বেরিয়ে গেল, তখন ফিনকি দিয়ে বের হওয়া রক্তকে সে দু'হাতে মুখে মাখাচ্ছিল আর বলছিলঃ "ফুযতু ওয়া রব্বিল কা'বা।" অর্থাৎ কা'বার প্রভুর শপথ, আমি সফল হয়েছি। একথা শুনে আমি মনে মনে বললাম, যে ব্যক্তি আমার হাতে খুন হলো তার আবার সাফল্য এল কোত্থেকে? পরে আমি

অনেকের কাছে এ কথার মর্ম জিজ্ঞাসা করি। তারা আমাকে জানায় যে, সে নিজের শহীদ হওয়াকেই সাফল্য বলে বিশ্বাস করতো। আর এ বিশ্বাস শুধু তার একার নয়, প্রত্যেক মুমিনেরই।

শিক্ষাঃ শাহাদাত বাহ্যতঃ ব্যর্থতা মনে হলেও আসলে তা মুমিনের সবচেয়ে বড় সাফল্য। কুরআনে আল্লাহ বলেছেনঃ "নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। ফলে হত্যা করে ও নিহত হয়। ....আর এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য।" (সুরা তাওবা)

৩৯। মুমিনের নামায

একবার রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন যে, নাজদে দুটি গোত্র মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি কালবিলম্ব না করে সাতশো সাহাবীকে সাথে নিয়ে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে নাজদ অভিমুখে যাত্রা করলেন। হযরত উসমান ইবনে আফফানকে তিনি মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত রেখে গেলেন। যথাস্থানে পৌঁছে তিনি 'যাতুর রিকা' নামক পর্বতবেষ্টিত এক উপত্যকায় শিবির স্থাপন করলেন। এ কারণে এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে 'গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা'।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর ত্বরিত উপস্থিতির ফলে শত্রুদল এতই ঘাবড়ে গেল যে, তারা রণে ভংগ দিয়ে চতুর্দিকে পালিয়ে গেল। ফলে যুদ্ধ না করেই রাসূল (সাঃ) সসৈন্যে মদীনায় ফিরে গেলেন। তবে এই অভিযানকালে এমন একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে যা চিরদিন মুসলমানদের জন্য শিক্ষা ও প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। এই অভিযানকালে রাসূল (সাঃ)-এর তাবু পাহারা দেয়ার জন্য প্রতি রাত্রে পালাক্রমে কয়েকজন করে সাহাবীকে নিয়োগ করা হয়। যেদিন হযরত আব্বাদ (রাঃ) ও আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাঃ) কে পাহারার কাজে নিয়োগ করা হয়, সেই দিনই ঘটে এই মর্মস্পর্শী ঘটনা।

হযরত আব্বাদ ও হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার পরস্পরে পুরো রাতটাকে এভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন যে, প্রথম ভাগে পাহারার দায়িত্ব হযরত আব্বাদের ওপর এবং শেষের অংশ হযরত আম্মারের ওপর পড়লো। হযরত আব্বাদের পাহারার পালা শুরু হলো। তিনি ছিলেন অত্যধিক নফল নামাযের ভক্ত। তাই ভাবলেন, এত দীর্ঘ সময় চুপচাপ থেকে লাভ কী? সময়টা নামায পড়ে কাটিয়ে দেয়া যাক। তাই তিনি নফল নামাযের নিয়ত

করে নামাযে সূরা কাহাফ পড়া শুরু করে দিলেন। ওদিকে হযরত আম্মার ঘুমিয়ে পড়লেন। হযরত আব্বাদ যখন নামাযে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সূরা পাঠরত, তখন চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। এক কাফের সন্তর্পনে সামনে এল। সে দূর থেকে স্পষ্ট দেখতে পেল না যে কোন পাহারাদার আছে কিনা। তবে দূর থেকে হযরত আব্বাদকে একটা গাছ মনে করলো। আবার তার মনে সন্দেহ হলো যে, ওটা গাছ না হয়ে একটা মানুষও হতে পারে। তাই সে নিজের সন্দেহ ভঙ্গনের জন্য তাকে লক্ষ্য করে একটা তীর ছুঁড়লো। তীর হযরত আব্বাদের পিঠে গিয়ে ঢুকলো। কিন্তু নামায ছাড়লেন না। কাফেরটি সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য একে একে তিনিটে তীর ছুঁড়লো। প্রত্যেকটি তীর তার গায়ে বিদ্ধ হয়ে প্রবল রক্তপাত ঘটালো। অগত্যা বাধ্য হয়ে তিনি নামায ছেড়ে দিয়ে হযরত আম্মারকে ডেকে ঘুম থেকে জাগালেন। ইত্যবসরে তার নড়াচড়া টের পেয়ে ও কথাবার্তা শুনে শত্রু সৈন্যটি নীরবে প্রস্থান করলো। হযরত আম্মার তাকে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি প্রথম তীরের সাথে সাথেই আমাকে ডাকলেন না কেন?"

হযরত আব্বাদ বললেনঃ আমি নামাযে সূরা কাহাফ পাঠ করছিলাম। এতে এত মজা লাগছিল যে সূরা শেষ না করে কিছুতেই নামায ছাড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল না।

হযরত আব্বাদ (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে মুরতাদদের বিরুদ্ধেও জেহাদে অংশগ্রহণ করেন এবং ভন্ড নবী মুসাইলিমার বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে শহীদ হন।

শিক্ষা ঃ (১) শত্রুর আক্রমণের প্রস্তুতির কথা জানার পর চুপ করে বসে না থেকে আক্রমণ প্রতিহত করার যথাসাধ্য প্রস্তুতি নেয়া উচিত।

(২) নামাযে পঠিত কুরআনের অর্থের দিকে খেয়াল রাখলে নামাযে মনোনিবেশ করা সহজ হয়।

৪০। মুমিনের আতিথেয়তা

একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললোঃ আমি অনাহারে আছি। রাসূল (সাঃ) তৎক্ষণাত অন্য এক ব্যক্তিকে নিজের এক স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে কিছু খাবার আনতে বললেন। কিন্তু রাসূল (সাঃ) এর ঐ স্ত্রী জানালেন যে, তাঁর কাছে পানি ছাড়া আর কিছু নেই। অতঃপর একে একে অন্য সকল স্ত্রীর কাছে খাবার চেয়ে পাঠালেন। কিন্তু প্রত্যেকের কাছ থেকে একই জবাব পেলেন যে, পানি ছাড়া আর কিছুই নেই।

অতঃপর রাসূল (সাঃ) তাঁর সাহাবীগণের কাছে জানতে চাইলেন যে, তোমাদের কারো এই ব্যক্তিকে আজকের রাতের জন্য আতিথেয়তা করার ক্ষমতা আছে কি? আনসারদের একজন বললেন ঃ "হে রাসূল ! আমি প্রস্তুত।" তিনি লোকটিকে নিয়ে নিজের পরিবারের কাছে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বললেন ঃ "আল্লাহর রাসূলের মেহমানকে যতন কর।" স্ত্রী বললেন ঃ আমার ছেলেমেয়েদের খাবার ছাড়া আর কিছু নেই। সাহাবী বললেন ঃ বেশ তো, ওদেরকে অন্য কোন বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করে রাখ। তারপর রাতের খাবার চাইলে ঘুম পাড়িয়ে রাখ। আর আমাদের মেহমান খেতে আসলে আলো নিভিয়ে দাও এবং এরূপ ভান কর যেন আমরাও তার সাথে খাচ্ছি। অতঃপর তারা একত্রে বসলেন। কিন্তু শুধু মেহমান তৃপ্ত হয়ে আহার করলো। আর তারা উভয়ে এবং ছেলেমেয়েরা অনাহারে রাত কাটিয়ে দিলেন। সকাল বেলা তিনি যখন রাসূল (সাঃ) এর নিকট এলেন, তখন দেখলেন, রাসূল (সাঃ) পুরো ঘটনা ওহীর মাধ্যমে জেনে ফেলেছেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা দু'জনে তোমাদের মেহমানের সাথে রাত্রে যে ব্যবহার করেছ, তাতে আল্লাহ তায়ালা মুগ্ধ হয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

শিক্ষা ঃ মেহমানের যত্ন করা ইসলামে অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। এমনকি প্রয়োজনে নিজেরা অভুক্ত থেকেও মেহমানকে আপ্যায়ন করানো উচিত।

৪১। মুমিনের আত্মসংযম

এক রণাঙ্গনে মুসলমান বাহিনীর সাথে কাফেরদের প্রচন্ড যুদ্ধ চলছে। হযরত আলী (রাঃ) এক অমুসলিম যোদ্ধাকে ধরাশায়ী করে তার বুকের ওপর চড়ে বসেছেন। হাতে নগ্ন তরবারী। এক্ষুণি তার বুকে বসিয়ে দেবেন। সহসা ধরাশায়ী অমুসলিম সৈনিকটি তার শেষ অস্ত্র চালাতে গিয়ে বুকের ওপর চেপে বসা হযরত আলীর (রাঃ) মুখে থুথু দিয়ে ভরে দিল। হযরত আলী (রাঃ) এক মুহূর্ত থমকে বসে রইলেন। তারপর তার বুকের ওপর থেকে উঠে আসলেন। তরবারি দূরে নিক্ষেপ করে বললেন, "যাও, তুমি মুক্ত।"

কাফের সৈনিকটি তো হতবাক। সে যে একটি যুদ্ধের ময়দানে রয়েছে একথা ভুলে গেল। সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ আলী, তোমার কি হয়েছে। আমাকে এমন মুঠোর মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিলে যে?

হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ ময়দানে তোমাদের সাথে যে যুদ্ধ চলছিল, সেটা চলছিল ইসলামের সাথে। কিন্তু যে মুহূর্তে তুমি আমার মুখে থুথু দিলে, তখন তোমার ওপর আমার প্রচন্ড আক্রোশ সৃষ্টি হলো। সেটা ছিল আমার

ব্যক্তিগত আক্রোশ। এই আক্রোশের বশে তোমাকে হত্যা করলে গুনাহ্ হবে। তাই ক্রোধ সম্বরণ করলাম।

সৈনিকটি তৎক্ষণাত বললো ঃ "যে ধর্ম তোমাকে এমন কঠিন মুহূর্তেও আত্মসংযম শিক্ষা দেয়, তাতে আমাকেও দীক্ষিত কর।" এই বলে সে ইসলাম গ্রহণ করলো।

শিক্ষা ঃ ব্যক্তিগত আক্রোশের বশে কারো ওপর আক্রমণ করা জায়েজ নয়। তবে আত্মরক্ষার জন্য সর্বাবস্থায় যুদ্ধ করা কর্তব্য।

৪২। মুমিনের আত্মসমালোচনা

এক ব্যক্তি উয়াইস কারনীর (একমাত্র মুমিন, যিনি রাসূল (সাঃ) এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেও রাসূল (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পাননি) সাথে সাক্ষাত করে বললোঃ "কেমন আছেন, হে উয়াইস?"

উয়াইস ঃ আলহামদুলিল্লাহ্, ভালো আছি।

আগন্তুক ঃ আজকাল কিভাবে আপনার সময় কাটে?

উয়াইস ঃ সে কথা শুনতে না চাওয়াই উত্তম। আজকাল দুনিয়ায় কোন মুমিনের সুখে শান্তিতে জীবন যাপনের সুযোগ সংকুচিত হয়ে এসেছে। কুরআনের জ্ঞান অর্জন করলে সম্পদশালী হওয়া যায় না। এমনকি সততার সাথে জীবন যাপন করলে দুনিয়ায় বন্ধুও মেলে না।

আগন্তুক ঃ রাসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে শুনেছেন এমন একটি হাদীস আমাকে শোনান।

উয়াইস ঃ আমি রাসূল (সাঃ) এর সাক্ষাত পাইনি যে তোমাকে তাঁর হাদীস শোনাবো। তবে অন্যের মাধ্যমে পাওয়া রাসূল (সাঃ) এর একটি উপদেশ আমি তোমাকে জানাচ্ছি। তিনি বলেছেনঃ "তোমরা আল্লাহর দরবারে গিয়ে হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হবার আগে নিজেদের হিসাব নিজেই গ্রহণ কর। আল্লাহ্ দুনিয়াটাকে তোমাদের জন্য একটা পুল স্বরূপ বানিয়েছেন। কাজেই তোমরা এই পুল পার হবার চেষ্টা কর।"

শিক্ষাঃ আত্মসমালোচনা করা মুমিনের একটি অপরিহার্য গুণ। অন্যের সমালোচনার পাশাপাশি নিজের সমালোচনাও সব সময় অব্যাহত রাখা উচিত। রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের কাজের হিসাব নেয়ার আগে নিজেরাই নিজেদের কাজের সমালোচনা কর।"

৪৩। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের অগ্নিপরীক্ষায় মুমিনের দৃঢ়তা

[ক] হযরত আবু আবদুল্লাহ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের কিছু জোয়ানকে কুরাইশদের একটি

দলের মোকাবিলার জন্য পাঠালেন। আমাদের সেনাপতি ছিলেন আবু উবাইদা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের রসদ হিসাবে এক ব্যাগ খোরমার অতিরিক্ত কিছুই দিতে পারলেন না। ক্ষুধা লাগলে আবু উবাইদা আমাদের প্রত্যেককে একটা করে খোরমা দিতেন। শিশুরা যেমন চুষে চুষে অনেকক্ষণ ধরে খায়, আমরাও তেমনিভাবে খেতাম এবং খাওয়ার শেষে অনেক করে পানি খেয়ে নিতাম। এতেই আমাদের পুরো একদিন চলে যেত। কখনো কখনো আমরা উটের খাদ্য 'খাবাত' নামক গাছের পাতা লাঠি দিয়ে পেড়ে পানি দিয়ে ভিজিয়ে খেয়ে নিতাম। এভাবে চলতে চলতে আমরা সমুদ্রের কিনারে গিয়ে উপনীত হলাম। সমুদ্রতীরে আমাদের সামনে পড়লো একটা বিরাট আকারের বস্তু। দূর থেকে মনে হলো বালুর স্তূপ। কাছে গিয়ে দেখি আম্মার নামক এক প্রকান্ড সামুদ্রিক জন্তু। আবু উবায়দা প্রথমে বললেনঃ এটা মৃত। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বললেনঃ আমরা এখন আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহর পথে জেহাদরত। এখন আমরা অনন্যোপায়। কাজেই, চল ওটাকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাক। অতঃপর আমরা ৩০০ জন মোজাহেদ ঐ জন্তুটার ওপর নির্ভর করে এক মাস কাটালাম। ওর গোশত খেয়ে আমরা বেশ মোটা সোটা হয়ে গেলাম। শুধু তাই নয়, ওর চোখের কোটর থেকে আমরা কলসি কলসি চর্বিও সংগ্রহ করলাম এবং এত বড় এক এক টুকরো গোশ্‌ত কেটে আলাদা করলাম যে, যার প্রত্যেকটা এক একটা ষাড়ের মত দেখতে। আবু উবাইদা আমাদের মধ্য থেকে ১৩ ব্যক্তিকে ওর চোখের কোটরের ওপর বসিয়ে দিলেন এবং তার বিভিন্ন অংগ বিচ্ছিন্ন করে আমাদের সবচেয়ে বড় উটটার ওপর চড়িয়ে দিলেন। এই বোঝা বহন করে উটটি রওনা দিল। আমরাও অনেক গোশত কেটে নিয়ে চললাম। মদীনায় যখন রাসূল (সাঃ) কে পুরো ঘটনা জানালাম, তখন তিনি বললেনঃ "ওটা তোমাদের খাদ্য হিসাবে আল্লাহ্ সরবরাহ করেছিলেন। ওর কিছু গোশ্‌ত কি তোমাদের সাথে আছে, যা আমাদেরকেও খেতে দিতে পার?" তখন আমরা তার কিছু গোশত রাসূল (সাঃ) এর নিকট পাঠালাম এবং তিনি তা খেলেন। (মুসলিম)

[খ] হযরত জাবের বর্ণনা করেন যে, খন্দক যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে আমরা যখন মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করছিলাম, তখন এক পর্যায়ে এমন শক্ত মাটি পাওয়া গেল যার ভেতর কোদাল বসতেই চায় না। সবাই এসে রাসূল (সাঃ) কে ব্যাপারটা জানালে তিনি বললেনঃ আমি আসছি। অতঃপর তিনি রওনা হলেন। অথচ তখনও রাসূল (সাঃ) এর পেটে পাথর বাঁধা ছিল। তিনিসহ আমরা তিন দিন যাবত কোন খাবার মুখে তুলিনি।

রাসূল (সাঃ) কোদাল দিয়ে কোপ দিতেই তা নরম মাটিতে পরিণত হয়ে গেল। আমি বললামঃ হে রাসূল! আমাকে একটু বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দিন।" বাড়ী গিয়ে আমি আমার স্ত্রীকে বললামঃ রাসূল (সাঃ) কে এমন অবস্থায় দেখেছি, যা সহ্য করার মত নয় (পেটে পাথর বাঁধা)। তোমার কাছে খাবার কিছু আছে কি? সে বললঃ আমার কাছে কিছু যব ও ছোট একটা ভেড়ার বাচ্চা আছে। আমি ভেড়ার বাচ্চাটা যবাই করলাম আর আমার স্ত্রী যব পিষতে শুরু করল। যখন গোশত ডেগচিতে করে চুলোর ওপর চড়ানোর পর প্রায় সিদ্ধ হয়ে এসেছে এবং যব অনেকখানি পিষ্ট হয়ে গেছে, তখন আমি গিয়ে বললামঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে অল্প কিছু খাবার প্রস্তুত আছে। আপনি এবং একজন বা দু'জন চলুন।" তিনি বললেনঃ "খাবারে পরিমাণ কতটুকু?" আমি সঠিক পরিমাণ জানালাম। তিনি বললেনঃ "যথেষ্ট পবিত্র খাবার। তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল, আমি না আসা পর্যন্ত যেন চুলোর ওপর থেকে রুটি ও গোশত না নামায়।" অতঃপর বললেনঃ "তোমরা সবাই চল।" মোহাজেরগণ ও আনসারগণ সবাই চললো। আমি আমার স্ত্রীর কাছে আগে ভাগে গিয়ে পৌঁছলাম। আমি বললামঃ তোমার ওপর আল্লাহ সদয় হোন! রাসূল (সাঃ) সকল আনসার ও মোহাজেরগণ নিয়ে সদলবলে এসে গেছেন। সে বললোঃ খাবার, পরিমাণ কেমন তা কি তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন? আমি বললাম, হ্যাঁ।

যা হোক, রাসূল (সাঃ) সমবেত আনসার ও মোহাজেরগণকে বললেনঃ "তোমরা ভিড় করো না। একে একে প্রবেশ কর।" অতঃপর রাসূল (সাঃ) এক এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে নিতে লাগলেন, তার সাথে গোশত যুক্ত করে চুলো ও ডেকচি ঢেকে দিয়ে সাহাবীগণকে দিতে লাগলেন। এভাবে দিতে দিতে সবাই পেট পুরে খেল এবং আরো অবশিষ্ট রইল। অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূল (সাঃ) গোশত ও রুটিতে সামান্য থুথু ছিটিয়ে দিলেন। এক হাজার সাহাবী পেট পুরে খেলেন এবং তারপরও ডেকটি থেকে এমন আওয়ায আসছিল যে, তাতে তখনো অনেক গোশত রয়েছে বলে মনে হচ্ছিল। অতঃপর রাসূল (সাঃ) হযরত জাবেরের স্ত্রীকে বললেনঃ তোমরা খাও এবং অন্যদেরকে খাওয়াও। কারণ বহু লোক ক্ষুধার্ত রয়েছে। (বোখারী ও মুসলিম)

শিক্ষা ঃ এই দুটি ঘটনা থেকে শিক্ষা পাওয়া গেল যে, ইসলামের জন্য যারা সংগ্রাম করে তাদেরকে কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়; বিশেষতঃ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের পরীক্ষা অনিবার্য। এ পরীক্ষায় ধৈর্যের পরিচয় দিলে আল্লাহর সাহায্যও আসবে ইনশায়াল্লাহ। আল্লাহ বলেছেনঃ আমি তোমদেরকে ভীতি, ক্ষুধা, জান-মাল ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে অবশ্য

অবশ্যই পরীক্ষা করবো। যারা এতে ধৈর্যধারণ করবে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও।"

৪৪। কুফরীর আস্তাকুঁড়ে ঈমানের রক্ত গোলাপ

বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত আবু জাহলের ছেলে ইকরামা কুফরীর ওপরই বহাল ছিলেন। বদরের ময়দানে তার পিতা শোচনীয়ভাবে নিহত হওয়ার পর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি কম চেষ্টা করেননি। ওহুদে খন্দকে-যেখানেই পেয়েছেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়েছেন। কিন্তু কোথাও সাফল্য আসেনি। শেষ পর্যন্ত মক্কা বিজয়ের দিন যখন সমগ্র কুরাইশ বংশ আত্মসমর্পণ করলো, সেদিনও তিনি প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু বীর কেশরী খালিদ বিন ওলীদ এতদিন ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বের হাল ধরেছেন। তিনি ইকরামার প্রতিরোধ চূর্ণ করে দেন এবং ইকরামা ইয়ামানে পালিয়ে যান।

ইকরামার স্ত্রী উম্মে হাকীম রাসূল (সাঃ) এর দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং ইকরামার জন্য নিরাপত্তা চেয়ে নিয়ে ইয়ামান অভিমুখে রওনা হলেন। ইকরামাকে সাথে নিয়ে তিনি যখন রাসূল (সাঃ) এর দরবারে ফিরে এলেন, তখন রাসূল (সাঃ) তার দিকে এগিয়ে গেলেন। ইকরামা বললেনঃ হে মুহাম্মদ! উম্মে হাকীম আমাকে বলেছে যে, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ "সে ঠিকই বলেছে। তুমি নিরাপদ।"

ইকরামা আমি তোমাকে দাওয়াত দিচ্ছি, "তুমি সাক্ষ্য দাও আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং আমি মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর তুমি নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে।"

ইকরামা হাত বাড়িয়ে দিয়ে উচ্চারণ করলেন- আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। অতঃপর ইকরামা বললেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি আমার অতীতের সকল গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূল (সাঃ) তৎক্ষণাত হাত তুলে দোয়া করলো ও তার জন্য ক্ষমা চাইলেন।

ইকরামা বললেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর শপথ করে আমি ওয়াদা করছি যে, আমি আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য ইতিপূর্বে যত অর্থ ব্যয় ও যত যুদ্ধ করেছি; এখন থেকে আল্লাহর দ্বীনের বিজয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রচার প্রসারের জন্য আমি তার চেয়ে দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় ও দ্বিগুণ যুদ্ধ করবো।"

ইতিহাস সাক্ষী যে, ইকরামা তার এ অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তিনি এই দিন থেকে ইসলামের সর্বাধিক সেবায় আত্মনিয়োগ

করলেন। তিনি হলেন একধারে ময়দানের যোদ্ধা, রাত জেগে আল্লাহর ইবাদাতকারী, কুরআন পাঠকারী এবং ক্রন্দনকারী।

রাসূল (সাঃ) এর ইন্তিকালের পর মুসলমানরা যতগুলো যুদ্ধ করেছে ইকরামা তার প্রত্যেকটিতে অংশ নেন এবং অভিযানের নেতৃত্ব দেন।

শেষ পর্যন্ত ইয়ারমুকের যুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতের পূর্বে তিনি এমন উঁচু মানের এবং ত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখে যান, যা শুধু ইসলামের ইতিহাসে নয় বরং সমগ্র মানব ইতিহাসে নজীরবিহীন।

যুদ্ধের শেষে ইয়ারমুকের ময়দানে যে কয়জন সৈনিকের ক্ষতবিক্ষত দেহ মুমূর্ষাবস্থায় পড়ে কাতরাচ্ছিল, তার মধ্যে ইকরামা ছিলেন অন্যতম। তা ছাড়া হারিছ বিন হিশাম এবং আইয়াশ ইবনে আবী রবীয়াও ছিলেন পিপাসায় কাতর। ইকরামা যখন পানি চাইলেন, পানি আনা হলো। তখন পাশ থেকে হারিছ পানি চাইলে আকরামা পানি স্পর্শ না করে তাকে দিতে বললেন। হারিছকে দিতে গেলে আইয়াশ পানি চাইল। হারিছ নিজে আইয়াশকে দেখিয়ে দিলেন। আইয়াশের কাছে নিয়ে গেলে দেখা গেল তিনি ইন্তিকাল করেছেন। অতঃপর পানি আবার হারিছের কাছে আনা হলে দেখা গেল, তিনিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। অতঃপর ইকরামার কাছে গিয়ে দেখা গেল, তিনিও দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন।

তাই আবু জাহেলের ছেলে ইকরামাকে বলা যায় কুফরীর আস্তাকুঁড়ে ঈমানের একটি রক্ত গোলাপ।

শিক্ষাঃ পিতা ও বংশের পরিচয় ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন। কোন ব্যক্তির নিজস্ব ঈমান ও আমলই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের সাথে বিবেচনার দাবী রাখে। আবু জাহলের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও ইকরামা নিজের ঈমান ও আমলের বলে মুসলমানদের সেনাপতি পর্যন্ত হয়েছিলো। আল্লাহর কাছেও সাহাবীর মর্যাদা পেয়েছিলেন।

৪৫। ভিক্ষাবৃত্তি একটি কলংক

একবার আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে খাবার চাইল। রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাড়ীতে কি কিছুই নেই? সে বললো একটা কম্বল আছে যার একাংশ পরিধান করি এবং আর একাংশ বিছিয়ে শুই। আর একটা পেয়ালা যা দিয়ে পানি খাই। রাসূল (সাঃ) বললেনঃ যাও, ঐ দুটি জিনিস আমার কাছে নিয়ে এস। লোকটি তৎক্ষণাত গিয়ে জিনিস দুটি নিয়ে এল।

রাসূল (সাঃ) জিনিস দুটি তার কাছ থেকে নিয়ে নিলেন এবং সমবেত সাহাবীগণকে বললেনঃ এই জিনিষ দুটি তোমরা কেউ কিনবে নাকি? একজন সাহাবী বললেনঃ আমি এক দিরহামে নিতে পারি। অপর একজন বললেনঃ আমি দুই দিরহামে নিতে পারি। রাসূল (সাঃ) শেষোক্ত ব্যক্তিকে পেয়ালা ও কম্বলটি দিলেন এবং তার কাছ থেকে দুই দিরহাম নিয়ে আনসারকে দিলেন। তাকে বললেনঃ এক দিরহাম দিয়ে খাবার কিনে তোমার পরিবারকে দাও। আর এক দিরহাম দিয়ে একখানা কুঠার কিনে আমার কাছে এস। লোকটি কুঠার কিনে নিয়ে এলে রাসূল (সাঃ) তাতে আছাড় লাগিয়ে দিয়ে বললেনঃ "যাও এ দিয়ে কাঠ কাটগে। ১৫ দিনের মধ্যে তোমাকে যেন আমি না দেখি।" সে নির্দেশ মোতাবেক কাজ করলো। একদিন এসে জানালো যে, দশ দিরহাম মুনাফা পেয়েছে। এর কিছু দিয়ে সে খাবার এবং কিছু দিয়ে কাপড় কিনলো।

রাসূল (সাঃ) তাকে বললেনঃ ভিক্ষার কলংক মুখে নিয়ে কেয়ামতের ময়দানে হাজির হওয়ার চাইতে তোমার এই কাজ অনেক ভাল।

শিক্ষাঃ কাজ করে অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা রাখে এমন সবল ও সুস্থ লোককে ভিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। এ ধরনের লোকের ভিক্ষা চাওয়াও মস্ত বড় গুনাহ।

৪৬। পরোপকারী মানুষই শ্রেষ্ঠ মানুষ

একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) মসজিদে নববীতে ইতিকাফরত ছিলেন। এই সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে সালাম করলো ও তাঁর কাছে বসে পড়লো। হযরত ইবনে আব্বাস তাঁকে বললেনঃ "তোমার কী হয়েছে? তোমাকে তো খুবই চিন্তিত মনে হচ্ছে!"

আগন্তক জবাব দিলঃ "অমুকের কাছে ঋণগ্রস্ত আছি। অথচ তা পরিশোধ করতে পারছি না।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেনঃ আমি কি তোমার সম্পর্কে ঐ ব্যক্তির সাথে কিছু আলোচনা করবো? (অর্থাৎ ঋণ পরিশাধে কিছু সময় বাড়িয়ে দেয়া বা অন্য কোন সম্ভাব্য রেয়াত পাওয়ার জন্য।)

আগন্তক বললোঃ " যদি ভালো মনে করেন করতে পারেন।"

হযরত ইবনে আব্বাস তৎক্ষণাত জুতো পরলেন ও মসজিদ থেকে বের হলেন। আগন্তক বললোঃ এ কী? আপনি করছেন কী? ইতিকাফের কথা কি ভুলে গেছেন?

ইবনে আব্বাস রাসূল (সাঃ) এর কবর দেখিয়ে অশ্রু সজল চোখে বললেনঃ "না সেটা ভুলিনি। তবে এই কবরে যিনি শুয়ে আছেন তাঁকে আমি বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের উপকারের জন্য সচেষ্ট হবে এবং উপকার সাধন করবে, সে দশ বছর ধরে ইতকাফ্‌কারীর চেয়েও মর্যাদাবান হবে। অথচ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি একদিন ইতিকাফ করে তার মধ্যে ও দোজখের মধ্যে আল্লাহ্‌ এমন তিনটি পরীক্ষা স্থাপন করেন, যার একটি থেকে অপরটির দূরত্ব সূর্যের উদয় ও অস্তের জায়গার মধ্যে দূরত্বের চেয়েও বেশী।

শিক্ষা ঃ বান্দার হক তথা মানবাধীকার সম্পর্কে সচেতন থাকলেই পরোপকারী হওয়া সম্ভব। রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ "কোন ব্যক্তি যতক্ষণ বান্দার সাহায্যে নিয়োজিত থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ্‌ তার সাহায্যে নিয়োজিত থাকেন।"

৪৭। মোনাফেকীর পরিণাম

রাসূল (সাঃ)-এর নিকট একবার এই মর্মে খবর এলো যে, রাসূল মুসতালিক গোত্রের সরদার হারেস ইবনে যেরার মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। হারেস ইবনে যেরার রাসূল (সাঃ)-এর অন্যতমা স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত হয়াইবিয়ার পিতা। তারা উভয়েই পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেন।

খবর পাওয়া মাত্র রাসূল (সাঃ) একদল মুজাহিদকে সাথে নিয়ে তাদের প্রতিরোধের জন্য অগ্রসর হলেন। যারা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য রাসূল (সাঃ)-এর সঙ্গী হলো, তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মোনাফেকও ছিল। এসব মোনাফেকের উদ্দেশ্য ছিল কাফেররা পরাজিত হলে তাদের ফেলে যাওয়া সম্পদ হস্তগত করা আর মোনাফেক হওয়া সত্ত্বেও তাদের ধারণা ছিল যে, মুসলমানেরা যেহেতু অধিকাংশ যুদ্ধে জয়লাভ করেছে, তাই এ যুদ্ধেও জয়লাভ করবে।

কার্যতঃ হলোও তাই। মুসলমানরা জয়লাভ করলেন এবং প্রতিপক্ষ ইহুদী গোত্র পরাজিত হলো। যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর মুসলমানদের শিবিরে একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। একজন মুহাজির (অর্থাৎ মক্কা থেকে আগত মুসলমান) এবং একজন আনসার (অর্থাৎ মদিনাবাসী মুসলমান)-এর মধ্যে কুপ থেকে পানি তোলা নিয়ে কথা কাটাকাটি ও ঝগড়ার সূত্রপাত হলো। অতঃপর তা হাতাহাতির পর্যায়ে গড়ালো। মোহাজির হাঁক দিলেনঃ "ওহে মোহাজিররা, কে কোথায় আছ আমাকে বাঁচাও।" আর আনসারও অনুরূপ আনসারদের ডাক

দিলেন। ফলে উভয়পক্ষে উত্তেজনা ও সাজ সাজ রব পড়ে গেল। এভাবে মুসলমানদের মধ্যে একটা মারামারি বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলো।

এই ঝগড়ার খবর পাওয়া মাত্রই রাসূল (সাঃ) কাল বিলম্ব না করে ঘটনাস্থলে ছুটে গেলেন। তিনি আনসার ও মোহাজের উভয়কে বুঝালেন যে, তোমরা এভাবে নিজ নিজ অঞ্চলের লোকদেরকে ডাকছো কেন? এতো জাহেলিয়াতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ এক নোংরা পন্থা। তোমরা এটা পরিত্যাগ করো। কেউ কারো ওপর জুলুম করলে সকল মুসলমানের উচিত মযলুমের সাহায্যে ছুটে যাওয়া এবং যালেমকে নিরস্ত করা- তা সে যেখানকার লোকই হোক না কেন। দেখতে হবে কে যালেম এবং কে মযলুম, কে আনসার কে মোহাজের বা কে কোথাকার বাসিন্দা ও কে কোন বর্ণ বা বংশের লোক তা নয়।

রাসূল (সাঃ)-এর এ ভাষণ শুনে সবাই শান্ত হয়ে যে যার কাজে চলে গেল। সাহাবী উবাদা ইবনে সামেত ঝগড়ায় লিপ্ত দুই সাহাবীর মধ্যে আপোস করিয়ে দিলেন এবং যার বাড়াবাড়ি প্রমাণিত হলো, তাকে দিয়ে মাফ চাইয়ে নিলেন। কিন্তু মুনাফিকরা এই ঝগড়ার সুযোগটাকে নিজেরদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজে লাগাতে চাইল। তারা এই আপোস-মীমাংসা মেনে নিল না। মোনাফেকদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ বিন উবাই। সে মোনাফেকদের একটা গোপন সভা ডেকে সেখানে মদিনাবাসীদেরকে মক্কাবাসী মোহাজেরদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বললোঃ তোমরাই তো ওদেরকে আস্কারা দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছ। তোমরাই খাল কেটে কুমীর এনেছ এবং দুধ-কলা দিয়ে এই সাপদের পুষেছ। এখন ওদের এতো স্পর্ধা হয়েছে যে, তোমাদেরকেই ওরা দংশন করতে চাইছে। এখনও যদি তোমরা সাবধান না হও এবং ওদেরকে লালনপালন থেকে বিরত না হও। তাহলে একদিন ওরাই তোমাদের ধ্বংস করবে। তোমরা মদীনার সম্ভ্রান্ত লোক। আর ওরা হলো বহিরাগত নীচুজাত। মদীনায় গিয়ে তোমাদের উচিত হবে ঐ নীচুজাতদেরকে বিতাড়িত করা। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এভাবে আনসার ও মোহাজেরদের ঐক্য ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো।

এই গোপন সভায় ঘটনাক্রমে হযরত যায়েদ বিন আরকাম উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার উক্ত ভাষণ শেষ হওয়া মাত্রই চিৎকার করে বলে উঠলেনঃ "আল্লাহর কছম, তুইই নীচুজাত। রাসূল (সাঃ) ও তাঁর মুমিন সাহাবীগণ ঈমানের বলে বলীয়ান ও পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি ও ভালোবাসা পোষণ করেন। সুতরাং তারাই প্রকৃত সম্ভ্রান্ত লোক।"

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ভেবেছিল, পরিস্থিতি প্রতিকূল হলে সে কথার ভিন্ন ব্যাখ্যা দেবে ও সুর পাল্টে ফেলবে। এ জন্য সে কারো নাম উল্লেখ করেনি এবং কিছুটা অস্পষ্ট ভাষায় কথা বলেছে। যায়েদ ইবনে আরকামের ক্ষেপে যাওয়া দেখে সে বিপদ গুনলো। পাছে তার কুফরী প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই সে যায়েদের কাছে গিয়ে বুঝাতে লাগলো যে, আমি তা ঠাট্টাচ্ছলেই কথাগুলো বলেছিলাম। তুমি ভুল বুঝেছ।

যায়েদ সেখান থেকে উঠে সরাসরি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে গিয়ে পুরো ঘটনা খুলে বললেন। রাসূল (সাঃ) ঘটনাটাকে গুরুতর মনে করলেও নিশ্চিত হবার জন্য বললেনঃ তুমি ভুল বলছো না তো? যায়েদ বললেনঃ আল্লাহর কছম, আমি নিজ কানে শুনেছি। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর কথাবার্তা সমগ্র মুসলিম বাহিনীর গোচরে চলে গেল। সবাই এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

এক পর্যায়ে হযরত ওমর রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে বললেনঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, মোনাফেকটার গর্দান কেটে ফেলি। রাসূল (সাঃ) বললেনঃ ওমর, লোকে যখন বলবে যে, মুহাম্মদ তাঁর সংগী সাথীদেরকেও হত্যা করে, তখন কী হবে?" অতঃপর তিনি হত্যা করতে নিষেধ করলেন।

হযরত ওমরের কথাটা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর পুত্রও জেনে ফেললেন। তার নামও ছিল আবদুল্লাহ এবং তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ মুমিন। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে বললেনঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার পিতার এসব কথাবার্তার কারণে তাকে যদি আপনি হত্যা করতে চান, তবে আমাকেই আদেশ করুন, অন্য কাউকে নয়। আমি নিজ হাতে তার মস্তক কেটে আপনার কাছে এনে দেব। ইয়া রাসূলুল্লাহ, সমস্ত খাজরাজ গোত্র জানে আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে পিতৃভক্ত। কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে কোন কথা আমি সহ্য করতে পারি না। আমার আশংকা হয় যে, আপনার আদেশে অন্য কেউ আমার পিতাকে হত্যা করলে আমি আমার পিতার হত্যাকারীকে দেখে আত্মসম্বরণ করতে পারবো না। ফলে তাকে হত্যা করে আমি আযাব ভোগ করবো।" রাসূল (সাঃ) বললেনঃ তোমার পিতাকে হত্যা করার আমার কোন ইচ্ছাও নেই এবং কাউকে আমি আদেশও দেইনি। এরপর এই অশান্ত পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আনয়নের জন্য রাসূল (সাঃ) প্রচলিত নিয়মের বিপরীত অসময়ে সফরের আদেশ দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম রওনা হয়ে গেলে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা

করলেনঃ তুমি কি এসব কথা বলেছ? সে অনেক কছম খেয়ে বললো যে, সে এসব কথা বলেনি। অতঃপর সাধারণ সাহাবায়ে কেরাম মনে করলেন, সম্ভবতঃ অল্প বয়স্ক যায়েদ ভুল বুঝেছে। আসলে ইবনে উবাই অমন কথা বলেনি।

এদিকে যায়েদ পড়ে গেলেন মহা ফাঁপরে। সবাই তাকে মিথ্যুক ভাবছে মনে করে তিনি গা ঢাকা দিয়ে থাকতে লাগলেন। কিন্তু মনে মনে আশান্বিত ছিলেন যে, এ ঘটনার মুখোশ উন্মোচন করে অচিরেই আয়াত নাযিল হবে। বাস্তবিকই এই সফরের মধ্যে সূরা মুনাফিকুন নাযিল হয়ে যায়েদের সত্যতা প্রমাণিত করে দিলো। রাসূল (সাঃ) যায়েদকে ডেকে বললেনঃ "হে বালক, আল্লাহ তোমাকে সত্যবাদী সাব্যস্ত করেছেন এবং ইবনে উবাই সম্পর্কে পুরো সূরা মুনাফিকুনটাই নাযিল করেছেন।"

ইবনে উবাই যখন মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছালো, তখন তাঁর মুমিন পুত্র আবদুল্লাহ তার উটের হাটুতে পা রেখে পিতাকে বললেনঃ "আল্লাহর কছম, 'সম্ভ্রান্ত লোকেরা নীচু জাতের লোকদেরকে বহিষ্কার করবে' এই কথার ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। কে সম্ভ্রান্ত, তুমি না আল্লাহর রাসূল?"

পুত্র কর্তৃক পিতা অবরুদ্ধ এ খবর পেয়ে রাসূল (সাঃ) ছুটে এলেন এবং পুত্রকে বললেনঃ তার পথ ছেড়ে দাও, তাকে মদীনায় ঢুকতে দাও।" অতঃপর সে মদীনায় প্রবেশ করলো।

শিক্ষা ঃ মোনাফেকরা ইসলামের মারাত্মক দুশমন হলেও তাদের প্রতি মহানুভবতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা কর্তব্য। তবে তাদের গতিবিধির ওপর কড়া দৃষ্টি রাখা চাই।

৪৮। রাখাল ছেলের খোদাভীতি

একবার হযরত ওমর গভীর রাতে ছদ্মবেশে মদীনার পথ ধরে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন এবং প্রজাদের খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। এই সময়ে দেখতে পেলেন এক রাখাল একপাল ছাগল নিয়ে তার সামনে দিয়ে যাচ্ছে। তিনি রাখালকে পরীক্ষা করার মানসে বললেনঃ "এই ছাগলগুলোর মধ্য থেকে যে কোন একটা আমার কাছে বিক্রি করে দাও।"

রাখাল বললোঃ "এ ছাগলগুলো আমার নয়। আমার মনিবের। আমি তার ক্রীতদাস।"

ওমর বললেনঃ "আমরা যে জায়গায় আছি, এখানে তোমার মনিব আমাদেরকে দেখতে পাবে না। একটা ছাগল বেঁচে দাও। আর মনিবকে বলে দিও যে, একটা ছাগল বাঘে খেয়ে ফেলেছে।"

রাখাল রাগান্বিত হয়ে চিৎকার করে বলে উঠলোঃ "আল্লাহ কি দেখতে পাচ্ছেন না?"

ওমর চুপ করে রইলেন। রাখাল তার দিকে রাগত চোখে তাকিয়ে গরগর করতে করতে ছাগল হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেল।

পরদিন সকালে ওমর ঐ রাখালের মনিবের কাছে গেলেন এবং তাকে মনিবের কাছ থেকে কিনে নিয়ে স্বাধীন করে দিলেন। অতঃপর বললেনঃ "ওহে যুবক, কালকে তুমি আল্লাহর সম্পর্কে যে কথাটা বলেছিলে, তা আজ তোমার দুনিয়ার গোলামী ঘুচিয়ে দিল। আমি আশা করি তোমার এই খোদভীতি তোমাকে কেয়ামতের দিন দোজখের আযাব থেকেও মুক্তি দেবে।"

শিক্ষা ঃ তাকওয়া ও সততা যত তুচ্ছ ও নগন্য মানুষের মধ্যেই পাওয়া যাক, তাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সৎ ও খোদাভীরু।

৪৯। প্রিয় বস্তুকে আল্লাহর পথে দান করা

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, সূরা আল-ইমরানের "তোমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা, যতক্ষণ তোমরা যা ভালোবাস তা দান না কর" এই আয়াত নাযিল হলে সাহাবীগণের মধ্যে এই মর্মে চিন্তাভাবনা ও প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় যে, তার সম্পত্তির মধ্যে কোন জিনিসটি বেশী প্রিয় এবং তা কত দ্রুত রাসূলের (সাঃ) কাছে গিয়ে দান করা যায়।

মদীনার আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ছিলেন আবু তালহা (রাঃ)। মসজিদে নববীর বিপরীত দিকে তার একটি বাগানে "বীরহা" নামে একটি কুয়া ছিল। ক্রমে ঐ কুয়ার নামানুসারে তার বাগানটিও "বীরহা" নামে পরিচিত হয়। রাসূল (সাঃ) মাঝে মাঝে এই বাগানে আসতেন এবং এই কুয়ার পানি খেতেন। এই কুয়ার পানি তাঁর কাছে খুবই প্রিয় ছিল। আবু তালহারও এই কূপসহ বাগাটি অত্যন্ত মূল্যবান, উর্বর ও সর্বাপেক্ষা প্রিয় সম্পত্তি ছিল। উক্ত আয়াত নাযিল হবার পর তিনি রাসূল (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন যে, "আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তির মধ্যে বীরহা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তাই এটি আমি আল্লাহর পথে ব্যয় করতে চাই। আপনি যে কাজে ভালো মনে করেন এটি ব্যয় করুন।"

রাসূল (সাঃ) বললেনঃ "এত বড় বাগান, আমার মতে তুমি নিজের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দিলেই ভালো হবে।" হযরত আবু তালহা এই উপদেশ অনুসারে বাগানটি স্বীয় আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

ওদিকে হযরত যায়েদ বিন হারিসা তার আরোহনের প্রিয় ঘোড়াটি নিয়ে রাসূল (সাঃ) এর কাছে হাজির হলেন এবং তা আল্লাহর পথে দান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। রাসূল (সাঃ) ঘোড়াটি তার কাছে থেকে নিয়ে তারই ছেলে উসমানকে দান করলেন। হযরত যায়েদকে এতে কিছুটা দ্বিধান্বিত দেখে তাকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে, তোমার দান গৃহীত হয়েছে।

শিক্ষাঃ এ ঘটনা দুটি থেকে জানা গেল যে আল্লাহর পথে দান করার অর্থ শুধু ফকীর মিসকীনকে এবং ইসলামের পথে জেহাদরত ব্যক্তি বা সংস্থাকে দান করা নয়, বরং পরিবার-পরিজন ও দরিদ্র আত্মীয় স্বজনকে দান করাও আল্লাহর পথে দানের শামিল এবং বিরাট সওয়াবের কাজ।

৫০। একটি নাকের মূল্য

সিরিয়া থেকে পরাজিত ও বিতাড়িত রোমক সৈন্যরা তাদের তৎকালীন শক্ত ঘাঁটি মিশরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়ে অবস্থান নেয়। মুসলমানদের অগ্রাভিযান রুখে দেয়ার জন্য তারা এখানে তাদের সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করে। কিন্তু অদম্য সাহসী মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনুল আ'স এখানেও তাদের সম্মিলিত শক্তি গুড়িয়ে দেন এবং অধিকৃত শহরের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তিনি সেখানকার খৃস্টান প্রজাদেরকে তাদের যাবতীয় ধর্মীয় কর্মকান্ডে পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করেন।

একদিন সকালে শহরের খৃস্টান অধ্যুষিত আবাসিক এলাকায় হৈ চৈ পড়ে যায়। উত্তেজিত জনতা শহরের কেন্দ্রীয় এলাকায় সমবেত হতে থাকে এবং এক বিশাল জনসভার আয়োজন করে। সভায় আগুন ঝরানো বক্তৃতা চলতে থাকে। সভাশেষে স্থানীয় পাদ্রীর নেতৃত্বে একটি খৃস্টান প্রতিনিধি দল সেনাপতি আমর ইবনুল আসের সাথে দেখা করতে আসে। আমর প্রতিনিধিদলকে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানান।

পাদ্রী খৃস্টান জনতার উত্তেজিত হওয়ার কারণ আমর ইবনুল আ'সকে অবহিত করলেন। বাজারের কেন্দ্রীয় স্থানে হযরত ঈসার (আ) মর্মর পাথরের তৈরী একটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। খৃস্টানরা পরম ভক্তি সহকারে তাঁর পূজা করতো। গভীর রাতে কে যেন ঐ মূর্তির নাক ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। খৃস্টানরা স্বাভাবিকভাবেই এজন্য বিজয়ী মুসলিম সম্প্রদায়ের কোন উগ্র ব্যক্তিকে দায়ী বলে সন্দেহ করেছিল। যদিও এর কোন চাক্ষুস সাক্ষী ছিল না।

আমর ধৈর্যের সাথে তাদের বক্তব্য শুনলেন এবং তিনি নিজেও তাদের সন্দেহের প্রতি নিজের ঐকমত্য প্রকাশ করলেন। তিনি পাদ্রীকে সম্বোধন করে বললেন, "ঘটনাটার জন্য আমি গভীরভাবে ব্যথিত ও লজ্জিত। ইসলাম মূর্তি পূজাকে সমর্থন না করলেও অমুসলিম সম্প্রদায় সমূহের উপাস্যদের কোনরূপ অবমাননাকে কঠোরভাবে নিষেধ করে। অনুগ্রহপূর্বক আপনারা মূর্তির মেরামতের উদ্যোগ নিন। আমি এ কাজের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবো।"

পাদ্রী বললেন, "কিন্তু এ মেরামত সম্ভব নয়। কেননা নব নির্মিত একটা নাক ওখানে যুক্ত করা যাবে না।"

আমর বললেন, "তাহলে পুরো মূর্তিটা নতুন করে নির্মাণ করুন আমি পুরো ব্যয়ভার বহন করবো।"

পাদ্রী বললেন, "কিন্তু তাতেও ক্ষতিপূরণ হবার নয়। আপনি জানেন, আমরা যিশুকে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করি। সুতরাং তার মূর্তির অবমাননার ক্ষতিপূরণ পার্থিব টাকাকড়ি দিয়ে তা হতে পারে না। এর ক্ষতিপূরণ একটি মাত্র পন্থায়ই হতে পারে। আমরা আপনাদের নবীর মূর্তি নির্মাণ করবো এবং তার নাক ভেঙ্গে দেব।"

এ কথা শুনে আমরের সমগ্র মুখমন্ডল ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করলো। তার অগ্নিক্ষরা চোখের মধ্যে রক্তবর্ণ মণিটা বারবার ঘোরাফিরা করতে লাগলো। তার ঠোঁট বন্ধ রইল এবং সমগ্র দেহ বারবার ঝাঁকি দিতে লাগলো। বারবার তাঁর হাত তরবারীর কোষের ওপর পড়তে লাগলো এবং অতি কষ্টে প্রতিবার হাত সরিয়ে নিতে লাগলেন। আমর আসন ছেড়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিলেন। অতঃপর নিজের আসনে ফিরে এলেন এবং শান্ত ও বিষাদভরা কণ্ঠে বললেন, "আপনারা সেই মহানবীর মূর্তি বানানোর প্রস্তাব দিচ্ছেন যিনি বহু বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর মূর্তি পূজার বিলোপ ঘটিয়েছেন। এরপরও আপনার পুনরায় তাঁর মূর্তি বানাতে চান এবং তাও আমাদেরই চোখের সামনে! এমন কাজটি সংঘটিত হবার আগে আমাদের সকল সহায় সম্পত্তি, আমাদের জীবন এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবন ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত। পাদ্রী সাহেব, অন্য কোন প্রস্তাব দিন। আমি আপনাদের মূর্তির নাকের বিনিময়ে আমাদের যে কোন জীবিত ব্যক্তির নাক কেটে আপনাদের কাছে পেশ করতে প্রস্তুত আছি।"

পাদ্রী সর্বশেষ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। পরদিন সকালে খৃস্টান ও মুসলামনরা মাঠে সমবেত হলো। এই উন্মুক্ত প্রান্তরে খৃস্টানরা তাদের অবমাননার প্রতিশোধ নেবে।

আমর জনতার সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার প্রেক্ষাপট সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। অতঃপর তিনি পাদ্রীকে তার সামনে ডাকলেন এবং বললেন, "আপনি খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রধান। আর আমি এখানকার মুসলমানদের প্রধান। এদেশ শাসনের দায়দায়িত্ব আমার। আমার প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে আপনাদের ধর্মের যে কোন অবমাননা ঘটুক, তার শাস্তি মাথা পেতে নিতে আমি বাধ্য। এই নিন তরবারী এবং আমার নাকটা কেটে নিন।" এ কথা বলে তিনি নিজের তরবারী পাদ্রীর হাতে সমর্পন করলেন।

পাদ্রী তরবারীটা হাতে নিলেন এবং তরবারীর ধার পরীক্ষা করতে লাগলেন। বিশাল জনতা রুদ্ধশ্বাসে নীরবে সব কিছু অবাক বিস্ময়ে দেখছিল।

সহসা নীরবতা ভঙ্গ করলো একজন মুসলিম সৈনিক। সে মঞ্চের দিকে ছুটে আসতে লাগলো এবং চিৎকার করে বলতে লাগলো, "থামুন, থামুন, পাদ্রী সাহেব থামুন। এই নিন আপনার মূর্তির নাক এবং আমিই এ ঘটনার আসামী। আমিই মূর্তির নাক ভেঙ্গে ছিলাম। শাস্তি আমারই প্রাপ্য। আমাদের সেনাপতি নিরপরাধ।"

বলতে বলতে সৈনিকটি পাদ্রীর সামনে এসে নিজের নাক এগিয়ে দিল। হতবাক জনতা আবার নীরব হয়ে সভয়ে তাকিয়ে রইল। পাদ্রী তরবারী দূরে ছুঁড়ে মারলেন, সেনাপতিকে ধন্যবাদ দিলেন এবং যে মহানবীর (সাঃ) আদর্শে এমন সৎ লোকেরা গড়ে উঠেছে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, "মূর্তিটা ভাঙ্গা ভালো কাজ হয়নি তা সত্য বটে। কিন্তু সে জন্য একজন মানুষের চেহারা বিকৃত করা হবে আরো বড় পাপের কাজ।"

শিক্ষাঃ ইসলাম যে বিজয়ী অবস্থায়ও অমুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণ করে, এ ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ভারতবর্ষে আটশত বছর এবং স্পেনে আটশত বছর ইসলামী শাসন চালু ছিল। অথচ ইসলামী শাসনের পতনের পর এই দুটি দেশে অমুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বহাল রয়েছে। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম শাসকরা অমুসলিমদের ওপর দমননীতি চালিয়ে নিজেদের শাসন পাকাপোক্ত করার কোন চেষ্টা করেনি। করলে এত দীর্ঘ কাল পরেও অমুসলিমদের অস্তিত্ব থাকতো না।

৫১। পশুপাখীর প্রতি দয়া মুমিনের কর্তব্য

একবার একটি উট রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সামনে এসে নিজস্ব ভাব ভঙ্গিতে কি যেন বললো। তিনি তখন তাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমার অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে তো ভালই, আর যদি মিথ্যে হয় তবে এর

পরিণাম তোমাকে ভোগ করতে হবে। আমার দায়িত্ব মযলুমকে আশ্রয় দেয়া। তাই তোমাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিচ্ছি। এই ঘটনার বর্ণনাকারী হযরত তামীম দারি (রাঃ) বলেন, উটের সাথে নবীজির বাক্যালাপের মর্ম কিছুই বুঝতে না পারায় আমরা এ বিষয়ে জানতে চাইলে হুজুর (সাঃ) বললেনঃ এই উটের মালিক দীর্ঘদিন এর শ্রম নিয়েছে, বিভিন্ন কাজে খাটিয়েছে। এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়ায় শ্রম দিতে পারে না- এ অভিযোগে তাকে জবাই করতে চায়। জবাই হওয়ার ভয়ে উটটি আমার নিকট পালিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে উটের মালিক সেখানে আসলো। নবীজি তাকে বললেনঃ তোমার বিরুদ্ধে এক জঘন্য নালিশ দায়ের হয়েছে। সে জানতে চাইল কে তার বিরুদ্ধে কি নালিশ করেছে। তিনি তখন বললেনঃ এই উট দীর্ঘদিন তোমার সেবা করেছে। তুমি নাকি এখন একে জবাই করে ফেলতে চাও? সে বললোঃ এটা এখন আর কোন রকম শ্রম দেয়ার উপযুক্ত নয়, কাজেই জবাই ছাড়া কি আর করা যায়। হুজুর (সাঃ) বললেনঃ জীবন-যৌ বন, শক্তি-সামর্থ দিয়ে সে এদ্দিন তোমার সেবা করেছে, আর এখন জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ায় তুমি তাকে জবাই করতে চাও। তোমার কর্তব্য তার প্রতি সদয় হওয়া। জবাই হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে তোমার নিকট করুণ আকুতি জানিয়েছে। কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত করোনি, তার আত্মার ফরিয়াদ তুমি বুঝতে পারনি। এহেন অবস্থায় তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা আমার নৈতিক দায়িত্ব। এই বলে তিনি মালিকের কাছ থেকে একশ' মুদ্রার বিনিময়ে উটটি কিনে নিলেন আর উটকে লক্ষ্য করে বললেনঃ যাও, চলে যাও, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাকে সমস্ত ভয়ভীতি ও অধীনতা হতে মুক্ত করে দিলাম। (নুজহাতুল মাজালেস)

এক হাদীসে আছেঃ একদা একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে কুয়ার পাড়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিল। ঘটনাক্রমে এক দেহপসারিনী পাপীয়সী সেখানে আসলো। কুকুরটির কাতরতা দেখে তার মনে দয়া হলো। সে তার ওড়নার আঁচল ভিজিয়ে কয়েকবার পানি তুলে নিংড়িয়ে কুকুরটিকে পান করিয়ে তার পিপাসা মিটালো। এতে খুশি হয়ে আল্লাহ তা'য়ালা মহিলাটির গত জীবনের সমস্ত ব্যভিচারের অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। (বুখারী, মুসলিম)

৫২। খোদাভীরু সাহাবীর অলৌ কিকভাবে জীবন রক্ষা

রাত গভীর হয়ে গেছে। ঘুট ঘুটে অন্ধকারে আচ্ছন্ন মক্কার অলিগলি। ঘুমন্ত নগরীর নিস্তব্ধ পরিবেশে অতি সন্তর্পনে পা রাখলেন মুরছাদ ইবনে আবি মুরছাদ। কাফেররা যে সব মুসলমানকে আটক করে রেখেছিল এবং

অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছিল, তাদের কয়েকজনকে গোপনে মদীনায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি এসেছিলেন। রাসূল (সাঃ) তাকে এই কাজে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি অতি সাবধানে যাচ্ছিলেন। সহসা সামনে একটা ছায়া দেখতে পেলেন। মুরছাদ ভয়ে জড়সড় হয়ে আসলেন। ছায়াটা আরো নিকটে এল। অতঃপর ছায়াটা থেকে পরিচিত এক নারী কণ্ঠ ভেসে এলঃ

"মুরছাদ! তুমি? আমি চিনে ফেলেছি। কেমন আছ! কিভাবে এলে?"

"কে উনাক নাকি?" প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন মুরছাদ।

"হাঁ, আমি উনাক। তোমার প্রাণপ্রিয় উনাক। একদিন যাকে ছাড়া তোমার দু'দন্ডও চলতো না। এত রাতে কোথায় যাবে তুমি? চল, আমাদের বাড়ীতে। মনে আছে না অতীতের সেই দিনগুলোর কথা?" বলতে বলতে মুরছাদের হাত ধরে টানতে লাগলে মুরছাদের জাহেলী যুগের প্রেমিকা ও বাল্য সংগিণী।

মুরছাদ এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে এমন ভঙ্গীতে দূরে সরে গেলেন যেন তার হাত কোন বিষধর সাপে পেঁচিয়ে ধরেছিল।

"কী হলো? পাগল টাগল হয়ে গেছ নাকি? এ হাত একদিন তোমার কত প্রিয় ছিল, তা কি ভুলে গেলে?" উনাক বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে বললো।

"থামো উনাক। অতীতের কথা ভুলে যাও। ওটা ছিল আমার জীবনের অন্ধকার যুগ। সে সময় আমি সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় এবং পাক নাপাকির কোন বাছবিচার করতাম না। আমি গোমরাহ্ ও বিপথগামী ছিলাম। আল্লাহ আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন। আমি মুসলমান হয়েছি। কিন্তু তুমি এখনো মোশরেক। তা ছাড়া তুমি আমার জন্য পরস্ত্রী। পরস্ত্রীর সাথে মেলামেশা ইসলামে হারাম। কাজেই আমাকে মাফ কর। তোমার বাড়ীতে আমি যাবো না।" মুরছাদ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন।

"কত বড় আমার সাধু পুরুষ গো। আমার সাথে যাবে, না চিৎকার দিয়ে সবাইকে জড় করবো?" উনাক বললো।

"মুরছাদ পবিত্র জীবন ছেড়ে অপবিত্রতার পথ আর মাড়াবে না। জাহেলী যুগের সব কিছু আমি পা দিয়ে পিষে ফেলেছি। যাও, তোমার কাজে তুমি যাও।" মুরছাদ অবিচল কণ্ঠে জবাব দিলো।

"আমার কাজে আমি চলে যাই, আর তুমি ধর্মচ্যুতদেরকে ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাও, তাই না?" ক্রুদ্ধ সর্পিনীর মত ফুঁসতে ফুঁসতে বললো উনাক। তারপর আকাশ বাতাস ফাটিয়ে চিৎকার করে "ওহে মক্কাবাসী, এই দেখ মুরছাদ এসেছে, তোমাদের বন্দীদেরকে ভাগিয়ে নিয়ে যাবে।"

আর যায় কোথায়! সদ্য ঘুমিয়ে পড়া মক্কাবাসী জেগে উঠলো এবং যেদিক থেকে আওয়ায আসছিল, সেই দিকে দলে দলে ছুটলো।

মুরছাদ ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে একটা পাহাড়ের গর্তে আত্মগোপন করলেন। কিছু লোক ঐ গর্তের দিকে ধেয়ে গেল। মুরছাদের ধরা পড়ে যাওয়া প্রায় অবধারিত ছিল। সহসা অনেক দূর থেকে এক রহস্যময় আওয়ায ভেসে এলঃ "ওদিকে নয়, এদিকে।"

এরপর মুরছাদ শুনতে পেলেন পায়ের আওয়াযগুলো ক্রমে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তার সৎ ও পরহেজগার বান্দাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে অলৌ কিকভাবে রক্ষা করলো।

শিক্ষাঃ পবিত্র কুরআনের সূরা তালাকের একটি আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ তাকে সংকট থেকে কোন না কোন উপায়ে উদ্ধার করবেন এবং তাকে অকল্পনীয়ভাবে জীবিকা সরবরাহ করবেন।' আলোচ্য ঘটনা এই আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এমন অলৌ কিকভাবে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া সবার ভাগ্যে নাও ঘটতে পারে, কিন্তু প্রতিদান আখেরাতে অবশ্যই পাওয়া যাবে এই বিশ্বাসে অবিচল থেকে তাকওয়া ও পরহেজগারী সর্বাবস্থায় বজায় রাখা কর্তব্য।

৫৩। ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের ন্যায়বিচার

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয খলীফা হবার পর সমরকন্দের এক প্রতিনিধি দল এসে অভিযোগ করলো যে, সেখানকার মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক এলাকার একটি শহর অতর্কিতে দখল করে সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে জোরপূর্বক মুসলমানদের বসতি গড়ে দিয়েছেন। হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয সমরকন্দের গভর্ণরকে প্রকৃত ঘটনা কি, তার তদন্ত করার নির্দেশ দিলেন। তিনি লিখলেন যে, একজন বিচারক দ্বারা তদন্ত চালাতে হবে। বিচারক যদি বলেন যে, সেখান থেকে মুসলমানদের বেরিয়ে যাওয়া উচিত, তাহলে তৎক্ষণাত শহর খালি করে দিতে হবে।

নির্দেশ মোতাবেক একজন মুসলিম বিচারক তদন্ত করে রায় দিলেন যে, মুসলমানদের শহর ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। কেননা প্রথমে তাদের শহরবাসীকে সতর্ক করা উচিত ছিল এবং ইসলামী সমর বিধি অনুসারে সকল চুক্তি বাতিল করা উচিত ছিল, যাতে তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে পারে। তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করা উচিত হয়নি।

সমরকন্দবাসী এ রায় শুনে নিশ্চিত হলো যে, ইসলামী সরকার ইনসাফ ও ন্যায়বিচারে অতুলনীয়। এ ধরনের লোকদের সাথে যুদ্ধ করা নিরর্থক এবং এদের শাসন আল্লাহর করুণা স্বরূপ। তাই তারা তাদের এলাকায় মুসলমানদের আবাসন সানন্দে মেনে নিল।

শিক্ষাঃ সুবিচার ও ন্যায় নীতিতে অবিচল থাকার মাধ্যমে মুসালমানরা যে কোন স্থানে অমুসলিমদের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। অমুসলিমদের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখা ইসলাম ও মুসলমানদের সামগ্রিক স্বার্থে সব সময়ই জরুরী।

৫৪। বাইতুল মাকদাস বিজয়ী প্রথম বীর হযরত ইউশা ইবনে নূনের কাহিনী

হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে অলৌ কিক উপায়ে লোহিত সাগর পেরিয়ে এক মরুভূমিতে অবস্থান করতে থাকেন। এই সময় আল্লাহ তায়ালা বেহেশ্‌ত থেকে মান্না ও সালওয়া নামক তৈরী খাবার পাঠিয়ে এবং আকাশ থেকে মেঘের ছায়া দিয়ে তাদের জীবন যাপনের সুব্যবস্থা করেন। ইত্যবসরে আল্লাহর নির্দেশক্রমে মূসা (আ) বনী ইসরাঈলীদেরকে বলেন, "আল্লাহ একটি সুজলা সুফলা নয়নাভিরাম পবিত্র ভূমি ফিলিস্তীন তোমাদের স্থায়ী বসবাসের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তোমরা সেখানে গিয়ে বসবাস করতে থাক।" এই সময় ফিলিস্তীন ছিল আমালেকা নামক বিশালদেহী একটি জাতির দখলে। বনী ইসরাঈলীরা লোকমুখে তাদের বিবরণ শুনেছিল। তারা জবাব দিল, "হে মূসা! ঐ দেশে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী জাতি বাস করে। তাদেরকে লড়াই এর মাধ্যমে পরাজিত করে বহিষ্কার করা ছাড়া আমরা সেখানে প্রবেশ করতে পারবো না। কিন্তু তাদের সাথে আমরা লড়াই করতে অক্ষম।"

হযরত মূসা (আ) এ কথা শুনে তাঁর বিশ্বস্ত সাহাবী হযরত ইউশা ইবনে নূনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ফিলিস্তীনে পাঠালেন সেখানকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য। প্রতিনিধি দলটি ফিরে আসার পর হযরত মূসা (আ) কে জানালো যে, ঐ লোকগুলো শুধু দেখতেই বিশালদেহী, কিন্তু তেমন সাহসী ও লড়াকু নয়। বনী ইসরাঈলীরা একযোগে আক্রমণ করলে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে।

এবার হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলীদেরকে একত্রিত করে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে তাদেরকে ফিলিস্তিনে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারা বললো, "ঐ শক্তিমান জাতিটি যতক্ষণ ওখানে আছে, ততক্ষণ আমরা যাবো না। যদি বেরিয়ে যায়, তাহলে আমরা যাবো।"

এই সময় হযরত ইউশা ইবনে নূন এবং হযরত মূসার (আ) ভগ্নিপতি কালেব তাদেরকে অনেক বুঝালেন যে, "তোমরা ভয় পেয়না। আল্লাহর ওপর ভরসা করে এগিয়ে চল। তোমরা ঐ দেশটির সীমান্তে পৌঁছা মাত্রই ওরা চলে যাবে এবং তোমরা বিজয়ী হবে।"

বনী ইসরাঈল বললো, "হে মূসা, ওরা থাকতে আমরা যাবো না। বরঞ্চ তুমি ও তোমার খোদা গিয়ে লড়াই করে ওদের তাড়িয়ে দিয়ে এস। আমরা ততক্ষণ এখানেই বসে থাকবো।"

এবার মূসা (আ) আল্লাহর কাছে নিবেদন করলেন, " হে আল্লাহ, আমি কেবল আমার ও আমার ভাই এর দায়িত্ব নিতে পারি। তুমি আমার সাথে আমার এই অবাধ্য জাতির সম্পর্ক ছিন্ন করে দাও।"

আল্লাহ বললেন, "হে মূসা! এখন চল্লিশ বছরের জন্য ঐ দেশ বনী ইসরাঈলের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো। এই চল্লিশ বছর ওরা মরুভূমিতে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। তুমি ঐ অবাধ্য লোকদের পরিণতির জন্য দুঃখ করো না।"

এরপর বনী ইসরাঈল চল্লিশ বছর ধরে মরুভূমিতে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। এই সময়ে মিশর থেকে বেরিয়ে আসা বংশধরটি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরবর্তী বংশধরের লোকেরা পূর্ববর্তীদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ফিলিস্তিনের জেহাদে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়। চল্লিশ বছর যখন অতিবাহিত প্রায়, তখন আল্লাহ হযরত মূসা ও হারুনকে নির্দেশ দিলেন যে বনী ইসরাঈলের বারোটি গোত্রকে বারোজন সেনাপতির নেতৃত্বে বারোটি সেনাদলে বিভক্ত করে ফিলিস্তিনে পাঠাও।

তিনি প্রত্যেক ২০ বছর বা তদূর্ধ বয়স্ক যুবককে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করার আদেশ দেন। তদনুসারে হযরত মূসা (আ) হযরত ইয়াকুবের (ইসরাঈল) ১২ পুত্রের নামে নিম্নরূপ ১২টি সেনাদল গঠন করেনঃ

১. রুবেলের গোত্র, সৈন্য সংখ্যা ৬৪ হাজার পাঁচশ, সেনাপতি য়াসূর বিন শাদিউরা।
২. শামউনের গোত্র, সৈন্য সংখ্যা ৫৯ হাজার তিনশ, সেনাপতি শেলোমাঈল বিন হোরেশদায়।
৩. ইয়াহুদার গোত্র, সৈন্য সংখ্যা ৭৪ হাজার ছয়শ, সেনাপতি নাহশূন বিন আমীনাদাব।
৪. ইসাখারের গোত্র, সৈন্য সংখ্যা ৫৪ হাজার চারশ, সেনাপতি নাশাঈল বিন সোগার।

৫. ইউসুফ (আ) এর গোত্র, সৈন্য সংখ্যা ৪০ হাজার পাঁচশ, সেনাপতি ইউশা ইবনে নূন।
৬. মীশার গোত্র, সৈন্য সংখ্যা ৩১ হাজার দুইশ, সেনাপতি জামলাঈল বিন ফাদাহসূর।
৭. বিন ইয়ামীনের গোত্র, সৈন্য সংখ্যা ৩৫ হাজার চারশ, সেনাপতি আবিদুন বিন জাদউন।
৮. হাদের গোত্র, সৈন্য সংখ্যা ৪৫ হাজার ছয়শ পঞ্চাশ জন, সেনাপতি ইলিয়াসাফ বিন রাউঈল।
৯. আশীরের গোত্র, সৈন্য সংখ্যা ৪১ হাজার পাঁচশ, সেনাপতি ফুজআঈল বিন আকরান।
১০. দানের গোত্র, সৈন্য সংখ্যা ৬২ হাজার সাতশ, সেনাপতি উখাইয়ার বিন আমাশদায়।
১১. নাফতালীর গোত্র, সৈন্য সংখ্যা ৫৩ হাজার চারশ, সেনাপতি উখায়রা বিন আইন।
১২. যবুলুনের গোত্র, সৈন্য সংখ্যা ৫৭ হাজার চারশ, সেনাপতি আলবাব বিন হাইলূন।

বনী ইসরাঈলের এই সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন হযরত ইউশা ইবনে নূন। এই বাহিনীর যাত্রার পূর্বেই হযরত মূসা (আ) ও হারুন (আ) একে একে ইন্তিকাল করেন। অতঃপর গোটা বনী ইসরাঈল জাতির সার্বিক নেতৃত্ব দেন হযরত মূসার প্রথম খলীফা হযরত ইউশা ইবনে নূন এবং তাঁর নেতৃত্বে ফিলিস্তিন বিজিত হয়। এই সময় তিনি নবুয়তও লাভ করেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউশা' (আ) চল্লিশ দিন যাবত জর্দান নদী অতিক্রম করতে পারেননি। অতঃপর তাঁর দোয়ার ফলে উভয় তীরের পাহাড় দু'টি মিলিত হয়ে পুলের আকার ধারণ করে। তার ওপর দিয়ে তিনি সৈন্য সামন্ত নিয়ে পার হন। তিনি আরিহা (বর্তমান জেরিকো) শহর ছয়মাস যাবত অবরুদ্ধ করে রাখেন। সপ্তম মাসে বিকট শব্দে তার প্রাচীরগুলো ভেঙ্গে পড়ে। জেরিকো বিজয়ের চূড়ান্ত মুহূর্তে সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হলে তাঁর দোয়ায় সূর্য নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল বলে কোন কোন রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা ঐ দিন ছিল শুক্রবার। ঐ দিনের মধ্যে বিজয় অর্জিত না হলে পরদিন শনিবার ছিল নিষিদ্ধ দিন। তাই বিজয় অনেক বিলম্বিত হতো। আল্লাহ তার বিশেষ সাহায্য দ্বারা এই বিজয়কে উপস্থিত করেন। ইউশা' আমালেকাদেরকে বিতাড়িত ও পরাজিত করেন। অতঃপর বাইতুল মাকদাসকে রাজধানী করে

ফিলিস্তিনের অধিবাসীদেরকে হযরত ইউশা' আল্লাহর কিতাব তাওরাত অনুসারে ২৭ বছর শাসন করেন। তিনি ১২৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

শিক্ষাঃ জেহাদ থেকে পিছপা হওয়া অত্যন্ত মারাত্মক পরিণাম ডেকে আনে। পক্ষান্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষার জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করে জেহাদে অবতীর্ণ হলে প্রতিপক্ষ যত শক্তিশালীই হোক, আল্লাহ বিজয় লাভে সাহায্য করেন।

৫৫। হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইরের পরহেজগারী ও কৃতজ্ঞতা

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) একবার উমাইয়া বংশীয় বাদশাহ আব্দুল মালেকের সাথে দেখা করতে যান। তাঁর সাথে ছিল তাঁর ছেলে। ছেলের আব্দারক্রমে তারা শাহী আস্তাবল দেখতে গেলেন। ছেলেটি কৌ তুহলবশতঃ একটা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলে ঘোড়া তাকে এমন জোরে ফেলে দিল যে, সে ঘটনাস্থলেই মারা গেল। উরওয়া বাদশার দরবার থেকে ক্ষুন্ন মনে বাড়ী চলে গেলেন। কয়েকদিন পর তার পায়ে এমন এক মারাত্মক ফোঁড়া হলো যে, চিকিৎসকরা তাঁর পা কেটে ফেলার পরামর্শ দিল। নচেৎ সমস্ত দেহ তা দ্বারা সংক্রামিত হতে পারে।

হযরত উরওয়া পা এগিয়ে দিলেন কাটার জন্য। ডাক্তার বললো, "সামান্য একটু মদ খেয়ে নিন, যাতে অস্ত্রোপচারের কষ্ট কম অনুভূত হয়।" হযরত উরওয়া বললেন, "আমি কোন অবস্থাতেই কোন হারাম জিনিসের সাহায্য নেব না।"

চিকিৎসক অস্ত্রোপচার করে পা কেটে দিল। হযরত উরওয়া শান্তভাবে বসে দোয়া দরূদ পড়তে লাগলেন। যখন রক্ত বন্ধ করার জন্য ক্ষত স্থানে লোহা পুড়িয়ে দাগানো হলো, তখন যন্ত্রণার তীব্রতা সইতে না পেরে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। হুঁশ ফিরে এলে কাটা পা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলতে লাগলেনঃ

"ওহে পা, যে আল্লাহ তোমাকে আমার বোঝা বহন করার জন্য সৃষ্টি করেছেন, তিনি ভালো করেই জানেন যে, আমি তোমার সাহায্যে হেঁটে কখনো কোন হারাম কাজ করতে যাইনি। হে আল্লাহ, তোমার শোকর যে, আমার চার হাত পার মধ্যে মাত্র একখানা তুমি নিয়েছ এবং বাকী তিনখানা অক্ষত রেখেছ; আর চার ছেলের মধ্যে মাত্র একজনকে নিয়েছ এবং তিনজনকে জীবিত রেখেছ। তুমি কিছু যদি কেড়েও নিয়ে থাক, তবে অনেক কিছু অবশিষ্টও রেখেছ। কিছুদিন যদি কষ্টও দিয়ে থাক, তবে অনেকদিন সুখ-শান্তিও দিয়েছ।"

৫৬। ইমাম আবু হানিফার মহানুভবতা

ইমাম আবু হানিফার পাড়া পড়শীদের মধ্যে একজন দিনমজুর বাস করতো। দিনের বেলায় সে নিজের কুঁড়ে ঘরে বসে নানা রকম কুটির শিল্পের কাজ করতো। অশালীন গান গাইতো ও প্রলাপ বকতো। তার হৈ-চৈতে ইমাম সাহেবের গভীর রাতের নামায, জিকির ও চিন্তাগবেষণা পর্যন্ত ব্যাহত হতো। তিনি তাকে ঐ বদভ্যাস ত্যাগ করার জন্য প্রায়ই অত্যন্ত মিষ্ট ভাষায় উপদেশ দিতেন। কিন্তু সে তাতে কর্ণপাত করতো না। ইমাম অগত্যা নীরবে সব কিছু সহ্য করতেন।

একদিন রাত্রে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ঐ লোকটির কুড়েঘর থেকে কোন হৈ-চৈ এর শব্দ আসছে না। তিনি আজ নির্বিঘ্নে এবাদত জিকির ও চিন্তা-গবেষণা চালালেন বটে, কিন্তু তাঁর মন অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো।

ভোরবেলা ইমাম সাহেব তার খোঁজ খবর নিতে গেলেন। তিনি শুনতে পেলেন যে, পুলিশ ঐ মাতাল লোকটাকে ধরে নিজে জেলে আটক করেছে।

তৎকালে বাগদাদের সিংহাসনে আসীন ছিলেন উমাইয়া বংশীয় বাদশাহ মানসুর। ইমাম সাহেব বাদশার দরবার কঠোরভাবে এড়িয়ে চলতেন। বাদশাহ নিজেই কখনো কখনো এসে ইমাম সাহবের সাথে দেখা করে যেতেন। কিন্তু আজ ইমাম সাহেব তাঁর দরিদ্র প্রতিবেশীর বিপদে অধীর হয়ে বাদশার দরবারে চলে গেলেন।

বাদশাহ ও তাঁর আমীর ওমরাহগণ ইমাম সাহেবকে দরবারে আসতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে বসালেন।

তিনি বললেন, "মহামান্য বাদশাহ, আপনার লোকেরা আমার এক প্রতিবেশীকে ধরে এনে জেলে পুরেছে। আমি তার মুক্তি চাইতে এসেছি।"

বাদশাহ এক মুহূর্ত ভেবে জবাব দিলেন, "মান্যবর ইমাম সাহেব, আপনি আজ আমার দরবারে উপস্থিত হয়ে আমকে যে ধন্য করলেন, সেই আনন্দে ও আপনার সম্মানের খাতিরে আপনার প্রতিবেশীসহ জেলের সকল কয়েদীকে মুক্তি দিলাম। ইমাম সাহেব তার প্রতিবেশীকে নিয়ে বাড়ীতে ফিরলেন। দিনমজুর এরপর আর মদ স্পর্শ করেনি।

৫৭। ইমাম আবু হানিফা ও নাস্তিক

একবার খলিফা হারুনুর রশীদের নিকট এক নাস্তিক এসে বললেন, আপনার সাম্রাজ্যে যদি কোন জ্ঞানী ব্যক্তি থেকে থাকে তবে তাকে ডাকুন, আমি তার সাথে তর্ক করে প্রমাণ করে দেব যে, এই আকাশ ও পৃথিবীর কোন স্রষ্টা নেই, এগুলো আপনা আপনি জন্মেছে এবং আপনা থেকেই চলে। খলিফা কিছুক্ষণ ভেবে নিলেন। তারপর একটা চিরকুটে পুরো বিষয়টা লিখে

একজন দূত মারফত ইমাম আবু হানিফার নিকট পাঠালেন, যেন তিনি যত শীঘ্র সম্ভব খলিফার দরবারে আসেন এবং বিতর্কে অংশ নেন। ইমাম আবু হানিফা দূত মারফত খলিফাকে জানালেন যে, তিনি পরদিন জোহরের নামায খলিফার প্রাসাদে এসে পড়বেন এবং নামাযের পর বিতর্কে অংশ নেবেন।

পরদিন জোহরের সময় খলিফা, তার সভাসদবর্গ ও উক্ত নাস্তিক ইমাম সাহেবের জন্য প্রতীক্ষায় রইলেন। কিন্তু জোহরের নামায পড়াতো দূরের কথা, জোহরের সময় গড়িয়ে আছর হলো, তবু তিনি এলেন না। আছর গড়িয়ে যখন মাগরিবের আযানের সময় সমাগত প্রায়, তখন তিনি এলেন। তাঁকে দেখামাত্র নাস্তিকটি খলীফা হারুনুর রশীদকে বললো যে, তার প্রতিপক্ষ এত দেরীতে কেন পৌঁছলেন তার কারণ জানতে চাই, খলীফা ইমাম আবু হানিফাকে নাস্তিকের অভিপ্রায় জানালেন। ইমাম আবু হানিফা বললেন, 'জাহাপনা, আমি দজলা নদীর ওপারে বাস করি। আপনার দাওয়াত পেয়ে দজলার কিনারে এসে দেখি পারাপারের কোন নৌ কা নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু কোন নৌ কা এল না। সহসা নদীর কিনারের একটা গাছ আপনা থেকে মাটি উপড়ে পড়ে গেল। অতঃপর দেখতে দেখতে গাছটি আপনা থেকে চেরাই হয়ে তক্তায় পরিণত হয়ে গেল এবং সেই তক্তা জোড়া লেগে আপনা আপনি নৌ কা তৈরী হয়ে গেল। অতঃপর সেই নৌ কায় আমি চড়ে বসলাম। নৌ কাটি আপনা আপনি চলতে চলতে আমাকে এপারে এনে পৌঁছিয়ে দিল।'

ইমাম সাহেবের কথা শুনে নাস্তিকটি হো হো করে হেসে উঠলো। সে বললো, ওহে ইমাম সাহেব, আপনি কি আমাকে বোকা পেয়েছেন যে, এমন গাজাখুরি গল্প বিশ্বাস করবো। একটা গাছ আপনা আপনি নৌ কায় পরিণত হলো এটা কি করে সম্ভব?

ইমাম সাহেব বললেন, ওহে নাস্তিক সাহেব, একটা গাছ যদি আপনা থেকে নৌ কায় পরিণত হতে এবং নদী পারাপার হতে না পারে, তাহলে এই বিশাল আকাশ পৃথিবী চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র ইত্যাদি কিভাবে আপনা-আপনি তৈরী হতে এবং চালু থাকতে পারে?

নাস্তিকটি লা-জওয়াব হয়ে মুখ কাচু মাচু করে বিদায় নিল। খলিফা হারুনুর রশীদ ইমাম সাহেবের তাৎক্ষণিক জবাবে মুগ্ধ হয়ে তাকে সসম্মানে বিদায় দিলেন। কোন তর্কে যাওয়ার আগেই নাস্তিকটি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে গেল।

শিক্ষাঃ নাস্তিক ও খোদাদ্রোহীদের কোন যুক্তি থাকে না। বিচক্ষণতা ও সাহস নিয়ে তাদের মোকাবিলা করলেই তারা পরাজিত হতে বাধ্য। তবে এ যুগের নাস্তিক ও খোদাদ্রোহীরা যুক্তির অভাবে সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়ে অস্তিত্ব

টিকিয়ে রেখেছে। তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য মুসলমানদেরকে মাথা ঠান্ডা রেখে সুপরিকল্পিতভাবে শক্তি অর্জন করে জেহাদের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

৫৮। কে বেশী দানশীল

একবার প্রখ্যাত দানশীল সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর নিজের একটা জমি দেখতে গেলেন । সেখানে একটি গোত্রের খেজুর গাছের ছায়ায় বসলেন এবং একজন নিগ্রো ক্রীতদাসকে দেখতে পেলেন। সে বাগানটি পাহারা দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর সে খাওয়ার জন্য তিনটে রুটি বের করলো। সে রুটি খাওয়া শুরু করার আগেই একটা কুকুর এসে তার কাছে ঘেঁসে বসলো। ক্রীতদাসটি একটা রুটি কুকুরকে দিল। কুকুর তা খেয়ে ফেললো। সে তাকে আরো একটি দিল। কুকুরটি তাও খেয়ে ফেললো। অতঃপর সে তৃতীয় রুটিটিও দিল এবং এক নিমেষেই কুকুর তাও খেয়ে ফেললো। আব্দুল্লাহ তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

আব্দুল্লাহ বললেন ঃ তুমি প্রতিদিন ক'টা রুটি খেতে পাও?

ক্রীতদাস বললো ঃ তিনটি।

আব্দুল্লাহ বললেন ঃ তুমি নিজে না খেয়ে সব ক'টা রুটি কুকুরকে দিয়ে দিলে কেন?

ক্রীতদাস বললো ঃ এ অঞ্চলে কোন কুকুর নেই। এ কুকুরটা নিশ্চয়ই অনেক দূর থেকে এসেছে এবং নিশ্চয়ই সে ক্ষুধার্ত। তাই তাকে ফিরিয়ে দেয়া পছন্দ করিনি।

আব্দুল্লাহ বললেন ঃ আজ তুমি কী খাবে?

ক্রীতদাস বললো ঃ আজ উপোষ করবো।

আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর মনে মনে বললেন, এতো আমার চেয়েও দানশীল। অতঃপর ঐ খেজুরের বাগান ও ক্রীতদাসকে কিনে নিলেন এবং ক্রীতদাসকে স্বাধীন করে বাগানটি তাকে উপহার দিলেন।

৫৯। একজন আরব শেখের মহানুভবতা

তখন স্পেনে মুসলিম শাসন চলছে। আমীর আব্দুর রহমান স্পেনের শাসনকর্তা। জনৈক আরব শেখ কর্ডোভার এক গোত্রের সরদার ছিলেন। তার বিপুল ধনসম্পদ ও জমিজমা ছিল।

একদিন তিনি নিজ বাগানে পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন। এই সময় জনৈক স্পেনীয় যুবক আকস্মিকভাবে তার বাগানে ঢুকলো এবং তার পায়ে পড়ে জীবনের নিরাপত্তা চাইল।

শেখ তাকে টেনে তুললেন এবং কারণ জানতে চাইলেন। যুবক বললো, "মহানুভব শেখ, পথিমধ্যে এক যুবকের সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়েছিল। আমি ক্রোধে দিশাহারা হয়ে তার মাথায় একটা আঘাত করলাম। যুবকটি তৎক্ষণাত মারা গেল। তার সঙ্গীরা আমাকে ধাওয়া করছে। আমি জীবনের নিরাপত্তার জন্য পালাচ্ছিলাম। আপনার দরজাটা খোলা দেখে ঢুকে পড়েছি। ঐ ওরা ধেয়ে আসছে। ওদের কোলাহল শোনা যাচ্ছে। দোহাই আপনার, আমাকে প্রাণে বাঁচান।" এই কথা বলে যুবকটি পুনরায় শেখের পা জড়িয়ে ধরলো। সরদার এবারও তাকে টেনে তুললেন এবং বললেন, "তোমাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি। কেউ তোমার কিছু করবে না। এসো আমার সঙ্গে।" অতঃপর তিনি যুবকটিকে তার বাড়ীর একটি গোপন কক্ষে সবার অলক্ষ্যে তালাবদ্ধ করে রাখলেন।

যুবককে নিরাপদ কক্ষে তালাবদ্ধ করে বাগানে ফিরে আসতেই তিনি দেখতে পান এক অকল্পনীয় দৃশ্য। দেখলেন এক উত্তেজিত অবস্থা তার বাগানে। তারা এক সুন্দর সুঠামদেহী যুবকের সদ্য মৃত লাশ ধরাধরি করে নিয়ে এসেছে। লাশ দেখে সরদার এক প্রচন্ড আর্ত চিৎকার দিয়েই সটান মাটিতে পড়ে গেলেন। কারণ যুবকটি ছিল তাঁরই একমাত্র পুত্র সন্তান। উত্তেজিত জনতার মধ্য হতে একজন বললো, "মান্যবর শেখ, একটা বখাটে স্পেনীয় যুবক এই হত্যাকান্ডটা ঘটিয়েছে। সে এই পর্যন্ত এসে উধাও হয়ে গেছে। আমরা তাকে ধাওয়া করে এসেছিলাম। কিন্তু ধরতে পারলাম না।"

সরদার নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর আশ্রিত যুবকই তাঁর প্রাণপ্রিয় সন্তানকে হত্যা করেছে। জনতা তার সমস্ত বাগান তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পেল না। অবশেষে তারা নিরাশ হয়ে শেখকে সান্তনা দিয়ে চলে গেল।

আশ্রিত যুবকটি তার কক্ষ থেকে এসব কিছু দেখলো ও শুনলো। সে উপলব্ধি করলো যে, তার মৃত্যু আসন্ন। সে তার গোপন কক্ষে চরম আতংকের মধ্যে সময় কাটাতে লাগলো।

লাশটি যথারীতি গোসল, কাফন ও জানাযা শেষে সমাহিত করা হলো। শেখের বাড়ীতে কান্নার রোল পড়ে গেল। এই কান্না ও আহাজারীর মধ্য দিয়ে কখন সন্ধ্যা হয়ে গেল কেউ জানেনা।

সন্ধ্যা ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে এলো। রাত গভীর থেকে গভীরতর হলো। বাড়ীর লোকজন কান্নাকাটি করে ক্লান্ত হয়ে এক সময়ে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লো। কিন্তু সরদারের চোখে ঘুম নেই। তিনি তার বিছানা থেকে

উঠলেন, ধীর পায়ে অপরাধী যুবকের কক্ষের কাছে গেলেন এবং তার দরজার তালা খুলে দিলেন। তখন ভয়ে কম্পমান যুবককে লক্ষ্য করে তিনি বললেনঃ

"তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। তুমি আমার মেহমান। মুসলমান প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না। এই নাও। এই পোটলায় তোমার পথে খাওয়ার জন্য কিছু খাবার আছে। আর আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া নাও। তারপর এক্ষুণি এখান থেকে বিদায় হও। শয়তান মানুষকে অনবরত কু-প্ররোচনা দেয়। কে জানে, তুমি এখানে রাতের বাকী অংশ কাটালে আমর মন কখন বিদ্রোহী হয়ে যায় এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কখন প্রতিশোধ নিয়ে বসি। তাই বিলম্ব করো না। চলে যাও। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।"

সীমাহীন কৃতজ্ঞতায় অশ্রুভরা চোখে যুবক তাকালো শেখের দিকে। অতঃপর সালাম জানিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে দ্রুত চম্পট দিল।

৬০। দুঃসাহসী বীর বিশর বিন আমরের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী

দশম হিজরীর কথা। কতিপয় সাহাবী রাসূল (সাঃ) এর পাশে বসেছিলেন। সহসা বিশর বিন আমর আল জারুদের আবির্ভাবে রাসূল (সাঃ) এর পবিত্র মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সাহাবীগণ এই বিশরের রহস্য নিয়ে কৌ তুহলী হয়ে উঠলেন। তারা কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই রাসূল (সাঃ) পূর্বদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "এখানে একটু পরেই উপস্থিত হবে সেই কাফেলা, যাতে শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যবাসীদের সমাবেশ ঘটেছে।

সাহাবীগণ পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। এই কাফেলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে তাদের সবার মন আকুপাকু করছিল যে, তারা কোন্ গোত্র ও কোন্ এলাকার লোক। কিন্তু লজ্জায় কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না। তবে হযরত ওমর (রাঃ) আর দেরী সইতে পারলেন না। তিনি নিজের ঘোড়ায় চড়ে দূর থেকে যে কাফেলাটি ধুলা উড়িয়ে আসছি তা দেখতে এগিয়ে গেলেন। একেবারে কাছে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আপনারা কোন্ গোত্রের লোক?"

তাদের নেতা জবাব দিলেনঃ "বনু আবদিল কায়েস গোত্রের।"

হযরত ওমর (রাঃ) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আপনারা কেন এসেছেন? ব্যবসার জন্য?"

তারা বললোঃ "না।"

রাসূল (সাঃ) এইমাত্র আপনাদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং খুব ভালো বলেছেন।

অনতিবিলম্বে কাফেলা রাসূল (সাঃ) এর সামনে উপনীত হলো। তিনি তাদেরকে মোবারকবাদ জানালেন, ইসলামী নিয়মে ছালাম দিলেন এবং তাদের আগমনে আনন্দ প্রকাশ করে বললেনঃ "আগন্তুক কাফেলাকে অভিনন্দন; সসম্মানে ও নিঃসংকোচে আসুন।" কাফেলার নেতা ছিলেন আবু গিয়াস বিশর বিন আমর বিন আল মুয়াল্লা আল আবদী। তিনি বনু আব্দুল কায়েসের শাখা বনু আবসের প্রবীণতম নেতা, সরদার ও সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি। প্রতিপক্ষীয় এক গোত্রের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার কৃতিত্বের জন্য তারা তাকে 'জারুদ' বা নিপাতকারী নামে আখ্যায়িত করে। তারা এসেছিলেন আরব সাগরের উপকূলবর্তী এলাকা থেকে। তার বীরত্ব ও সাহসিকতার খ্যাতি সমগ্র আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ জন্যই রাসূল (সাঃ) যখন জানলেন যে, এই জারুদ নিজ গোত্রের একটা প্রতিনিধি দল নিয়ে তাঁর কাছে রওনা হয়েছে, তখন তিনি দারুণ উল্লসিত হলেন। রাসূল (সাঃ) জারুদের ও তার দলের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলো। জারুদ ছিল খৃস্টান। তাই সে বললোঃ "কিন্তু আমি মোশরেক নই। আমি আহলে কিতাবের অন্তর্ভূক্ত। আমি খৃস্ট ধর্মের অনুসারী।"

রাসূল (সাঃ) তাকে ইসলামের বিস্তারিত পরিচয় দিলেন। তাকে বুঝালেন যে ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ দ্বীন, যা পূর্ববর্তী নবীদের আনীত দ্বীনের সর্বশেষ রূপ। তিনি তাওহীদের মর্মবাণী বিশ্লেষণ করলেন এবং মানব জাতির নিকট ইসলামের চিরন্তণ বাণী তুলে ধরলেন। জারুদের মন গলে গেল। তথাপি তিনি রাসূল (সাঃ) এর সাথে আরো আলোচনা চালাতে লাগলেন এবং নিজের আবেগ সংযত রাখলেন।

জারুদ ঃ আমি একটা ধর্মের অনুসারী ছিলাম। আরেকটা ধর্মে প্রবেশের জন্য আমি নিজের ধর্ম ত্যাগ করতে যাচ্ছি। আপনি কি আমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, আমি নিজের ধর্মের চেয়ে ভালো ধর্ম গ্রহণ করছি।"

রাসূল (সাঃ) ঃ "আমি তোমাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আল্লাহ তোমাকে খৃস্টবাদের চেয়ে উত্তম ধর্মের সন্ধান দিয়েছেন।"

জারুদ ঃ আমার একটা ধর্ম রয়েছে। তা ছেড়ে আপনার ধর্ম গ্রহণ করলে আল্লাহ আমাকে আযাব দেবেন না তো?

রাসূল (সাঃ) ঃ না, কখনো নয়।

তৎক্ষণাত জারুদ নিঃসংকোচে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, তাকে কাছে টেনে নিলেন ও সম্মানিত করলেন।

এরপর জারূদ ক্রমান্বয়ে একজন উত্তম মুসলমান রূপে গড়ে ওঠেন, ইসলামের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং ইসলামের একজন বিশেষজ্ঞে পরিণত হন। এমনকি তাঁর সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ) একবার মন্তব্য করেন, "খেলাফত কুরাইশ বংশের বাইরে যাবে না- এ কথাটা যদি আমি রাসূল (সাঃ) এর মুখ থেকে উচ্চারিত হতে না শুনতাম, তাহলে আমি জারূদ বিন বিশর ছাড়া আর কাউকে খলিফা রূপে প্রস্তাব করতাম না। আর এ ব্যাপারে আমার মনে কোনই খট্‌কা ছিলনা।"

তিনি জারূদকে ইসলামের ব্যাপারে এত দৃঢ়চেতা পেয়েছিলেন যে, সত্যের ব্যাপারে তিনি কারো নিন্দা সমালোচনার পরোয়া করতেন না এবং সত্য কথাকে উচ্চকণ্ঠে বলতে কাউকে ভয় পেতেন না। এ জন্যই তিনি তার সম্পর্কে এ কথা বলতে পেরেছিলেন। তা ছাড়া হযরত ওমর অত্যন্ত অনমনীয় ও তেজস্বী খলিফা হওয়া সত্ত্বেও বহু বিষয়ে তাঁর মতামত গ্রহণ করতেন। এ জন্যই তিনি তাঁর প্রতি এত সন্তুষ্ট ও প্রশংসামুখর ছিলেন।

এরপর আল্লাহ তাঁর ইসলামের দৃঢ়তার পরীক্ষা নিতে চাইলেন এবং তাকে ও তার দলকে তার গোত্রের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। কিন্তু তাদের আরোহনের জন্য পর্যাপ্ত বাহন পাওয়া গেল না। তিনি রাসূল (সাঃ) এর কাছে বাহন চাইলেন। কিন্তু রাসূল (সাঃ) অক্ষমতা প্রকাশ করলেন।

তখন জারূদ বললেন ঃ "আমার এলাকায় যাওয়ার পথে অনেক লাওয়ারিশ জন্তু পাওয়া যায়। আমি কি সেগুলোতে আরোহন করে যেতে পারি?"

রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ "না, ওগুলো আগুনের দাহ। ও গুলোকে স্পর্শ করো না।"

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, রাসূল (সাঃ) এ উক্তি দ্বারা রাস্তায় পাওয়া যে কোন হারানো জিনিসকে হারাম ঘোষণা করেছেন। এ ধরনের জিনিসের মালিক না পাওয়া গেলে তা সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে।

জারূদ কিছুমাত্র মনোক্ষুন্ন হলেন না, যদিও তাদের বাহক জন্তুর তীব্র প্রয়োজন ছিল। তারা রাসূল (সাঃ) কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিলেন এবং বহু কষ্ট করে দেশে পৌঁছলেন। অতঃপর নিজ এলাকায় ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন। তবে আল্লামা ইবনে আব্দুল বার লিখেছেন যে, জারূদ বাকী জীবন রাসূল (সাঃ) এর সাহচার্যে মদীনায় কাটাতে না পেরে সারা জীবন অনুশোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি ইসলাম প্রচার ও জেহাদ করে সারা জীবন নিজ এলাকায় কাটিয়ে দিয়েছেন। এক সময়ে তিনি ও তাঁর গোত্র

জানতে পারলো যে, রাসূল (সাঃ) ইন্তিকাল করেছেন। এই খবর শোনার পর তার গোত্রের কিছু লোক ইসলাম ত্যাগ করলো। তিনি তৎক্ষণাত তাদের কাছে গেলেন এবং প্রচন্ডভাবে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি উচ্চস্বরে তাদের সামনে বারবার কালেমা শাহাদাত পড়ে তাদেরকে ইসলামে ফিরে আসতে অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন। তাঁর গোত্রের এক ব্যক্তি বলে উঠলোঃ "মুহাম্মদ (সাঃ) যদি নবী হতেন, তাহলে মরতেন না।"

সঙ্গে সঙ্গে গোত্রের আরো অনেকে তাকে সমর্থন করলো ও মুরতাদ হতে লাগলো।

জারুদ তাদের সবাইকে এক জায়গায় সমবেত করে বললেনঃ "হে বনু আবদুল কায়েস, আমি তোমাদের কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। যদি তোমাদের জানা থাকে জবাব দিও, নচেত জবাব দিও না।"

তারা বললো ঃ "ঠিক আছে জিজ্ঞাসা করুন।"

জারুদ বললেন ঃ "তোমরা কি জান যে, অতীতেও আল্লাহর বহু নবী এসেছেন?"

তারা বললো ঃ "হ্যাঁ।"

জারুদ বললেন ঃ "তোমরা কি সেই নবীদেরকে চোখে দেখেছ, না শুনেছ?"

তারা বললো ঃ "শুনেছি।"

জারুদ বললেন ঃ "তারা এখন কোথায়?"

লোকেরা বললো ঃ "তারা মারা গেছেন।"

জারুদ বললেন ঃ "তারা যেমন মারা গেছেন, মুহাম্মদও তেমনি মারা গেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। আমি হযরত আবু বকরের কথার পুনরাবৃত্তি করছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) যদি মারা গিয়ে থাকেন, তাতে কিছু যায় আসে না। আল্লাহ চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।"

এবার তার গোত্রের লোকেরা তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বললোঃ "আমরাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল।"

এরপর হযরত জারুদ (রা) এর আরো একটা সৌ ভাগ্য লাভ করা বাকী ছিল। সেটি হলো শাহাদাত। আল্লাহ তার সে আশাও পূর্ণ করলেন। একুশ হিজরীতে হযরত ওমরের (রা) আমলে পারস্যে প্রেরিত একটি সেনাবাহিনীর সেনাপতি হিসাবে লড়াই করতে করতে তিনি শহীদ হন।

৬১। হযরত যুলকিফলের ক্রোধ সংবরণ

বিশিষ্ট নবী হযরত আল ইয়াসা (আ) যখন বার্ধক্যে উপনীত হলেন, তখন তিনি এমন একজনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত বা খলীফা মনোনীত করতে ইচ্ছা করলেন, যিনি তার নবীসুলভ দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে ডেকে বললেনঃ আমি আমার খলীফা মনোনীত করবো। যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে তাকেই আমি খলীফা মনোনীত করবো। প্রথমতঃ সর্বদা রোযা রাখা, দ্বিতীয়তঃ রাত জেগে আল্লাহর এবাদাত করা এবং তৃতীয়তঃ কোন অবস্থাতেই কারো ওপর রাগান্বিত না হওয়া। সমাবেশের মধ্য থেকে একজন সাধারণ ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো। সে বললোঃ আমি এই কাজের যোগ্যতা রাখি এবং এ দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত। হযরত আল ইয়াসা বললেনঃ তুমি কি সব সময় রোযা রাখ, রাত জেগে এবাদাত কর এবং কোন অবস্থাতেই কারো ওপর রাগ কর না? সে বললোঃ জ্বী, এই তিনিটি গুণই আমার মধ্যে আছে। হযরত ইয়াসা তার কথায় বিশ্বাস করতে না পেরে সেদিনকার মত তাকে ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন তিনি আবারো সমাবেশ ডেকে আগের দিনের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। আজও ঐ একই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আগের দিন যা যা বলেছিল তাই বললো, আর অন্য সবাই চুপ করে রইল। তখন হযরত ইয়াসা তাঁকে খলীফা নিযুক্ত করলেন। এই ব্যক্তিরই নাম যুলকিফল এবং ইনিই পরবর্তীকালে নবুয়ত লাভ করেছিলেন।

এদিকে হযরত যুলকিফল এই পদ লাভ করেছেন দেখে ইবলীস চক্রান্ত শুরু করে দিল। সে তার অনুসারীদেরকে বললো, 'তোমরা যাও, এই যুলকিফলকে যে কোনভাবেই হোক এমন কোন অন্যায় কাজ করতে প্ররোচিত কর যাতে তার এই পদ বাতিল হয়ে যায়। তার অনুসারীরা বললো, যুলকিফল খুবই পাক্কা ঈমানদার। ওকে বশে আনা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।' তখন ইবলীস বললো, 'ঠিক আছে, আমি নিজেই দেখে নেব কেমন করে সে এই দায়িত্বে বহাল হয়।'

হযরত যুলকিফল যথার্থই প্রতিদিন রোযা রাখতেন এবং সারা রাত জেগে এবাদাত করতেন। কেবল দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিতেন। ইবলীশ ঠিক দুপুরে এক বুড়ো মানুষের বেশে এসে তার ঘুমের সময় দরজায় কড়া নাড়লো। তিনি জেগে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কে? জবাব এলো, আমি একজন মযলুম বুড়ো মানুষ। তিনি দরজা খুলে দিলে আগন্তুক ভেতরে

এসে মনগড়া এক দীর্ঘ কাহিনী বলতে শুরু করলো। সে তার গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো যে, তারা তার ওপর নানাভাবে যুলুম নিপীড়ন চালাচ্ছে। এভাবে তার দুপুরের ঘুমের সময় কেটে গেল। হযরত যুলকিফ্‌ল বললেন, আমি যখন আদালতে বসবো তখন এসো। আমি তোমার অভিযোগের বিচার করবো।

যুলকিফ্‌ল আদালতে বসে লোকটির জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সে এলনা। পরের দিন তিনি যখন আদালতে বসলেন, তখনো তার পথ চেয়ে থাকলেন। কিন্তু সে তখনো এলনা। দুপুরে যখন ঘুমাতে আরম্ভ করলেন, অমনি লোকটি দরজা ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিল। তিনি দরজা খুলে দেখলেন সেই বুড়ো লোকটি দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন, আমি তো তোমাকে আদালতে আসতে বলেছি। তুমি কালও আসনি। আজও আসনি। সে বললো, জনাব আমার শত্রুরা বড়ই শঠ। আপনার আদালতে গেলে তারা আপনার সামনে আমার পাওনা মিটায়ে দেবার অঙ্গীকার করবে। কিন্তু পরে আর দেবেনা। এভাবে দ্বিতীয় দিনও তার ঘুম নষ্ট হলো। তিনি বললেন, ঠিক আছে, আমি তোমার পাওনা আদায় না করে তোমার শত্রুদেরকে যেতে দেবনা। তুমি কাল আদালতে এসো। বুড়ো, 'জ্বী আচ্ছা' বলে চলে গেল।

পরদিন আবারও তিনি আদালতে অপেক্ষা করলেন। কিন্তু বুড়ো লোকটি এলনা। তিনি ঘুমে কাতর হয়ে বাড়ীতে এসে দুপুরে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমোবার আগে বাড়ীর সবাইকে নিষেধ কররেন কেউ যেন দরজা না খোলো। বুড়ো আজ আবার এসে কড়া নড়াতে শুরু করলো। বাড়ীর লোকেরা দরজা খুলতে রাযী না হলেও সে আশ্চর্যজনকভাবে ভেতরে ঢুকে হযরত যুলকিফ্‌লকে ডাকতে শুরু করলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ঘরের ভেতর কিভাবে ঢুকলে? লোকটি আমতা আমতা করতে লাগলো। তখন তিনি চিনে ফেললেন যে, সে আসলে ইবলীশ। সে বললো, আমি আপনাকে রাগান্বিত করার এবং দিনের ঘুম ভাঙ্গিয়ে রাতের এবাদত ব্যাহত করার চেষ্টা করছিলাম যাতে হযরত আল ইয়াসার সাথে কৃত আপনার ওয়াদা ভঙ্গ হয়। কিন্তু আপনি আমার সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছেন। (ইবনে কাছীর)

শিক্ষা ঃ ঈমান ও তাকওয়ার ওপর অবিচল থাকতে সংকল্পবদ্ধ হলে শয়তানের কুপ্ররোচনা ও চক্রান্ত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৬২। মুক্তির জন্য নিজের সৎলোক হওয়াই যথেষ্ট নয়

তাফসীরে বাহরে মুহীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউশা ইবনে নূনের নিকট একবার ওহী এল যে, তোমার জাতির এক লক্ষ লোককে আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হবে। এদের মধ্যে চল্লিশ হাজার সৎলোক এবং ষাট হাজার অসৎ লোক। ইউশা (আ) বললেনঃ হে রাব্বুল আলামীন! অসৎ লোকদেরকে ধ্বংস করার কারণ তো জানি, কিন্তু সৎলোকদেরকে কেন ধ্বংস করা হবে। জবাব এল; সেই সৎ লোকগুলোও অসৎ লোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতো। তাদের সাথে পানাহার, উঠাবসা ও হাসি তামাসায় যোগদান করতো। আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখে কখনো তাদের চেহারায় অসন্তোষের চিহ্ন ফুটে উঠতো না।

শিক্ষা ঃ এই ঘটনা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, আল্লাহর আযাব ও অসন্তোষ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিরেট সৎ হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং নিজের পার্শ্ববর্তী লোকদেরকেও সৎ বানাবার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অবশ্য অসৎ লোকদেরকে সৎ পথে আনার জন্য সাময়িকভাবে তাদের সাথে মেলামেশা ও বন্ধুত্ব করা অবৈধ ও অন্যায় হবে না। তবে এই সময়ে তাদেরকে মন দিয়ে ভালোবাসা যাবে না এবং অন্যায় কাজ থেকে তাদেরকে ফেরানো বা বাধা সৃষ্টি করা জন্য প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করতে হবে।

৬৩। মসজিদুল আকসা নির্মাণের ঘটনা

হযরত দাউদ (আ) এর আমলে একবার কলেরা মহামারীতে প্রায় এক লক্ষ সত্তুর হাজার লোক মারা যায়। যারা এই মহামারী থেকে রক্ষা পায় তাদেরকে হযরত দাউদ (আ) বললেনঃ তোমরা যে আল্লাহর রহমতে এই ভয়াবহ গযব থেকে রক্ষা পেয়েছ, সে জন্য আল্লাহর শোকর আদায় কর। তবে শোকর আদায় করার সর্বোত্তম পন্থা হলো মসজিদ নির্মাণ করা।

হযরত দাউদ (আ)-এর কথা শুনে বনী ইসরাঈলের সবাই মসজিদ তৈরী করতে মনস্থির করলো। যে জায়গাটা মসজিদ তৈরীর জন্য নির্ধারিত হলো, তার মালিকরা সবাই জায়গাটা ওয়াক্‌ফ করে দিতে রাযী হলো। কিন্তু একজন মালিক ওয়াক্‌ফ করতে রাযী হলো না। সে ঐ জমির এত দাম চেয়ে বসলো যে, জমির প্রকৃত বাজার মূল্যের চেয়ে তা বহুগুণ বেশী। সে বললো যে, জমির চার পাশে তার সমান উঁচু দেয়াল গেঁথে সেই দেয়াল সমান উঁচু সমস্ত জমি ভর্তি করে স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে। তা হলেই আমি জমি বিক্রি করতে পারি।

হযরত দাউদ (আ) বনী ইসরাঈলের সবাইকে ডেকে এক জায়গায় সমবেত করে ঐ জমির মালিকের দাবীর কথা জানালেন। বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় তৎক্ষনাৎ তার দাবী মেনে নিয়ে চাঁদা তুলে মূল্য পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত জানালো। এ কথা শুনে লোকটি বললো, তোমাদের সংকল্পের দৃঢ়তা দেখে আমি খুশি হয়েছি। আমার কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। আমি চেয়েছিলাম জমি ও স্বর্ণমুদ্রা উভয়ই মসজিদ নির্মাণের জন্য দান করবো। কিন্তু এখন আর আমাকে কিছুই দিতে হবে না। তোমরা নির্বিঘ্নে মসজিদ নির্মাণ কর।

হযরত দাউদ (আ)-এর নির্দেশে লোকেরা মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি খুঁড়তে শুরু করে দিল। মসজিদের প্রাচীর মানুষ সমান গাঁথা হলে আল্লাহর নিকট থেকে ওহী এলঃ হে দাউদ, আমি বনী ইসরাঈলের শোকরিয়া গ্রহণ করলাম। আমি এ কাজ তোমার ছেলে সোলায়মানকে দিয়ে সম্পন্ন করবো। এখন এ কাজ স্থগিত রাখ।

অতঃপর হযরত সোলায়মান (আ) এর আমলে মসজিদুল আকসার অবশিষ্ট নির্মাণ কাজের বেশীর ভাগ সমাপ্ত হয়।

হযরত সোলায়মান (আ) এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে বিপুল সংখ্যক মানুষ ও জ্বীন এই মসজিদের অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে। তিনি মসজিদের নিকট কাঠের তৈরী একটি গম্বুজের ভেতরে লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ তদারক করতেন। ফলে দৈত্য দানবেরা কাজে অলসতা করতো না। একদিন এইভাবে দাঁড়ানো অবস্থায়ই আজরাঈল (আ) এসে তাঁর প্রাণ সংহার করেন। হযরত সোলায়মান (আ) এর অনেক সাধ ছিল বেঁচে থাকতে মসজিদটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করবেন। কিন্তু মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে যাওয়ায় তিনি আর এক মুহূর্তও অতিরিক্ত সময় পেলেন না। তবে দৈত্য দানবরা যাতে কাজ শেষ না করে চলে যায়, সে জন্য আল্লাহ তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারটা তাদের কাছ থেকে গোপন রাখলেন। তাঁর মৃতদেহটি লাঠির ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই রইল। এভাবে তাঁর মৃত্যুর পরও প্রায় এক বৎসর যাবত কাজ চলে ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।

হযরত সোলায়মানের কাঠের লাঠিটি উই পোকায় খেয়ে ফেলায় একদিন সহসা তা ভেঙ্গে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হযরত সোলায়মানের লাশও মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

বর্ণিত আছে যে, জ্বিনদের একটি দল এরূপ ধারণা পোষণ করতো যে, তারা গায়েবের অর্থাৎ অদৃশ্যের খবরাদি জানে। তাদের এই ধারণা ভ্রান্ত

প্রমাণ করা ও দর্প চূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ এই কৌ শল অবলম্বন করেন। তারা যদি গায়েব জানতো, তাহলে মৃত হযরত সালায়মান (আ) এর ভয়ে দীর্ঘ এক বছর অত পরিশ্রম করে মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন করতো না।

শিক্ষাঃ এই ঘটনা থেকে নিম্নোক্ত শিক্ষা লাভ করা যায়ঃ

১. কোন মসজিদ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নির্মাণের অজুহাতে কারো কাছ থেকে বলপূর্বক জমি বা অন্য কোন ধন-সম্পত্তি আদায় করা বৈধ নয়।

২. মৃত্যুর জন্য সময় নির্ধারিত রয়েছে। এই সময়ের কোন হেরফের হয় না এবং কাউকে এক মুহূর্তও আয়ু বাড়িয়ে দেয়া হয় না।

৩. জিন, মানুষ, দৈত্য দানব বা আর কোন সৃষ্ট জীব গায়েব বা অদৃশ্যের খবর জানে না। অদৃশ্যের খবর একমাত্র আল্লাহ জানেন।

৪. আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করার জন্য মৌ খিকভাবে আলহামদুলিল্লাহ ইত্যাদি বলাই যথেষ্ট নয়, বরং কাজের মাধ্যমে বিশেষতঃ আল্লাহর পথে ত্যাগ ও সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে শোকর আদায় করা কর্তব্য।

৬৪। হযরত উযাইর (আ) এর কাহিনী

বুখতে নাছার নামক এক কুখ্যাত অত্যাচারী বাদশাহ বনী ইসরাঈলকে পরাজিত করে বাইতুল মাকদাসকে দখল ও ধ্বংস করেছিল। সে এই পবিত্র শহরের দালান কোঠা ঘরবাড়ী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে এবং এক অধিবাসী বনী ইসরাঈলের ওপর চরম নির্যাতন চালায়।

এই ঘটনার কিছুদিন পর আল্লাহ তায়ালা হযরত উযাইর (আ) কে নবী হিসাবে প্রেরণ করেন।

একদিন তিনি সকাল বেলা ভ্রমণে বেরুলেন। ভ্রমণের সময় বিধ্বস্ত নগরী বাইতুল মাকদাসের করুণ দৃশ্য দেখে ভীষণভাবে মর্মাহত হলেন এবং বললেনঃ আল্লাহ বিধ্বস্ত জনপদকে কিভাবে পুণরুজ্জীবিত করবেন? যদিও তিনি এ কথাটা অবিশ্বাসের মনোভাব নিয়ে বলেননি, তথাপি আল্লাহ তার নবীর মুখ দিয়ে এরূপ কথা উচ্চারণ পছন্দ করলেন না। কেননা কথাটার মধ্যে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রতি সংশয় প্রকাশ পেয়েছিল। তাই আল্লাহ এ ব্যাপারে তাঁর নবীকে বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

হযরত উযাইর (আ) একটা গাধার পিঠে আরোহন করে ভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন। তাঁর সাথে একটা পাত্রে কিছু খাদ্যদ্রব্য ছিল। তিনি একটা গাছের সাথে গাধাটাকে বেঁধে নিজে তার ছায়ায় বিশ্রাম নিতে লাগলেন। বিশ্রাম করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। আর এই ঘুমের মধ্যেই আল্লাহ তাঁর ও তাঁর গাধাটার মৃত্যু ঘটালেন।

হযরত উযাইরের মৃত্যুর পর একশো বছর কেটে গেল। তাঁর লাশ সেখানেই পড়ে রইল। কিন্তু এত দীর্ঘ সময়েও তাঁর লাশের কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটলো না। তার খাদ্যদ্রব্যও টাটকা রইল। কিন্তু তাঁর গাধাটা পঁচে গলে মাটির সাথে মিশে গেল। কেবল তার হাড়গুলো অক্ষত রইল।

একশো বছর পর আল্লাহ্ হযরত উযাইরকে জীবিত করে জিজ্ঞেস করলেন, হে উযাইর, তুমি কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলে? হযরত উযাইর বললেন, সম্ভবতঃ একদিন বা তার থেকেও কম।

আল্লাহ্ তায়ালা বললেনঃ না, তুমি একশো বছর মৃত অবস্থায় কাটিয়েছ। তারপর আমি তোমাকে পুনরায় জীবন দান করলাম। তোমার খাদ্যদ্রব্যগুলো লক্ষ্য কর, তা একেবারে টাটকা রয়েছে। কিন্তু গাধাটা মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু কয়েকখানা হাড় রয়েছে। এই দেখ, আমি ওর হাড়ে গোশত জড়িয়ে কিভাবে পুনরায় জীবিত করি। এই বলে গাধাটা জীবিত করে দিলেন।

এই ঘটনা ঘটিয়ে আল্লাহ্ নিজেকে অসীম ক্ষমতাশালী বলে প্রমাণ করলেন। ওদিকে উযাইর সমকালীন বাদশাহর কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। অতঃপর বাদশাহ্ ও তার শাসনাধীন জনগণকে তাওরাত শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনি ছিলেন সমগ্র তাওরাতের হাফেয।

কিন্তু হযরত উযাইর (আ) মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম লাভ করায় ইহুদীরা তাকে অতি মানব মনে করে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা মাত্রা ছাড়িয়ে ভক্তির আতিশয্যে তাকে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে। তাদের এই অবান্তর ধারণাকে পরবর্তী নবীগণ খন্ডন করেন। সর্বশেষ কুরআনেও তা ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

৬৫। কাদেসিয়ার এক দুর্ধর্ষ বীরের কাহিনী

চৌ দ্দ হিজরীর মুহাররম মাসের কথা। মুসলিম বাহিনী সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে কাদেসিয়ায় ইরানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। ইরানী বাহিনীর সেনাপতি ছিল মহাবীর রুস্তম। আজ যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন। তুমুল যুদ্ধ চলছে। অনেকে শহীদ হচ্ছেন। আবার অনেকে আহত হয়ে শিবিরে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস অসুস্থ। তাই ময়দানে যেতে পারেননি। কাদেসিয়ায় নিজ বাসস্থানের ছাদের ওপর থেকে যুদ্ধের দিক নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। তাঁর বাড়ীর এক কক্ষে এক কয়েদী পায়ে শেকল পরা অবস্থায় আটক ছিল। মদ্যপানের অপরাধে তাকে আটক করা হয়েছে। যুদ্ধের পর তাকে শাস্তি দেয়া হবে। তার চোখে মুখে ভীষণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। তাঁর

দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত রয়েছে রণাঙ্গণের দিকে। হযরত সা'দের স্ত্রী সালমা কোন কাজে ঐ কক্ষের কাছে যাওয়া মাত্রই কয়েদী ভারী শিকল নিয়ে টলতে টলতে কোন রকমে তার কাছে গিয়ে বললোঃ

"আল্লাহর দোহাই, আমাকে ছেড়ে দিন। আমাকে যুদ্ধে যেতে দিন। জ্যান্ত ফিরতে পারলে আবার এসে শেকল পরবো।"

সালমা অস্বীকার করলো। পরম দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে কয়েদী নিজ জায়গায় গিয়ে বসলো। সেখান থেকে রণাঙ্গন দেখা যাচ্ছিল। সেদিকে একটা নজর বুলিয়ে সে আবেগে গুণ গুণ করে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলোঃ

"এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি হতে পারে যে, লড়াকু সিপাইরা তীর নিক্ষেপ করে চলেছে, আর আমি কয়েদখানায় পড়ে আছি। আমি উঠতে চাই, কিন্তু শেকল আমাকে টেনে ধরে। দরজা এমনভাবে তালাবদ্ধ যে, আমার চীৎকারও কারো কানে যায় না। .... ওহে মহিয়ষী নারী, আমার তরোয়ার খানা দিন। খোদার কসম, আমি অংগীকার ভঙ্গ করবো না। বেঁচে গেলে অবশ্যই ফিরে আসবো। আর মরে গেলে তো শাহাদাতের স্থানই পূর্ণ হবে।"

কয়েদীর কণ্ঠে গভীর বেদনাভরা আবেগের আকুতি। সালমা আর সইতে পারলেন না। তার মন গলে গেল। তিনি কয়েদীর শেকল খুলে দিলেন। কয়েদী বর্শা হাতে নিল এবং সা'দের ঘোড়ায় চড়ে বিদ্যুৎবেগে ময়দানে পৌঁছে গেল। শত্রুর ওপর বজ্রের মত গিয়ে পড়লো। সে যেদিকে ঢুকলো সেদিকে শত্রু সৈন্যদেরকে কচুকাটা করতে লাগলো। শত্রু সৈন্য তার ওপর বার বার আঘাত হেনেও তাকে বাগে আনতে পারলো না। চোখের পলকে সে একদিক থেকে আর একদিক গিয়ে শত্রু সেনাদেরকে বিপর্যস্ত করে তুললো। মুসলিম বাহিনী হতবাক। এ কোন্ বীর? কোথা থেকে তার এ হঠাৎ আগমন? তার এই বজ্রসম আক্রমণে সমগ্র ইসলামী বাহিনীতেও তীব্র গতি ও আবেগের সঞ্চার হলো।

হযরত সা'দও ছাদের ওপর বসে এই দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না এ দুর্ধর্ষ জোয়ান কোথা থেকে এল। তার ঘোড়া তো হুবহু সা'দের 'বালকা' আর যুবককে দূর থেকে আবু মাহজান সাফাফীর মত লাগছে। কিন্তু সেতো তাঁর ঘরে কয়েদী।

যুদ্ধের ফায়সালা সেদিনও হলো না। রাত্রে আবু মাহজান ময়দান থেকে ফিরে এসে নিজে নিজেই শেকল পরে কয়েদখানায় বসে রইল। মুসলিম বাহিনীর সর্বত্র এই দুর্ধর্ষ বীরকে ঘিরে কথাবার্তা চলছে। সবার ধারণা, এ ব্যক্তি কোন মানুষ নয়, গায়েব থেকে আগত কোন ফেরেশতা, যিনি

মুসলমানদের মনোবল বাড়াতে এসেছিলেন। রাতের বেলা খাওয়ার সময় হযরত সা'দও বিষয়টা আলোচনা করতে লাগলেন। স্ত্রী সালমার কথা শুনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সালমা বললেনঃ "ওতো আবু মাহজান ছিল।" অতঃপর পুরো ঘটনা তাকে জানালেন। তিনি তৎক্ষণাত খাওয়া রেখে উঠে গেলেন এবং আবু মাহজানকে মুক্ত করে দিয়ে বললেনঃ

"যে ব্যক্তি জেহাদের জন্য এত ব্যাকুল এবং ইসলাম ও মুসলমানদের এত দরদী, তাকে আমি মদ্যপানের শাস্তি দেব না।"

আবু মাহজান বললোঃ "আমি তওবা করছি মাননীয় সেনাপতি, জীবনে আর কখনো মদ স্পর্শ করবো না।"

শিক্ষাঃ শয়তানের প্ররোচনায় কেউ একই অপরাধ করে ফেললে তার তৎক্ষণাত তওবা করা উচিত এবং পরবর্তীতে প্রথম সুযোগেই জেহাদ কিংবা অন্যান্য সৎকাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃত পাপ মোচনে সচেষ্ট হওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর পথে জেহাদই কৃত গুনাহের কাফফারার সবচেয়ে বড় উপায়। আল্লাহ তায়ালা ঈমান এনে জেহাদে অংশগ্রহণকারীদের জন্য একাধিকবার গুনাহ মাফ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

৬৬। কে ধনী, কে গরীব

একবার এক ব্যক্তি প্রখ্যাত সূফী সাধক ইবরাহীম আদহামকে বললেন, "আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আমার এই জুব্বাটি আপনি হাদিয়া হিসাবে গ্রহণ করুন।"

ইবরাহীম আদহাম বললেনঃ "তুমি যদি ধনী হও, তাহলে হাদিয়া গ্রহণ করতে পারি। আর যদি গরীব হও, তাহলে দুঃখ প্রকাশ করছি।"

লোকটি বললোঃ অবশ্যই আমি ধনী।

আদহাম বললেনঃ তোমার কত সম্পদ আছে?

লোকটি বললোঃ দু'হাজার দীনার।

তিনি বললেনঃ তুমি কি চাওনা যে, তোমার আরো দু'হাজার দীনার হোক?

সে বললোঃ তা তো অবশ্যই চাই।

ইবরাহীম আদহাম বললেনঃ তাহলে তো তুমি গরীব। আমি তোমার হাদিয়া নিতে পারি না।

শিক্ষাঃ একটি হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মনের ধনী, সে-ই আসল ধনী।' আলোচ্য ঘটনাটি এই হাদীসেরই ব্যাখ্যা স্বরূপ। কেননা

এখানে এক ব্যক্তির মনের দারিদ্রই ফুটে উঠেছে। সে ধনী বলে দাবী করেছিল। কিন্তু যেহেতু তার যে সম্পদ আছে, তাতে সে তৃপ্ত নয়। তাই সে আসল ধনী নয়। সে আসলে গরীব। প্রকৃত ধনী সেই ব্যক্তি, যার আর ধনের লিপ্সা নেই এবং তার যা আছে তাতেই সে পরিতৃপ্ত।

৬৭। উম্মে সুলাইমের দেন মোহর

তখন ইয়াসরিবে (মদীনায়) এক নজীরবিহীন পরিবর্তনের হাওয়া বইছিল। খাজরাজ গোত্রের কয়েক ব্যক্তি হজ্জ করতে মক্কায় গিয়েছিল। সেখান থেকে তারা যখন ফিরে এল, তখন তাদের চিন্তা ও কর্মের ধারাই পাল্টে গেল। শুধু তাদের নয়, মনে হচ্ছিল যেন পুরো ইয়াসরিবেরই জীবন ধারা পাল্টে যাবে অচিরেই। ঘরে ঘরে এক নতুন কলেমার চর্চা শুরু হয়ে গেল। এটা সেই কলেমা, যা মক্কায় কুরাইশ গোত্রের এক পরম সত্যবাদী ও বিশ্বাসী ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিগত দশ বছর ধরে প্রচার করে যাচ্ছিলেন। মক্কায় তার আহ্বানে মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তিই সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু ইয়াসরিববাসীর মধ্যে তা অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ইয়াসরিবের গোটা সমাজ ব্যবস্থাই নতুনভাবে নির্মিত হতে লাগলো। যারা এই দাওয়াত গ্রহণ করতে লাগলো, তাদের মধ্যে আগে কোন সম্পর্ক না থাকলেও এখন তারা পরস্পরে পরম আত্মীয় হয়ে যেতে লাগলো। আর অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেতে লাগলো- চাই তাদের মধ্যে যত ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্কই থাক না কেন।

ইয়াসরিবের বনু নাজ্জার গোত্রের উম্মে সুলাইম সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করে গোত্রের সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন। এ সময় তার স্বামী মালেক বিদেশে ছিল। বিদেশ থেকে ফিরে আসার সময় সে ইয়াসরিবের উপকণ্ঠেই এক পরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাত পেল। সে বললোঃ ইয়াসরিবের সবকিছু পাল্টে গেছে। জনগণের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের হিড়িক পড়ে গেছে। আবু হাইসাম, আবু উমামা ও রাফে' প্রমূখ মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে আসার পর এখানে সবার কাছে তা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এখন ঘরে ঘরে ইসলামের সরব পদচারণা। তোমার স্ত্রী উম্মে সুলাইমও ইসলাম গ্রহণ করেছে।

মালেক ভীষণ চটে গেল। দ্রুত পদক্ষেপে বাড়ী গিয়ে পৌঁছলো। উম্মে সুলাইম হাসিমুখে স্বাগত জানালেন। কিন্তু মালেকের ভ্রু কুঞ্চিতই রইল। উম্মে সুলাইমের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললো ঃ "শেষ পর্যন্ত তুমিও সাবী (নক্ষত্র পূজারী) হয়ে গেলে?"

উম্মে সুলাইম বললেন ঃ "সাবী নয় মুসলমান হয়েছি। আমি পৌ ত্তলিকতা ছেড়ে দিয়ে শান্তির পথ অবলম্বন করেছি। মালেক, ভেবে দেখতো অসংখ্য দেব দেবীর পূজা করা ভালো, না এক আল্লাহর? আমি এক আল্লাহকে মা'বুদ হিসাবে গ্রহণ করেছি।"

মালেক কি বলবে ভেবে পেল না। কেবল কটমট করে তাকিয়ে রইল। উম্মে সুলাইম পুত্র আনাস বিন মালেককে ডাকলেন। আনাস কাছে এলে বললেন, 'বাবা, পড়, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।' আনাস একবার বাবার দিকে ও একবার মায়ের দিকে তাকিয়ে তোতলাতে তোতলাতে বললোঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।' মালেক ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললোঃ 'নিজে যা করার তাতো করেছ। ছেলেটার মাথা খেয়ো না।'

উম্মে সুলাইম বললেনঃ "আমি আমার কলিজার টুকরার মাথা খাই কিভাবে? আমি তাকে শান্তির পথে আনতে চাই।" তার কণ্ঠে বিনয়ের সুর কিন্তু দৃঢ় মনোবল প্রকাশ পাচ্ছিল।

উম্মে সুলাইম স্বামীকে কুফরির পথ থেকে ফেরাতে অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। একদিন রাগারাগি করে বাড়ী থেকে চলে গেল মালেক। আর ফিরলো না। পরে জানা গেল, মালেক সিরিয়া যাওয়ার পথে তার শত্রুরা তাকে হত্যা করেছে।

কিছুদিন পর বনু নাজ্জারের এক যুবক আবু তালহা উম্মে সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালো। উম্মে সুলাইম তাকে বললেনঃ

'আবু তালহা, আমি মুসলমান। আর তুমি কাফের। কাফেরের সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে জায়েয নয়। রাসূল (সাঃ) এর ওপর ঈমান আনো এবং তার দ্বীনের অনুসরণ কর। আমি বিয়েতে রাজী হয়ে যাবো এবং কোন দেন মোহরও চাইব না। তোমার ইসলাম গ্রহণই হবে আমার দেন মোহর।'

আবু তালহা বললেন, 'আমাকে একটু ভাবতে সময় দাও।'

অবশেষে কয়েকদিন পর আবু তালহা উম্মে সুলাইমের বাড়ীতে গেল। বাড়ীর দরজায় পা রেখেই কালেমা পড়লো। আর কালবিলম্ব না করে উম্মে সুলাইমও তার কথা রাখলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম বিয়ে, যার দেনমোহর ছিল ইসলাম।

উম্মে সুলাইম অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও ধৈর্যশীলা রমনী ছিলেন। তাঁর ছোট ছেলে আবু উমাইর যখন মারা যায়, তখন আবু তালহা বাড়ীতে ছিলেন না। উম্মে সুলাইম তার গোছল ও কাফনের ব্যবস্থা করলেন এবং বাড়ীর সবাইকে বললেন, আবু তালহা এলে কেউ তাকে আবু উমাইরের মৃত্যুর খবর জানাবেন

না। আমি নিজে জানাবো। রাত্রে আবু তালহা এলে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু উমাইর কেমন আছে? উম্মে সুলাইম বললেন, 'খুব ভালো আছে। ঘুমুচ্ছে।'

তারপর তাকে খাবার দিলেন এবং উভয়েই শান্তভাবে শুয়ে পড়লেন। রাত একটু গভীর হলে উম্মে সুলাইম বললেনঃ

"আবু তালহা, যদি কেউ কোন পরিবারকে কোন জিনিস ধার হিসাবে দেয় এবং কিছুদিন পর তা ফেরত চায়, তবে তা দেয়া উচিত না দিতে অস্বীকার করা উচিত?"

আবু তালহা বললেন, "অবশ্যই দিয়ে দেয়া উচিত।"

উম্মে সুলাইম বললেন, "তাহলে আপনি আবু উমাইরের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করুন। সে ছিল আল্লাহর সম্পদ। তিনি আমাদেরকে ধার হিসাবে দিয়েছিলেন এবং এখন ফেরত নিয়ে নিয়েছেন।"

আবু তালহা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন যে, আমাকে আগে বলনি কেন? সকাল বেলা রাসূল (সাঃ) কে গিয়ে সব ঘটনা জানালেন।

রাসূল (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের ওপর খুবই খুশী হয়েছেন এবং তোমাদের ধৈর্যের বিনিময়ে তোমাদেরকে আরো ভালো সন্তান দেবেন। এর কিছুদিন পর আল্লাহ তাদেরকে একটি পুত্র সন্তান দেন। এর নাম রাখা হয় আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহর সাতটি পুত্র সন্তান হয়েছিল এবং তারা সকলেই কুরআনের হাফেয হয়েছিল। আর উম্মে সুলাইমের অন্য পুত্র হযরত আনাস বিন মালেক তো রাসূল (সাঃ) এর ঘনিষ্টতম ও প্রিয়তম সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

শিক্ষাঃ হযরত উম্মে সুলাইম একজন অতি উঁচু স্তরের আদর্শ মহিলা সাহাবী। স্বামী ভক্তির পাশাপাশি তিনি সন্তানসহ গোটা পরিবারের ওপর নিজের ইসলামী চরিত্রে প্রাধান্য বজায় রেখেছিলেন। এমনকি নতুন স্বামী গ্রহণ করার পূর্বে তাকেও ইসলামে দীক্ষিত করে নিয়েছিলেন। এই গুণাবলী প্রত্যেক মুসলিম নারীর ভূষণ হওয়া উচিত।

৬৮। অকৃতজ্ঞতার পরিণাম

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বনী ইসরাইল গোত্রে তিন ব্যক্তি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিল। একজন ছিল কুষ্ঠরোগী, দ্বিতীয় জন মাথায় টাক পড়া আর তৃতীয় জন অন্ধ। আল্লাহ তায়ালা এই তিনজনকে পরীক্ষা করতে মনস্থ করলেন। তিনি তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা প্রথমে কুষ্ঠরোগীর নিকট গিয়ে

বললোঃ তুমি কি চাও? সে বললোঃ আমি আল্লাহর কাছে শুধু এটুকুই চাই যে, আমার এই কুৎসিত ব্যাধি নিরাময় হোক, আমার শরীরে নতুন চামড়া জন্মাক এবং আমি সুন্দর হই- যেন লোক সমাজে যেতে পারি এবং মানুষ আমাকে ঘৃণা না করে। ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তার রোগ সেরে গেল এবং শরীর নতুন রূপ ধারণ করলো। এরপর আল্লাহর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কি কোন সহায় সম্পদ চাও? সে বললোঃ হ্যাঁ, আমি উট পেলে খুশী হই। ফেরেশতা তাকে একটা গর্ভবতী উষ্ট্রী এনে দিলেন। অতঃপর আল্লাহর দরবারে বরকতের জন্য দোয়া করে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

এরপর ফেরেশতা টাক পড়া লোকটির নিকট গিয়ে বললেনঃ তুমি কি চাও? সে বললোঃ আমার টাকের কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। আমি এই টাকের নিরাময় চাই। ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই মাথা ভালো হয়ে গেল। নতুন চুল গজিয়ে সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করলো। এবার ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোন প্রকারের সম্পদ তুমি পেতে চাও? সে বললোঃ গরু পেলে আমি খুশি হই। ফেরেশতা তৎক্ষণাত একটি গর্ভবতী গাভী এনে দিলেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করে প্রস্থান করলেন।

অতঃপর ফেরেশতা অন্ধ লোকটির নিকট গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কি চাও? লোকটি বললোঃ আল্লাহ আমার চোখ ফিরিয়ে দিন যেন আমি আল্লাহর সৃষ্টিকে দেখতে পাই। আল্লাহর ফেরেশতা তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। অতঃপর ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কি পছন্দ কর? সে বললোঃ আল্লাহ যদি আমাকে একটি ছাগল দেন তবে আমি কৃতার্থ হবো। ফেরেশতা তৎক্ষণাত একটি গাভীন বকরী এনে দিলেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করে বিদায় নিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই এই তিনজনের উট, গরু ও ছাগলে মাঠ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এখন তারা প্রত্যেকে এক একজন বিরাট ধনী। এই সময় একদিন হঠাৎ সেই ফেরেশতা আগের মত রূপ ধারণ করে উটওয়ালার (সাবেক কুষ্ঠরোগী) নিকট এসে বললেনঃ আমি একজন প্রবাসী। আমি পথিমধ্যে বড়ই অভাবে পড়েছি। আমার বাহক জন্তুটিও মারা গেছে এবং আমার পথ খরচও ফুরিয়ে গেছে। আপনি যদি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে কিছু সাহায্য করেন তবে আমি খুবই উপকৃত হবো। এখন আল্লাহ ছাড়া আমার কোনই উপায় নেই। যে আল্লাহ আপনাকে সুন্দর স্বাস্থ্য ও সুশ্রী চেহারা দান করেছেন তার নামে

আমি আপনার নিকট একটি উট চাই। আমাকে একটি উট দিন। আমি তাতে আরোহন করে কোন রকমে বাড়ী পৌঁছতে পারবো।

লোকটি বললোঃ হতভাগা কোথাকার! দূর হও এখান থেকে। তোমাকে দিবার মত আমার কিছুই নেই। ফেরেশতা বললেনঃ আমি তোমাকে চিনি বলে মনে হয়। তুমি কি কুষ্ঠরোগী ছিলেনা? লোকে কি তোমাকে এজন্য ঘৃণা করতো না? তারপর আল্লাহ কি তোমাকে ভালো করে দেননি? তুমি কি নিঃস্ব ও গরীব ছিলেনা? অতঃপর আল্লাহ পাক কি তোমাকে এই বিপুল ধন সম্পদ দান করেননি? লোকটি বললোঃ কখখনো নয়। আমরা বাপদাদার আমল থেকেই ধনী। এই সম্পত্তি আমরা পুরুষানুক্রমে ভোগ করে আসছি। ফেরেশতা বললেনঃ যদি তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক, তবে আল্লাহ তোমাকে আগের মত বানিয়ে দিক। কিছু দিনের মধ্যেই লোকটি আগের মত নিঃস্ব ও কুষ্ঠরোগী হয়ে গেল।

অতঃপর ফেরেশতা দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ সাবেক টাকপড়া লোকটির নিকট উপস্থিত হলেন। তার এখন এমন সুন্দর সুঠাম দেহ ও চেহারা আর মাথায় এমন ঘন কালো চুল যে, আগে তার মাথায় টাক ছিল এমন কথা কল্পনাও করা যায় না। ফেরেশতা তার নিকট একটি গরু চাইলেন এবং পূর্ববর্তী ব্যক্তির মতই আলাপ আলোচনা চালালেন। সেও পূর্ববর্তী ব্যক্তির মত প্রত্যাখ্যান করলো। ফেরেশতা তাকে অভিসম্পাৎ দিয়ে বললেনঃ তুমি যদি মিথ্যুক হয়ে থাক, তবে আল্লাহ যেন তোমাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেন। তার মাথায় আবার টাক পড়লো এবং ধন সম্পদ বিনাশ প্রাপ্ত হলো।

এরপর ফেরেশতা একইভাবে সাবেক অন্ধ ব্যক্তিটির নিকট গেলেন এবং একইভাবে নিজের প্রবাসকালীন বিপদের কথা বললেন ও লোকটির পূর্বেকার অবস্থা স্মরণ করিয়ে দিয়ে একটা বকরী প্রার্থনা করলেন। লোকটি বললোঃ আমি আমার অতীতকে ভুলিনি। আমি অন্ধ ও গরীব ছিলাম। আল্লাহ আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং আমার নিকট যত ধন সম্পদ দেখতে পাচ্ছ, সবই তিনি দিয়েছেন। তোমর যে কয়টি দরকার ইচ্ছামত নিয়ে যাও।

ফেরেশতা বললেনঃ না, এ সব তোমারই থাক। কিছুরই আমার প্রয়োজন নেই। তোমাদের তিনজনকে পরীক্ষা করা অভিপ্রেত ছিল। সে কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অপর দু'জন পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে। তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। তাদের উভয়ের ওপর আল্লাহর গজব নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তোমার ওপর খুশী হয়েছেন। (বুখারী শরীফ)

শিক্ষা ঃ এ হাদীসের শিক্ষা অত্যন্ত পরিষ্কার। আল্লাহ্‌ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেনঃ "তোমরা শুকরিয়া আদায় করলে আমি নিয়ামত বাড়িয়ে দেবো। আর না-শুকরী করলে (মনে রেখ) আমার শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ।" (সুরা ইবরাহীম) শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা শুধু মৌ খিকভাবে ব্যক্ত করার জিনিস নয়। কাজের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করতে হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যা দিয়েছেন তা আল্লাহর মনোপুত কাজে ব্যয় ও ব্যবহার করতে হয়। এরই নাম শুকর বা কৃতজ্ঞতা। আর কৃপণতা করা বা অপচয় ও অপব্যয় করা না শুকরী। আল্লাহ আমাদের সকলকে আল্লাহর দেয়া প্রতিটি নিয়ামতের যথাযথ শুকরিয়া আদায় করার তৌ ফিক দিন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বস্তুগত ধন-সম্পদের ন্যায় আমাদের অনেক নৈতিক ও অদৃশ্য নিয়ামত রয়েছে, যার যথার্থ ব্যবহার ছাড়া শুকরিয়া আদায় হতে পারে না। ইসলাম সবচেয়ে বড় সম্পদ ও সর্বাপেক্ষা মূল্যবান নিয়ামত। এ নিয়ামত আল্লাহ্‌ যেমন আমাদেরকে দিয়েছেন, তেমনি তা অন্যদেরকেও বিতরণ করা আমাদের কর্তব্য। এ জন্য ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। অনুরূপভাবে জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা, কারিগরী দক্ষতা ও শৈল্পিক কলা কৌ শল- এ সবই আল্লাহর নিয়ামত এবং আল্লাহর মনোপুত পন্থায় ও মানবতার কল্যাণে তার প্রয়োগ জরুরী।

৬৯। আসহাবুল উখদুদের ঘটনা

রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এক অতীব পরাক্রমশালী রাজা ছিল আর তার ছিল এক যাদুকর। সে যখন বৃদ্ধ হয়ে গেল, তখন রাজাকে বললোঃ আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। এক বালককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি তাকে যাদু শিখাবো। রাজা একটি বালককে যাদু শেখার জন্য তার কাছে পাঠালো। তার যাতায়াতের রাস্তায় ছিল হযরত ঈসা (আ) এর শরীয়তের অনুসারী একজন দরবেশ। একদিন সে আসা যাওয়ার সময় কিছুক্ষণ তার কাছে বসলো এবং তার কথাবার্তা শুনে মুগ্ধ হলো। এভাবে সে প্রতিদিন আসা যাওয়ার সময় দরবেশের কাছে বসতে লাগলো। যাদুকরের কাছে গেলে সে তাকে বিলম্বের কারণে মারধোর করতো। এতে সে দরবেশের কাছে যাদুকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। দরবেশ বললো যখন যাদুকর তোমাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করবে তখন বলবে আমার পরিবারবর্গ আমাকে আটকে রেখেছিল। আর যখন তোমার পরিবারবর্গ তোমার কাছে বিলম্বের কারণ জানতে চাইবে, তখন বলবে যাদুকর আমাকে আটকে রেখেছিল।

এভাবেই চলতে লাগলো বালকটির আসা যাওয়া। একই সাথে যাদুকরের কাছে যাদু এবং দরবেশের কাছে ইসলামী বিধান শিখতে লাগলো। বাড়ী থেকে যাদুকরের কাছে যাওয়ার সময় একবার এবং যাদুকরের কাছ থেকে বাড়ী যাওয়ার সময় আর একবার দরবেশের কাছে বসতো এবং তার উপদেশ শুনতো। কিছুদিন এভাবে চলার পর বালকটা উভয়ের ব্যাপারে সন্দিহান ও দোদুল্যমান হয়ে পড়লো। কোন্‌টি সত্য ও সঠিক, তা সে বুঝে উঠতে পারলো না।

এই সময়ে একদিন সে রাস্তার ওপর একটা বিশালকায় জন্তু দেখতে পেলো। জন্তুটি এমনভাবে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছিল যে, লোকজন আসা যাওয়া করতে পারছিল না। বালকটি তখন মনে মনে বললোঃ "আজ আমি দেখে নেবো দরবেশ শ্রেষ্ঠ না যাদুকর শ্রেষ্ঠ।" তাই সে একটি পাথরখন্ড হাতে নিয়ে বললোঃ "হে আল্লাহ! দরবেশের কার্যকলাপ যদি তোমার নিকট যাদুকরে কার্যকলাপের চেয়ে বেশী পছন্দনীয় হয়, তবে এই জানোয়ারটাকে মেরে ফেল, যাতে লোকজন পথ চলতে পারে।" তারপর সে ঐ পাথরখন্ড ছুঁড়ে মারলো এবং তাতে জানোয়ারটা মারা গেল। আর লোকজন যে যার পথে চলে গেলো। তারপর সে দরবেশের কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালো। দরবেশ তাকে বললোঃ "প্রিয় বৎস! তুমি আজ আমার চেয়ে উত্তম হয়ে গেছ। তবে তুমি খুব শীঘ্রই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। যদি তুমি কোন পরীক্ষায় পড়ে যাও, তবে আমার সন্ধান দিও না।"

এরপর বালকটি এমন অলৌ কিক ক্ষমতার অধিকারী হলো যে, সে কেবল আল্লাহর কাছে দোয়া করা মাত্রই অন্ধ ও কুষ্ঠরোগী ভালো হয়ে যেতো এবং এভাবে অন্যান্য রোগেরও চিকিৎসা করতো।

রাজার পাত্রমিত্রদের একজন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে এই খবর শুনে বালকটার কাছে উপটৌ কন নিয়ে এসে বললোঃ তুমি আমাকে আরোগ্য দান করবে এই আশায় এ সব এনেছি। বালক বললোঃ আমি কাউকে আরোগ্য দান করি না। আল্লাহই আরোগ্য দান করেন। যদি তুমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো, তবে আমি দোয়া করবো। আশা করা যায় যে, তিনি আরোগ্য দান করবেন। সে তখন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো। আর আল্লাহ তৎক্ষণাত তাকে আরোগ্য দান করলেন। তারপর সে রাজ দরবারে ফিরে গিয়ে আগের মত নিজ দায়িত্বে নিয়োজিত হলো। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ "তোমার চোখ কে ফিরিয়ে দিল?" সে উত্তর দিলঃ "আমার প্রভু!" রাজা বললোঃ "আমি ছাড়া তোমার কোন প্রভু আছে না কি?" সে বললোঃ "আমার ও

তোমার সকলেরই প্রভু আল্লাহ।" এতে রাজা তাকে ধরে শাস্তি দিতে লাগলো। অবশেষে সে শাস্তি থেকে রেহাই পাবার আশার বালকের কথা বলে দিল। তখন বালকটিকে ধরে আনা হলো। রাজা তাকে বললোঃ হে প্রিয় বালক! তোমার যাদুবিদ্যার যথেষ্ট খ্যাতি ছড়িয়েছে। শুনেছি তুমি নাকি অন্ধ ও কুষ্ঠরোগী আরোগ্য করে থাকো এবং আরো বহু অলৌ কিক কর্মকান্ড করে থাকো। বালক বললোঃ আমি কাউকে আরোগ্য দান করি না। আরোগ্য দান তো আল্লাহই করেন। এ কথা শুনে রাজা তাকেও শাস্তি দিতে লাগলো।

অবশেষে বালকটি হযরত ঈসার শরীয়তপন্থী দরবেশের কথা বলে দিল। তখন দরবেশকে আনা হলো। তাকে তার ধর্ম ত্যাগ করতে বলা হলো। কিন্তু সে অস্বীকার করলো। তখন রাজা একখানি করাত আনিয়ে দরবেশের মাথার মাঝখান থেকে চেরাই করে দ্বিখন্ডিত করে ফেললো। তারপর আনা হলো রাজার সেই সভাসদকে। তাকেও তার ধর্ম ত্যাগ করতে বলা হলো। কিন্তু সে অস্বীকার করায় তাকেও করাত দিয়ে চিরে দু'টুকরো করে ফেলা হলো।

এরপর আনা হলো বালকটিকে। তাকেও তার ধর্ম ত্যাগ করতে বলা হলো। কিন্তু সে অস্বীকার করলো। তখন রাজা তাকে তার কতিপয় কর্মচারীর হাতে সমর্পন করে বললোঃ তোমরা তাকে পাহাড়ের চূড়ার ওপর নিয়ে যাও। তখন যদি সে তার ধর্ম ত্যাগ করে তবে তো ভালো কথা। নচেত তাকে সেখান থেকে ফেলে দিও।

লোকেরা বালকটাকে নিয়ে যেই পাহাড়ে উঠলো। বালক বললোঃ হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে চাও এদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দান কর। তখন পাহাড়টি এমন জোরে কেঁপে উঠলো যে, রাজার লোকেরা নীচে পড়ে মারা গেলো এবং বালক স্বচ্ছন্দে রাজার কাছে গিয়ে হাজির হলে। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ তোমার সঙ্গীরা কোথায়? সে বললোঃ তাদের ব্যাপারে আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। এতে রাজা অনুমান করতে পারলো যে, তার আর বেঁচে নেই।

এরপর রাজা তাকে আরেক দল কর্মচারীর হাতে সোপর্দ করে বললোঃ তোমরা এক একটি নৌ কায় তুলে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে যাও। তারপর সে যদি তার ধর্ম ত্যাগে রাজী না হয়, তবে তাকে সেখানে সমুদ্রের পানিতে ফেলে দেবে।

নৌ কা চললো মাঝ দরিয়া অভিমুখে। বালক আবার বললোঃ হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে চাও, তাদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও। এতে নৌ কা তাদেরকে নিয়ে ডুবে গেলো এবং ছেলেটি শান্তভাবে রাজার দরবারে হাজির

হলো। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ তোমার সঙ্গীরা কোথায়? সে বললোঃ তাদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করতে আল্লাহই যথেষ্ট হয়েছে।

এরপর সে রাজাকে বললোঃ আমি যেভাবে বলবো সেভাবে কাজ করলেই তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে। রাজা জিজ্ঞেস করলোঃ কিভাবে? সে বললোঃ একটি মাঠে জনগণকে সমবেত কর। তারপর আমাকে শূলে চড়াও। তারপর আমার তীরদানি থেকে একটি তীর নিয়ে ধনুকে জুড়ে দিয়ে বলঃ বালকটির প্রভু আল্লাহর নামে তীর মারছি। এরূপ করলে তুমি আমাকে মারতে পারবে।

রাজা তখন মাঠে লোক সমবেত করে বালককে শূলের ওপর বসালো। তারপর বালকের তীরদানি থেকে তীর নিয়ে ধনুকে জুড়ে দিয়ে বললোঃ 'বিছমিল্লাহি রাব্বিল গুলাম" অর্থাৎ বালকটার প্রভু আল্লাহর নামে তীর মারলাম। এই বলে তীর নিক্ষেপ করলো, বালকটি তাতে বিদ্ধ হলো ও মারা গেলো।

এ দৃশ্য দেখে জনতা সমস্বরে বলে উঠলোঃ এই বালক যে প্রভুর কথা বলে, সেই আল্লাহর ওপর আমরা ঈমান আনলাম। এ খবর পেয়ে রাজা ক্রোধে অধীর হয়ে উঠলো। তার পারিষদবর্গ তাকে বললোঃ যে আশংকা আপনার ছিল তাইতো ঘটে গেল। এখনতো দেশশুদ্ধ লোক ঈমান এনে ফেলেছে।

রাজা তখন রাস্তার পাশে দীর্ঘ গর্ত খোড়ার হুকুম দিল। গর্ত খোড়া হলে তাতে আগুন জ্বালানো হলো। রাজা বললোঃ যে ব্যক্তি তার ঈমান ত্যাগ করবে না তাকে ঐ আগুনে ফেলে দাও। যারা ইসলামের ওপর অবিচল রইল, তাদের সবাইকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে শহীদ করা হলো। এক সময় সন্তান কোলে নিয়ে এক মহিলা এলো। সে আগুনের মধ্যে যেতে ইতস্ততঃ করলে শিশুটি অলৌ কিকভাবে বাকশক্তি লাভ করলো এবং বললোঃ আম্মা! আপনি সবর করুন (অর্থাৎ আগুনে ঝাপ দিতে সংকোচ করবেন না)। কারণ আপনি তো সত্যের ওপরে আছেন। (মুসলিম শরীফ)

পর্যালোচনাঃ এই ঘটনাটিকে ইতিহাসে আসহাবুল উখদুদের ঘটনা বলা হয়। উখদুদ অর্থ আগুনের কুন্ডলী। পবিত্র কুরআনের সূরা আল বুরুজে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গীত দেয়া হয়েছে।

সাধারণ অবস্থায় নিজেকে হত্যা করতে কাউকে পরামর্শ দেয়া বা তার কৌ শল শিখিয়ে দেয়া আত্মহত্যার শামিল। আত্মহত্যা কখনো জায়েজ নয়। তবে আলোচ্য ঘটনায় বালকটি যে পরিস্থিতিতে এ কাজ করেছিল তা

স্বাভাবিক অবস্থার পর্যায়ে পড়ে না। তা ছাড়া সম্ভবতঃ সে আল্লাহর ইঙ্গীতে কাজ করেছিল, যা ওহী ব্যতীত ইলহামের মাধ্যমেও এসে থাকতে পারে। এমনও হতে পারে যে, এরূপ কৌশলে জীবন বিসর্জন দেয়ার ফলে সমগ্র দেশ ঈমান আনবে বলে বালক ধারণা করেছিল, বাস্তবেও তাই ঘটেছিল।

শিক্ষাঃ এ ঘটনাটির সবচেয়ে বড় শিক্ষা এই যে, প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির যে কোন সময় যে কোন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এমনকি যদি ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত হয় এবং তাতে কিছু সাফল্য ও বিজয় আসতে থাকে, তাহলেও প্রত্যেক সাফল্যের সাথে সাথে পরীক্ষার তীব্রতা ও কঠোরতা বেড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

দ্বিতীয় শিক্ষা এই যে, এক আল্লাহর প্রতি ঈমানই ছিল হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রকৃত শিক্ষা। তিনিও ইসলামের একজন নবী ছিলেন এবং ইসলামেরই দাওয়াত দিয়েছেন। পরবর্তীকালে তার অনুসারীরা তার আনিত ইসলামী শরীয়ত বিকৃত করে তার নাম রাখে খৃস্টবাদ এবং নিজেরা খৃস্টান নামে পরিচিত হয়। এই খৃস্টবাদ ও খৃস্টানদের সাথে হযরত ঈসার প্রকৃত শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই। আলোচ্য ঘটনায় উল্লেখিত দরবেশ, বালক ও অন্যান্য শহীদগণ ছিলেন হযরত ঈসার প্রকৃত অনুসারী ও খাঁটি মুসলমান- খৃস্টান নয়।

৭০। সততার এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ একবার এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট থেকে এক খন্ড জমি কিনলো। ক্রেতা তার কেনা জমিতে স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ একটি কলসী পেলো। সে তৎক্ষণাত ঐ জমির সাবেক মালিকের নিকট কলসীটি নিয়ে গেলো এবং বললোঃ "তোমার এই স্বর্ণ নিয়ে নাও, তোমার জমিতে এটি পাওয়া গেছে। আমি তো তোমার কাছ থেকে জমি কিনেছি। স্বর্ণ কিনিনি।" সাবেক জমিওয়ালা বললোঃ "না, ও স্বর্ণ তোমার। কেননা আমি ঐ জমিতে যেখানে যা কিছু আছে- সব শুদ্ধই বিক্রয় করেছি।" কিন্তু ক্রেতা কিছুতেই এ কথা মানতে রাজী হলো না।

অবশেষে উভয়েই তৃতীয় এক ব্যক্তির মধ্যস্ততা গ্রহণ করলো। তৃতীয় ব্যক্তিটি উভয়ের বক্তব্য শুনলেন। দেখলেন, উভয়ে নিজ নিজ বক্তব্যে অনড়। তখন বিরোধ মিটাবার কি উপায় করা যায় ভাবতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত একটি কৌশল তিনি উদ্ভাবন করে ফেললেন।

তিনি বিবাদমান লোক দু'টিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কোন সন্তান আছে কি? একজন জানালো তার একটি ছেলে আছে। অপরজন জানালো তার একটি মেয়ে আছে।

মধ্যস্তকারী বললেন, ঠিক আছে। এই স্বর্ণ তোমাদের কাউকেই নিতে হবে না। তোমরা তোমাদের ছেলে মেয়েকে পরস্পরে বিয়ে দাও। এই স্বর্ণ দিয়ে বিয়ের ব্যয় নির্বাহ কর এবং যা বেঁচে যায়, তা নব দম্পতিকে উপঢৌকন দাও।

উভয়ে এই রায় বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিলো। (বুখারী ও মুসলিম)

শিক্ষাঃ

(১) যে কোন বিরোধ বা বিতর্কের মীমাংসার জন্য নিরপেক্ষ তৃতীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মধ্যস্ততা গ্রহণ করা ইসলামী রীতি। এই তৃতীয় ব্যক্তি উভয় বিবাদমান পক্ষের সম্মতিক্রমে মনোনীত হবে এবং তার ফায়সালা মেনে নেয়া উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

(২) আলোচ্য ঘটনার বিবাদমান ব্যক্তিদ্বয় খোদাভীরুতার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। উভয়েই জমির ভেতরে প্রাপ্ত স্বর্ণ অপর পক্ষকে দেয়ার জন্য উদগ্রীব- নিজে নেয়ার জন্য নয়। একজন মুমিনের প্রকৃত চরিত্র এ রকমই হওয়া উচিত।

(৩) ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে বিক্রেতার বক্তব্যই সঠিক। কেননা জমি যখন বিক্রয় অথবা দানসূত্রে হস্তান্তরিত হয়, তখন বিক্রেতা বা দাতা ইচ্ছাপূর্বক কোন কিছু বাদ না দিলে ঐ জমির ওপরে বা অভ্যন্তরে যা-ই থাক্, সব সমেতই হস্তান্তরিত হবে। দাতা বা বিক্রেতা যদি কোন জিনিস দান বা বিক্রয় বহির্ভূত বলে ঘোষণা করে, তবে তা হস্তান্তরের আগেই অথবা যে সময়ের জন্য ক্রেতা বা গ্রহীতা অনুমতি দেয়, সে সময়ের মধ্যেই তা সরিয়ে নিতে হবে।

(৪) ছেলে বা মেয়ে বিয়ে দেয়ার জন্য কি ধরণের পরিবার ও কি ধরণের বর কনে খোঁজা দরকার, সে ব্যাপারেও এই কিস্‌সাটিতে চমৎকার শিক্ষা রয়েছে। একটি উন্নত মানের ইসলামী চরিত্র সম্পন্ন পরিবারের বর কনেই প্রত্যেক মুসলিম পরিবারের কাম্য হওয়া উচিত। পরিবারের ইসলামী ভাবধারা অক্ষুন্ন রাখার এটাই একমাত্র উপায়।

৭১। তওবার মহিমা

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্যে এক ব্যক্তি এক নাগাড়ে ৯৯ জনকে হত্যা করে। অতঃপর সে সৎপথে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। সে লোকজনের কাছে

দেশের সেরা আলেমের সন্ধান চায়। লোকেরা তাকে জনৈক দরবেশের সন্ধান দেয়। সে ঐ দরবেশের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে, আমি তো ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করেছি। এ পাপ থেকে আমার নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায় আছে কি? দরবেশ বললো, না। সে তৎক্ষণাত ঐ দরবেশকে হত্যা করে একশো পূর্ণ করলো। এরপর পুনরায় একজন ভালো আলেমের অনুসন্ধানে বেরুলো। এবার একজন আলেমের সন্ধান পেলো। তাকে সে জিজ্ঞাসা করলো, আমি তো একশো জন মানুষ হত্যা করেছি। আমার তওবার অবকাশ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তওবার পথে বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই। তবে তোমাকে নিজের গ্রাম ছাড়তে হবে। কারণ, ওটা খারাপ লোকদের বসতি। তুমি অমুক গ্রামে চলে যাও। সেখানে আল্লাহর অনুগত লোকেরা বাস করে। সেখানে গিয়ে তাদের সাথে তুমিও আল্লাহর আনুগত্যের পথ অবলম্বন কর।

লোকটি উক্ত আলেমের কথামত স্বগ্রাম ত্যাগ করে সৎলোকদের গ্রামের দিকে রওনা হলো। পথের মাঝামাঝি জায়গায় উপনীত হলে তার আয়ু শেষ হয়ে গেলো। তার কাছে দুই ধরনের ফেরেশতা হাজির হলো- রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতা। তারা পরস্পরে ঝগড়া করতে লাগলো রহমতের ফেরেশতারা বললো ঃ এই ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহর দিকে আন্তরিকভাবে প্রত্যাবর্তিত হয়েছিল। কাজেই এর প্রাণ আমরা গ্রহণ করবো। আযাবের ফেরেশতারা বললোঃ সে কখনো কোন সৎ কাজ করেনি। তাই ওর প্রাণ আমাদেরই প্রাপ্য। এই ঝগড়ার মীমাংসার জন্য সেখানে মানুষের আকৃতিতে একজন ফেরেশতা এলো। সে বললোঃ তোমরা ঝগড়া থামাও। দু'দিকের রাস্তা মেপে দেখো। কোনটা দীর্ঘতর। যে দিকের রাস্তা ক্ষুদ্রতর হবে, তাকে সেদিকের অধিবাসী ধরে নিতে হবে। অতঃপর রাস্তা মাপলে দেখা গেল, তার গন্তব্যস্থল সংলগ্ন রাস্তাই ক্ষুদ্রতর। তখন রহমতের ফেরেশতারা তার প্রাণ সংহার করলো।" (বুখারী, মুসিলম, ইবনে মাজা)

একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, সৎলোকদের গ্রামটি এক বিঘত পরিমাণ নিকটতর ছিল। অপর এক বর্ণনায় আছে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় আদেশ বলে সৎ লোকদের গ্রামটিকে নিকটতর করে দেন। আর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর ফেরেশতা আসার পরও সে হামাগুড়ি দিয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে কিঞ্চিৎ এগিয়ে যায়।

শিক্ষা ঃ এ কিসসাটিও অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। বিশেষতঃ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এ হাদীসের অন্যতম শিক্ষনীয় বলে বিবেচিত হতে পারেঃ

(১) মূর্খ দরবেশের চাইতে হকপন্থী আলেমই মানুষকে সৎপথের সন্ধান দিতে অধিকতর যোগ্য।

(২) কেউ যদি একনিষ্ঠ মনে ন্যায় পথে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তার পথ কেউ আটকাতে পারে না। আল্লাহ্ স্বয়ং তাকে সাহায্য করেন।

(৩) সৎ হবার জন্য সৎ লোকদের সংসর্গ অবলম্বন ও অসৎ লোকদের সাহচর্য বর্জন অপরিহার্য। এ জন্য প্রয়োজনে নিজের জন্মভূমি থেকে হিজরত করা কর্তব্য। আর হিজরত করা যেখানে সম্ভব নয় কিংবা হিজরত করে যথার্থ সৎলোকের সংসর্গ পাওয়া যাবে এমন নিশ্চয়তা নেই, সেখানে একমাত্র বিকল্প কর্মপন্থা হলো, আশপাশের মানুষকে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করে ইসলামী পরিবেশ গড়ে তোলার দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচী নিয়ে কাজ শুরু করে দেয়া। আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎ লোক ও সৎ পরিবেশ তৈরীর তওফিক দিন। আমীন।

৭২। আল্লাহর পথে দানের মাহাত্ম্য

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ একবার এক ব্যক্তি ক্ষেতে কাজ করার সময় মেঘের ভেতরে আওয়াজ শুনতে পেলঃ "হে মেঘ! অমুকের ক্ষেতে পানি দাও।" এ কথার পর মেঘখানা এক দিকে চলতে শুরু করলো। ঐ লোকটিও মেঘের সাথে সাথে চলতে লাগলো।

বেশ কিছু পথ অতিক্রম করার পর সে দেখতে পেল, একটি বাগানের ওপর ঐ মেঘখানি গিয়ে থামলো এবং মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করলো। অথচ তার আশপাশের অন্যান্য ক্ষেতখামারে এক ফোঁটা বৃষ্টিও হলো না।

বৃষ্টির শেষে লোকটি ঐ বাগানে ঢুকলো। দেখলো, বাগানের ভেতরে এক প্রৌঢ় কৃষক বৃষ্টির পানি বিভিন্ন গাছের গোড়ায় পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করলোঃ জনাব, আপনার নাম কি? কৃষক যখন তার নাম বললো, তখন সে দেখলো, মেঘের ভেতরে যে নামটি উচ্চারিত হয়েছিল, তার সাথে এ নামটি হু-ব-হু মিলে যাচ্ছে। অতঃপর কৃষক আগুন্তককে জিজ্ঞাসা করলো, "আপনি কি জন্য আমার নাম জানতে চাইছেন?" আগন্তুক বললোঃ "যে মেঘ থেকে এই মাত্র বৃষ্টি বর্ষিত হলো, সেখানে আপনার নাম ধরে বলা হচ্ছিল আপনার বাগানে বৃষ্টি বর্ষাতে। আমি জানতে চাই আপনি এমন কি মহৎ কাজ করেন, যার জন্য আপনার প্রতি আল্লাহর এমন অলৌকিক অনুগ্রহ।"

কৃষক বললোঃ "আমি ফসল ঘরে তোলার পর তাকে তিন ভাগ করি। এক ভাগ প্রথমেই আল্লাহর পথে দান করি। অপর এক ভাগ বীজ হিসাবে

সংরক্ষণ করি। আর তৃতীয় ভাগ নিজে সপরিবারে ভোগ করি।" (মুসলিম শরীফ, তারগীব ও তারহীব)

শিক্ষাঃ

(১) এ ঘটনাটি থেকে জানা যায় যে, নিজের যাবতীয় প্রয়োজন পুরনের পর অবশিষ্ট অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করা নয় বরং উপার্জিত সম্পদের একটি অংশ প্রথমেই আল্লাহর পথে দান করা এবং তারপর বাদ বাকী অংশ দিয়ে নিজের প্রয়োজন পুরন করাই ইসলামী রীতি। কেননা এতে অনেক সময় আদৌ কোন অবশিষ্ট নাও থাকতে পারে। প্রথমে আল্লাহর পথে দাতব্য অংশটি নির্দ্ধারণ বা দান করার অর্থ দাঁড়ায় সমুদয় পার্থিব চাহিদা ও প্রয়োজনের ওপর আল্লাহর দ্বীনের ও তার দরিদ্র বান্দাদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়া। এতে আল্লাহ সর্বাধিক পরিমাণে খুশী হন এবং যে বান্দা এরূপ নীতি অবলম্বন করে তার জীবিকা বৃদ্ধি নিশ্চিত করেন।

(২) এ ঘটনাটি থেকে এ কথাও জানা গেল যে, সাধারণ কৃষক শ্রমিক ও মুটে মজুর শ্রেণীর লোককে অবজ্ঞা করা কোন অবস্থাতেই উচিত নয়। এ ধরণের নগন্য লোকেরা অতি সহজেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও তাঁর ওলীর মর্যাদায় উপনীত হতে পারে। যদিও তাদের বেশভূষা ও চালচলনে তেমন কোন লক্ষণ সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে না এবং তারা সমাজের মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী লোকদের দৃষ্টিতে উপেক্ষিতই থাকে। নিজের উপার্জনে আল্লাহর বঞ্চিত দরিদ্র বান্দাদের অংশ রয়েছে- এ কথা যারা ভুলে যায় না বরং সেই অংশটি সবার আগে আলাদা করে ও দান করে, তারা যথার্থই আল্লাহর ওলী তথা প্রিয় বান্দা-চাই তারা যেখানে যে পরিচয়েই বাস করুক না কেন।

৭৩। নিজের ক্ষতি স্বীকার করে পরোপকার

রাসূল (সাঃ) বলেনঃ প্রাচীনকালে একবার দুই ব্যক্তি একসাথে সফরে বেরুলো। এদের একজন সব সময় আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকতে পছন্দ করতো। অপরজন ছিল আল্লাহর হুকুম পালনে উদাসীন। পথিমধ্যে এক সময় প্রথমোক্ত ব্যক্তি পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লো। ক্রমে সে বেহুশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি মনে মনে বললো, "এই সৎ ও খোদাভীরু লোকটি যদি পিপাসায় মারা যায় এবং আমার কাছে পানি থাকা সত্ত্বেও যদি তাকে না খাওয়াই, তা হলে আল্লাহর আক্রোশ থেকে আমি কোন ক্রমেই রক্ষা পাবো না। পক্ষান্তরে তাকে পানি খাওয়ালে পরবর্তীতে আমি নিজে পিপাসায় মারা যাবো। এখন তা হলে কি করা?"

কয়েক মূহুর্ত ভেবেচিন্তে সে আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাকে কয়েক ফোঁটা পানি খাইয়ে দিল এবং নিজের জন্যও কিছু সঞ্চিত রাখলো। এভাবে এক সময় তাদের একত্রে সফরের পালা শেষ হলো।

এই দুই ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রথম ব্যক্তিকে জান্নাত ও দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জাহান্নামের অধিবাসী বলে ঘোষণা করা হলো। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে যখন ফেরেশতারা জাহান্নামে নিয়ে যেতে আরম্ভ করলো, তখন সহসা প্রথম ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাত হলো। সে ঐ ব্যক্তিকে চিনতে পেরে বললোঃ "ওহে আল্লাহর প্রিয় বান্দা। তুমি কি আমাকে চিন?" সে বললোঃ "তুমি কে?" তখন সে বললোঃ "আমি অমুক। এক বিপদের দিনে আমরা মিলিত হয়েছিলাম এবং তোমাকে আমি অগ্রাধিকার দিয়ে পানি খাইয়ে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করেছিলাম।" তখন ঘটনাটা প্রথম ব্যক্তির মনে পড়লো এবং দোজখের ফেরেশতাকে থামতে বললো। অতঃপর সে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে তাকে সাথে নিয়ে বেহেশতে চলে গেলো। (তাবরানী, বায়হাকী)

শিক্ষাঃ

(১) হাদিসটির পয়লা শিক্ষা এই যে, কোন বিপন্ন বা মুমূর্ষ মানুষকে দেখলে তাকে সাহায্য করা ও তার প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করা কর্তব্য। বিশেষতঃ কোন ধার্মিক ও সৎ ব্যক্তি যদি বিপদগ্রস্থ হয় তবে নিজের কিছু কষ্ট হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত।

(২) দ্বিতীয়তঃ কাউকে বিপদগ্রস্ত বা মৃত্যুর সম্মুখীন দেখলে নিজের যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তাকে সাহায্য করা ঠিক নয়। নিজের জন্য যতটুকু একান্ত প্রয়োজন, তা রেখে অন্যকে দিতে হবে। শেষ কপর্দক বিলিয়ে দিয়ে নিজেকে অন্যের মুখাপেক্ষী বানানো উচিত নয়।

(৩) সফরসংগীকে সব সময় অগ্রাধিকার দিয়ে খিদমত করার চেষ্টা করা উচিত। বিশেষতঃ সফরসংগী যদি অপেক্ষাকৃত অভাবী সৎ ব্যক্তি হয়, তবে তার দিকে আরো বেশী খেয়াল রাখা কর্তব্য।

৭৪। ওয়াদামত ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব

রাসুল (সাঃ) বলেনঃ একবার বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি একই গোত্রের জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট এক হাজার দিনার ধার চাইলো। ধনাঢ্য লোকটি তাকে বললোঃ "ঠিক আছে। আমি ধার দিতে প্রস্তুত। তবে কয়েকজন সাক্ষী নিয়ে এসো। তাদেরকে সাক্ষী রেখে আমি তোমাকে ধার দেবো।" ধার প্রার্থী বললোঃ "সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।"

ধনাঢ্য ব্যক্তি তখন বললোঃ "তাহলে এমন একজন লোক নিয়ে এসো, যে এই ঋণের জন্য জামিন থাকবে।" লোকটি এবারও বললোঃ "জামিন হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।" তখন ধনাঢ্য লোকটি বললোঃ "তুমি সত্য কথাই বলেছ।"

অতঃপর সে তাকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এক হাজার দিনার ধার দিলো।

লোকটি এই ঋণ নিয়ে সমুদ্র ভ্রমণে বেরিয়ে গেলো এবং নিজের প্রয়োজন পূরণ করলো। অতঃপর দেশে ফিরে আসার জন্য জাহাজের সন্ধান করতে লাগলো, যাতে নির্দ্ধারিত দিনে সে ঐ ঋণ পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সে কোন জাহাজ ধরতে পারলো না। অগত্যা সে একখানা কাঠের টুকরো ছিদ্র করে তার ভেতরে এক হাজার দিনার ও ঋণ দাতার উদ্দেশ্যে লেখা একখানা চিঠি ঢুকিয়ে তা শিশা গালিয়ে বন্ধ করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলো।

অতঃপর সে আল্লাহর নিকট কাকুতি মিনতি সহকারে দোয়া করলোঃ "হে আল্লাহ! তুমি তো জান, অমুকের নিকট থেকে আমি এক হাজার দিনার ধার নিয়েছিলাম। সে সাক্ষী চাইলে আমি বললাম, সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। অতঃপর সে জামিন চাইলে আমি বললাম, জামিন হিসাবে আল্লাহ যথেষ্ট। সে সাক্ষী ও জামিন হিসাবে তোমাকে পেয়েই সন্তুষ্ট হয়েছিল। আমি যথাসময়ে তার ঋণ পরিশোধের জন্য সামুদ্রিক যান সন্ধানে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। কিন্তু সক্ষম হইনি। তাই এই এক হাজার দিনার আমি তোমার নিকট সোপর্দ করছি।" এই বলেই সে ঐ কাষ্ঠখন্ড সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো। এরপরও সে জাহাজের সন্ধানে ব্যাপৃত রইলো।

ওদিকে ঋণদাতা নির্দ্ধারিত দিনে সমুদ্রতীরে এসে অপেক্ষা করতে লাগলো। ভাবলো, হয়তো তার খাতক কোন জাহাজে করে ফিরে আসবে এবং তাকে ঋণ পরিশোধ করবে। কিন্তু দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও কোন জাহাজ কিনারে ভিড়তে দেখলো না। সে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে উদ্যত হলো। সহসা দেখলো, এক টুকরো কাঠ ভাসতে ভাসতে এসে কিনারে আসলো। লোকটি ঐ কাঠের টুকরোটি জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বাড়ীতে নিয়ে গেলো। বাড়ীতে নিয়ে যেই কাঠখানি চেরাই করলো, অমনি তার ভেতর থেকে চিঠি ও এক হাজার দিনার বেরিয়ে পড়লো।

কয়েকদিন পরই খাতক এসে হাজির। সে পৃথকভাবে তাকে এক হাজার দিনার দিলো। কারণ সে ভেবেছিল সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া কাঠের টুকরো তার মহাজন পায়নি। এমনকি ব্যাপারটা তাকে জিজ্ঞাসা করতেও সে সংকোচ

বোধ করলো। এক হাজার দিনার হাতে গুঁজে দিয়ে সে বিলম্বের জন্য ওজর পেশ করতে ও ক্ষমা চাইতে লাগলো। বললো, সময়মত সামুদ্রিক যান না পাওয়ার কারণেই তার এই বিলম্ব হয়েছে।

মহাজন বললোঃ "আচ্ছা, তুমি কি আমার কাছে কোন জিনিস পঠিয়েছ?"

সে বললোঃ "আমি আপনার নিকট ওজর পেশ করছি যে, সময়মত জাহাজ ধরতে না পেরে আমার বিলম্ব হয়েছে।"

মহাজন বললোঃ "তাহলে শোনো! তুমি কাঠের টুকরোতে করে যা পাঠিয়েছ, তা আল্লাহ আমার কাছে পৌ ছে দিয়েছেন। এই এক হাজার দিনার আমার প্রয়োজন নেই। এটা তুমি নিয়ে যাও।" (বুখারী, নাসায়ী)

শিক্ষাঃ

(১) ওয়াদামত ঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়াই করে শহীদ হয়, তার সকল গুনাহ আল্লাহ মাফ করলেও ঋণ মাফ করেন না। কারণ ওটা বান্দার হক।

(২) যে কোন ব্যাপারে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা সত্ত্বেও যথাসাধ্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা কর্তব্য।

(৩) ঋণের আদান-প্রদান কালে সাক্ষী বা জামিন রাখা অথবা লিখিত দলিল স্বাক্ষর করা শরীয়তে দৃষ্টিতে বাদ্যতামূলক। তবে পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়তে এ ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা ছিল না। কুরআনের সূরা বাকারায় এ ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে, যাতে কোন বিতর্কের সৃষ্টি না হয়।

(৪) কোন ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য বা জামিন হাজির করতে অক্ষম হয় এবং আল্লাহকে সাক্ষী ও জামিন রাখে, তবে তাকে বিশ্বাস করে ঋণ দিয়ে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা উত্তম। মনে রাখতে হবে, সুদ-বিহীন ঋণ প্রদান ক্ষেত্র বিশেষে দান করার চেয়েও বেশী সওয়াবের কাজ। কেননা এটা সাধারণতঃ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধারে সহায়তা করে। দানশীল ব্যক্তি সাধারণতঃ নিজের ইচ্ছা অনুসারে উদ্বৃত্ত সম্পদ থেকে দান করে থাকে। কিন্তু ঋণদাতা বিপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য নিজের অত্যাবশ্যকীয় সম্পদ থেকেও ঋণ দিয়ে থাকে।

৭৫। অপাত্রে দান

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ একবার এক ব্যক্তি শপথ করলো যে, আজ রাতে কিছু ছদকা না করে সে ঘুমাবে না। অতঃপর ছদকার অর্থ নিয়ে

রাস্তায় বেরুলো। যে ব্যক্তিকে সে ছদকা দিল, সে ছিল একজন চোর। লোকটি তাকে চিনতো না। যখন ব্যাপারটা জানাজানি হলো, তখন লোকে তাকে উপহাস করলো যে, একটা চোরকে সে ছদকা দিয়েছে। কিন্তু সে কিছুমাত্র হতোদ্যম হলো না। বরং আল্লাহর শোকর আদায় করলো।

পরের দিন পুনরায় শপথ করলো যে, রাতে কিছু ছদকা না নিয়ে সে ঘুমাবে না। কিন্তু আজও তার অজান্তে ছদকা গিয়ে পড়লো এক ব্যাভিচারীর হাতে। এবারও তাকে বিদ্রুপ শুনতে হলো এবং সে যথারীতি আল্লাহর শোকর আদায় করলো।

তৃতীয় দিনেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। আজ তার ছদকা জুটলো এক ধনী ব্যক্তির কপালে। আজও তাকে উপহাসে জর্জরিত করা হলো। কিন্তু সে আল্লাহর শোকর আদায় করলো।

এই লোকটি কিছু দিন পর মারা গেলে ফেরেশতারা তাকে জানালেন যে, তার সকল ছদকাই কবুল হয়েছে। চোরকে দেয়া ছদকা এই জন্য কবুল হয়েছে যে, এ ছদকা পাওয়ার পর তার চুরির অভ্যাস ত্যাগ করার আশা করা যায়। ব্যভিচারীরও শুধরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর ধনী ব্যক্তি ছদকা পেয়ে লজ্জিত হয়ে নিজে ছদকার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী)

শিক্ষা ঃ দান ছদকা না জেনে অপাত্রে দিলেও তা বৃথা যায় না। তবে জেনে শুনে উপযুক্ত ও অভাবী ব্যক্তিকে দেওয়াই উত্তম। কোন অপরাধী যদি ছদকা পেলে শুধরে যাবে বলে আশা করা যায়, তবে তাকে ছদকা দেয়া যাবে।

৭৬। অন্যায়ের প্রতিরোধ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ একবার আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা জিবরীলকে আদেশ দিলেন যে, "যাও, অমুক জনপদটি ধ্বংস করে দিয়ে এসো।" জিবরীল সেই জনপদটিতে গিয়েই দেখলেন, সেখানে একজন দরবেশ রয়েছেন, দিনরাত তিনি নামায পড়েন ও যিকির তাসবীহ করেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি আল্লাহকে বললেন, "হে আল্লাহ! এখানে তোমার এক বান্দা রয়েছেন যিনি সর্বক্ষণ তোমাকে স্মরণ করছেন।"

আল্লাহ জবাবে বললেনঃ তাকে শুদ্ধই ধ্বংস করে দাও। কেননা তার সামনে ইসলামের অবমাননা হয়, নাফরমানী করা হয়, জুলুমবাজী ও পাপাচারের সয়লাব বয়ে যায়। কিন্তু তার মুখমন্ডলে তাতে কোন বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে না এবং তার মন কিছুমাত্র অস্থির হয় না।

অতঃপর জিবরীল সেই জনপদটি ধ্বংস করে দেন।

শিক্ষা ঃ

অন্যায়, অত্যাচার ও পাপাচারের প্রতিরোধে যার যেটুকু ক্ষমতা থাকে, সে অনুসারে অবদান রাখা কর্তব্য। কর্তব্য পালন না করে কেবল নফল নামায ও যিকির ইত্যাদিতে ব্যাপৃত থাকলে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। এক হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ কোন অন্যায় কাজ সংগঠিত হতে থাকলে সর্বশক্তি দিয়ে তা ঠেকাও, তা যদি না পারো তবে মুখ দিয়ে সদুপদেশ দাও, তাও যদি না পারো তবে মনে তাকে ঘৃণা ও অপছন্দ কর এবং কিভাবে তা বন্ধ করা যায় তা চিন্তা করতে থাকো। শেষোক্ত পন্থা হলো সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।

৭৭। তিনজন মুসাফির

হযরত উমার (রাজিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্য থেকে তিন ব্যক্তি একবার সফরে বেরুলো। পথ চলতে চলতে এক জায়গায় রাত হলে তারা একটি পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিল। গুহার ভেতরে প্রবেশ করা মাত্রই পর্বতের ওপর থেকে একটি প্রকান্ড পাথর গড়িয়ে পড়লো এবং যে গুহায় তারা আশ্রয় নিয়েছিল তার মুখ ঐ পাথরে চাপা পড়ে বন্ধ হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে ঐ তিন ব্যক্তি পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, এত বড় পাথরের অবরোধ থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের একটি মাত্র উপায় আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অতীত জীবনের কৃত সৎ কর্মসমূহের দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে মুক্তি চাইবো।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক এক ব্যক্তি নিম্নরূপ দোয়া করলোঃ "হে আল্লাহ! আমার পিতামাতা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদের আগে আমি নিজ পরিবার পরিজনের আর কাউকে রাতের খাবার খাওয়াতাম না। একদিন জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে আমার বাড়ী ফিরতে দেরী হয়ে যায়। বাড়ী ফিরে দেখি, তারা উভয়ে ঘুমিয়ে গেছেন। আমি তাদের রাতের খাওয়ার জন্য দুধ দুইয়ে আনলাম। কিন্তু দেখলাম, তারা তখনো ঘুমিয়ে। পিতামাতার খাওয়ার আগে আমার বা আমার পরিবারের লোকদের খাওয়া আমি সমিচীন মনে করলাম না। তারা কখন জেগে ওঠেন, তার অপেক্ষায় আমি সারা রাত দুধের পাত্র হাতে নিয়ে বসে রইলাম। আমার ছেলে মেয়েরা ক্ষুধার যন্ত্রনায় আমার পায়ের ওপর গড়াগড়ি খেয়ে কান্নাকাটি করছিল। কিন্তু আমি তাতেও বিচলিত হইনি। ভোর হয়ে গেলে পিতামাতা জেগে উঠলেন এবং দুধ খেয়ে নিলেন। হে

আল্লাহ! এ কাজটি আমি যদি তোমাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করে থাকি, তাহলে এই পাথরের অবরোধ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর।"

এ পর্যন্ত বলা মাত্রই পাথরটা খানিকটা সরে দাঁড়ালো। তবে সেটুকু তাদের বেরিয়ে আসার জন্য যথেষ্ট ছিল না।

রাসূল (সাঃ) বললেনঃ এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এভাবে দোয়া করতে লাগলো। "হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। আমি তাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতাম। কিন্তু সে আমাকে তেমন ভালোবাসতো না। অবশেষে একদিন দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে সে আমার কাছে সাহায্য চাইতে এলো। সুযোগ বুঝে এবার আমি তার কাছে পুনরায় ভালোবাসা নিবেদন করলাম এবং একশো বিশ দীনার দিলাম। সে আমার সাহায্য গ্রহণ করলো তবে সেই সাথে আমাকে কঠোরভাবে সাবধান করে দিল যে, তার ব্যাপারে আমি শরীয়তের পর্দার বিধান লংঘন না করি। আমি তার সতর্কবাণী মেনে নেই এবং তাকে যে সাহায্য দিয়েছিলাম তার দাবীও পরিত্যাগ করি। হে আল্লাহ! আমি এ সংযম যদি তোমার ভয়েই অবলম্বন করে থাকি তবে আমাদেরকে এই অবরোধ অবস্থা থেকে মুক্ত কর।"

এ কথা বলার সঙ্গে বিশাল পাথরখানি আরো একটু সরে দাঁড়ালো। কিন্তু তখনো বেরুবার পথ সুগম হয়নি।

রাসূল (সাঃ) বললেন, এরপর তৃতীয় ব্যক্তি বলতে আরম্ভ করলোঃ "হে আল্লাহ! আমি এক সময় কয়েকজন শ্রমিক নিয়োগ করি। কাজের শেষে তাদের একজন বাদে সকলের পারিশ্রমিক দিয়ে দেই। এই লোকটি নিজের পারিশ্রমিক না নিয়েই চলে যায়। অতঃপর আমি তার প্রাপ্য অর্থকে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করি। কালক্রমে তা থেকে প্রচুর সম্পদ উৎপন্ন হয়।" কিছুকাল পরে সে আমার কাছে আসে এবং তার প্রাপ্য পারিশ্রমিক চায়। আমি তাকে বললামঃ তুমি যে বিপুল সংখ্যক গরু, ছাগল ও উট দেখতে পাচ্ছ, এ সবই তোমার পারিশ্রমিক।" সে বললোঃ "দোহাই আল্লাহর! আমার সাথে তামাশা করবেন না।" আমি বললামঃ "মোটেই তামাশা নয়।" অতঃপর তাকে বুঝিয়ে বললে সে সানন্দে গ্রহণ করলো এবং ওগুলোকে হাকিয়ে নিয়ে চলে গেল। হে আল্লাহ! আমি এই কাজটি যদি তোমাকে খুশী করার জন্যই করে থাকি, তাহলে আমরা যে দুর্বিসহ অবস্থায় পড়েছি তা থেকে নিষ্কৃতি দাও।"

এ পর্যন্ত বলার সঙ্গে পাথরটি গুহার মুখ থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে গেল। অতঃপর আল্লাহর ঐ তিন বান্দা গুহা থেকে বেরিয়ে গন্তব্য স্থানের দিকে রওনা হলো। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী)

শিক্ষা ঃ হাদীসের কিস্‌সাটি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। বিশেষতঃ নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোকে এর অন্যতম প্রধান শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করা যায়ঃ

১. নিজের কৃত কোন সৎ কর্মের জন্য গর্ববোধ বা অহংকার প্রকাশ করা যদিও অন্যায়, কিন্তু কোন ভালো কাজ করতে পারা এবং খারাপ কাজ পরিহার করতে পারাকে নিজের সৌ ভাগ্য ও আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করে সন্তোষ ও তৃপ্তি বোধ করা এবং আল্লাহর শোকর করা মহত্ত্বের পরিচায়ক। এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ "ভালো কাজ করতে পেরে আনন্দ বোধ করা ও খারাপ কাজ করে অনুতপ্ত হওয়া ঈমানে লক্ষণ।" আর এ ধরনের কোন নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ সৎকর্ম যদি নিজের অতীত জীবনে থেকে থাকে, তবে তার দোহাই দিয়ে দোয়াও করা যায় এবং সে দোয়া কবুল হওয়ার আশাও করা যায়।

২. পিতামাতার খিদমত, পরোপকার ও খোদাভীতি মানুষকে আখেরাতের কল্যাণের পাশাপাশি বহুবিধ পার্থিব বিপদ মুসিবত থেকেও উদ্ধার করে থাকে।

৩. পিতামাতার অধিকার স্ত্রী ও সন্তানদের অধিকারের ওপর অগ্রগন্য। বিশেষতঃ পিতামাতা বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব উপার্জনক্ষম সন্তানদের।

৪. শ্রমিক মালিক সম্পর্কের একটি চমকপ্রদ নমুনা এ হাদীসে তুলে ধরা হয়েছে। মালিকের নিকট শ্রমিকের কোন পাওনা গচ্ছিত থাকলে তা হারাম উপায়ে নয় বরং হালাল পন্থায় লাভজনক ব্যবসায়ে খাটিয়ে যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে ফেরত দেওয়া বাধ্যতামূলক না হলেও মহৎ কাজ। আর না হোক, চাওয়া মাত্র তালবাহানা না করে আসল পাওনা সম্পূর্ণরূপে ফেরত দেয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রমিকের উৎপাদনের লভ্যাংশে শরীক করার প্রতি উৎসাহ প্রদানও এ হাদীসের অন্যতম লক্ষ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

৫. বিপন্ন মানুষকে, বিশেষত নারীকে তার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে স্বার্থোদ্ধারের মানসে কোন সাহায্য করা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ধরনের শোষণ ও ঘৃণ্য মানসিকতার পরিচায়ক।

৬. শত বিপদাপদ ও নির্যাতনের ভেতরেও জুলুমকারীকে সদুপদেশ দান, সতর্ক করা ও খোদাভীতির শিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হওয়া চাইনা। মুসলিম নারী ক্রীতদাসী হয়েও স্বীয় জালেম ও অমুসলিম মনিবকে ক্রমাগত সদুপদেশ দিতে দিতে নিষ্ঠাবান মুসলিমে পরিণত করেছে- এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। আলোচ্য হাদীসটিতেও এক দুর্ভিক্ষপীড়িত মুসলিম রমণীর সততা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সতীত্ব লক্ষণীয়।

৭. সর্বাবস্থায় পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা ও আল্লাহর সাহায্য কামনা করা কর্তব্য। যেমন আল্লাহর ঐ তিন বান্দা করেছিলেন।

৭৮। লুকমান হাকীমের কিস্‌সা

হযরত লুকমান হাকীম হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের সমসাময়িক একজন অত্যন্ত জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি ছিলেন। পবিত্র কুরআনে তাঁর নাম উল্লেখ করতঃ তাঁর কতিপয় উপদেশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। নবী না হয়েও কুরআনে তাঁর মত এত গুরুত্ব আর কোন ব্যক্তি পাননি। নবী বা রাসূল না হওয়া সত্ত্বেও তার কথাবার্তা ও আচরণে নবীসুলভ বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা ও সততা প্রতিফলিত হতো। এজন্য তিনি লুকমান হাকীম নামে পরিচিত ছিলেন।

হযরত লুকমানের জন্মস্থান বা বংশ পরিচয় সংক্রান্ত কোন তথ্য নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে তাঁর সম্পর্কে শুধু নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ জানা যায়ঃ

প্রথম জীবনে তিনি সিরিয়ার এক ধনবান ব্যক্তির অধীনে গোলামীর জীবন যাপন করেন। তারপর তার মধ্যে অসাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে তাঁর মনিব তাকে মুক্ত করে দেয়।

গোলামী জীবনের পূর্বে তিনি মেষ রাখাল ছিলেন বলে জানা যায়। সেই সময় তাঁর সমবয়সী আর এক রাখালও তাঁর সাথে মেষ চরাতো। তাঁদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল।

পরবর্তীকালে যখন হযরত লুকমান একজন হাকীম অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তখন তাঁর সেই বাল্য বন্ধুটি একদিন তাঁকে একটি বিরাট জনসমাবেশে ওয়ায নসিহত করতে দেখে। সে সমাবেশ শেষে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কি সেই ব্যক্তি নও, যার সাথে আমি মাঠে বকরী চরাতাম। হযরত লুকমান বললেন, তা তুমি আমাকে ঠিকই চিনেছ। আমি বাল্যকালে বকরী চরাতাম। সে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি এই মর্যাদা কিভাবে অর্জন করলে? তিনি বললেনঃ আমি চারটি স্বভাব দ্বারা এই মর্যাদা লাভ করেছিঃ (১) কখনো হারাম সম্পদ উপার্জন করিনি। (২) কখনো মিথ্যা বলিনি। (৩) কখনো আমানতের খেয়ানত করিনি। (৪) কখনো সময়ের অপচয় করিনি।

অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা প্রসূত ও জ্ঞানদীপ্ত কথা ও কর্মকান্ডকে হিকমত বলা হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে ও বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতে হযরত লুকমানের যে সব হিকমত বর্ণিত হয়েছে, তার কিছু কিছু নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছেঃ

○ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হিকমতের বাণীঃ

● নিজ পুত্রকে প্রদত্ত উপদেশাবলী

১. হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। আল্লাহর সাথে শরীক করা একটা মারাত্মক জুলুম।

২. হে বৎস! তুমি যদি একটি তিলেরমত ক্ষুদ্র আকার ধারণ কর, অতঃপর কোন পাথরের অভ্যন্তরে অথবা আকাশের ওপরে অথবা ভূগর্ভে আত্মগোপন কর, তবুও আল্লাহ সেখান থেকে তোমাকে বের করবেন।

৩. হে বৎস! তুমি নামায কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ কর এবং এই পথে যে বিপদ আপদের সম্মুখীন হও, তাতে ধৈর্য ধারণ কর।

৪. মানুষের সাথে আচরণের সময় মুখ বিকৃত করো না এবং পৃথিবীতে অহংকারের সাথে চলাফেরা করো না। ধীরস্থিরভাবে চলাফেরা কর এবং অনুচ্চ কণ্ঠে কথা বল।

○ রেওয়ায়েত থেকে প্রাপ্ত হিকমতের বিবরণঃ

১. হযরত লুকমান যখন গোলামীর জীবন যাপন করতেন, তখন একই মনিবের অধীন তার সাথে আরো একটি গোলাম কর্মরত ছিল। একবার সেই গোলামটি মনিবের কোন খাদ্যদ্রব্য চুরি করে খেয়ে ফেলে। মনিব উভয়কে দোষারোপ করেন। এতে হযরত লুকমান ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। কিভাবে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন, তা নিয়ে ভাবতে লাগলেন। অতঃপর মনিবকে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি আমাদের দু'জনকে গরম পানি খাইয়ে দিন। এতে উভয়ের বমি হবে এবং যে প্রকৃত চোর, তার পেট থেকে বমির সাথে ভক্ষিত জিনিসের অংশ বেরিয়ে পড়বে। মনিব তার পরামর্শ মত কাজ করলেন এবং হযরত লুকমান নির্দোষ সাব্যস্ত হলেন।

এই ঘটনা থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কোন মিথ্যা অপবাদ মাথায় নিয়ে কারো চুপ করে বসে থাকা উচিত নয়। তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রতিবাদ করা উচিত এবং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করা উচিত।

২. একবার হযরত লুকমানের মনিব তার বন্ধুর সাথে পাশা খেলে হেরে যায়। খেলার যে বাজী পূর্বাহ্নে নির্দ্ধারিত হয়েছিল, সে অনুসারে হয় তাকে তার সমস্ত সম্পদ বিজয়ী বন্ধুকে দিতে হবে নতুবা পার্শ্ববর্তী নদীর সমস্ত পানি তাকে খেয়ে ফেরতে হবে। খেলায় হেরে যাওয়ার পর বন্ধুটি তার মনিবকে এই দুটি শর্তের একটি অবিলম্বে পালন করার জন্য চাপ দিতে লাগলো। মনিব অতিকষ্টে তার বন্ধুর কাছে একদিন সময় নিয়ে বাড়িতে চলে এল এবং

লুকমানকে সমস্ত বিষয় খুলে বললো। লুকমান একটু চিন্তা করেই তাকে বললেনঃ আপনি আপনার বন্ধুকে এক কানাকড়িও দেবেন না। বরং নদীর পানি খেয়ে ফেলার শর্তটাই পালন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন। তবে তাকে বলবেন, প্রথমে সে যেন নদীর দু'পাশে বাঁধ দিয়ে দেয়। তা না হলে এক দিক দিয়ে পানি খেয়ে ফেললে অন্য দিক থেকে নদীতে আরো পানি ঢুকে পড়বে। হযরত লুকমানের শিখানো এই বুদ্ধিতে তাঁর মনিব বিপদ থেকে রক্ষা পেল এবং তার বন্ধু অবৈধভাবে বন্ধুর অর্থ আত্মসাতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো। এতে খুশী হয়ে মনিব তাকে মুক্তি দিলেন।

এই ঘটনা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানুষকে অন্যের জুলুম ও শোষণ থেকে বাঁচানোর জন্য যেখানে শক্তি প্রয়োগের পথ বন্ধ, সেখানে কৌ শল প্রয়োগ করতে হবে।

৩. আর একদিন হযরত লুকমান হাকীমের মনিব তাঁকে আদেশ দিল যে, আমার জন্য একটি বকরী যবাই করে তার দেহের সর্বোত্তম অংশ রান্না করে নিয়ে এস। হযরত লুকমান বকরীর হৃদপিন্ড ও জিহ্বা রান্না করে আনলেন। পরদিন মনিব আবার নির্দেশ দিলেন বকরীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট অংশ রান্না করতে। লুকমান আবারও জিহ্বা ও হৃদপিন্ড রান্না করে খাওয়ালেন। মনিব জিজ্ঞাসা করলোঃ কি হে লুকমান! আজও দেখি, তুমি একই অঙ্গ রান্না করে এনেছ। একই অঙ্গ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে নিকৃষ্ট কিভাবে হয়? হযরত লুকমান বললেনঃ যে কোন জীবের জিহ্বা ও হৃদপিন্ডই তার সর্ব প্রধান অঙ্গ। এই দুটি যখন ভালো থাকে, তখন সেও হয় উৎকৃষ্ট জীব। আর এ দুটি যখন খারাপ হয়, তখন সে হয় নিকৃষ্ট জীব।

এই ঘটনা থেকে প্রকারান্তরে হযরত লুকমান শিক্ষা দিলেন যে, মানুষের বেলায়ও এই কথা প্রযোজ্য। সে যদি তার হৃদয় দিয়ে সৎ চিন্তা করে এবং জিহ্বা দিয়ে সৎ কথা বলে, পবিত্র জিনিস পানাহার করে, তবে সে সর্বোত্তম প্রাণীকে পরিণত হতে পারে, নতুবা নিকৃষ্টতম প্রাণীতে পরিণত হবে। বলা বাহুল্য, তাঁর এ হিকমতটি হাদীস কুরআনের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪. আর একদিন হযরত লুকমানের মনিব তাকে নির্দেশ দিল তাঁর যমীনে তিল বপন করতে। হযরত লুকমান চালাকী করে তিলের পরিবর্তে সরিষা বপন করলেন। পরে যখন ফসল জন্মালো তখন মনিব বললো, আমি তো তোমাকে তিল বপন করতে বলেছিলাম। তুমি সরিষা বপন করলে কেন? হযরত লুকমান বললেনঃ আমি তো ভেবেছিলাম, সরিষা বুনলেই তিল হবে। মনিব বললেনঃ তা কি করে হয়? তখন হযরত লুকমান বললেনঃ আপনি যখন সব সময় পাপ কাজ করে উত্তম ফল বেহেশ্‌ত পাওয়ার আশা করেন, তখন

সরিষা বুনে আমি তিল পাওয়ার আশা করলে দোষ কী? এ কথা শুনে মনিব চমকে উঠলো এবং নিজের ভুল বুঝতে পেরে তওবা করলো।

৫. আর একবার লুকমান হাকীম একটি জাহাজে আরোহন করে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছিলেন। জাহাজে একজন সওদাগর ও তার সাথে একটি বালক ভৃত্য ছিল। জাহাজ সমুদ্রের মাঝখানে গেলে তার উত্তাল তরঙ্গমালা দেখে বালকটি বিকট চিৎকার করে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। সে জীবনে আগে কখনো সমুদ্র দেখেনি। তাই সমুদ্রের মাঝখানে এসে সে ভয়ে কাঁদতে লাগলো। সওদাগর অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনই লাভ হলো না। এই অবস্থা দেখে লোকমান হাকীম সওদাগরের কাছে এগিয়ে গেলেন এবং তাকে বললেন, 'আপনি বোধ হয় বালকটির কান্নাকাটি থামাতে ব্যর্থ হয়েছেন। যদি কিছু মনে না করেন, আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। সওদাগর সানন্দে রাযী হলো। লুকমান বালকটিকে নিয়ে জাহাজের এক প্রান্তে চলে এলেন। তারপর তার কোমরে একটি রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধলেন। অতঃপর তাকে সাগরের পানির মধ্যে ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ রশি ধরে টেনে নিয়ে চললেন। বালকটি পানিতে পড়বার সময় গগণবিদারী একটা চিৎকার দিল। কিন্তু তারপরই নিরবে হাবুডুবু খেতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে লুকমান তাকে টেনে তুললেন এবং সওদাগরের কাছে রেখে এলেন। এবার সে আর কান্নাকাটি করলো না। শান্ত হয়ে বসে থাকলো। সওদাগর বিস্মিত হয়ে লুকমানকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ অসম্ভবকে আপনি কিভাবে সম্ভব করলেন? লুকমান বললেনঃ ব্যাপারটা কঠিন কিছু ছিল না। বালকটি সমুদ্র কখনো দেখেনি। তাই সমুদ্রের ভয়াল চেহারা দর্শনই তাকে ভয়ে দিশেহারা করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যখন সে দেখলো, সমুদ্রের পানিতে পড়ে যাওয়া বা ডুবে যাওয় আরো ভয়াবহ ব্যাপার। তখন তার কাছে জাহাজে বসে সমুদ্র দেখা অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক কাজ বলে মনে হতে লাগলো। এ জন্যই সে এখন শান্ত। আমি বিষয়টা প্রথমেই বুঝে নিয়ে এই কৌ শল প্রয়োগ করেছি।

এই ঘটনা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, বিপদ দেখেই অস্থির হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মনে রাখতে হবে যে, যে বিপদ এখন সামনে এসেছে ভবিষ্যতে তার চেয়েও বড় বিপদ আশা বিচিত্র কিছু নয়।

৭৯। নামায সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা

বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাইলের এক মহিলা একবার হযরত মূসার (আঃ) কাছে এল। সে বললোঃ হে আল্লাহর রাসূল। আমি একটি ভীষণ পাপের কাজ করেছি। পরে তওবাও করেছি। আপনি দোয়া করুন যেন

আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেন। মূসা (আঃ) বললেনঃ তুমি কি গুনাহ্ করেছ? সে বললোঃ আমি ব্যভিচার করেছিলাম। অতঃপর একটি অবৈধ সন্তান প্রসব করি এবং তাকে হত্যা করে ফেলি। মূসা (আঃ) বললেনঃ "হে মহাপাতকিনী। এক্ষুনি বেরিয়ে যাও। আমার আশংকা আকাশ থেকে এক্ষুনি আগুন নামবে এবং তাতে আমরা সবাই ভস্মীভূত হবো।" মহিলাটি ভগ্ন হৃদয়ে বেরিয়ে গেল। অল্পক্ষণ পরেই জিবরীল (আঃ) এলেন। তিনি বললেনঃ "হে মূসা। আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছেন কী কারণে এই তওবাকারিণীকে তাড়িয়ে দিলেন? তার চেয়েও কি কোন অধম মানুষকে আপনি দেখেননি?" মূসা বললেনঃ "হে জিবরীল! এর চেয়ে পাপিষ্ঠ কে আছে?" জিবরীল (আঃ) বললেনঃ "ইচ্ছাকৃতভাবে নামায তরক্‌কারী।"

অপর একটি ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তার বোনের দাফন কাফন সম্পন্ন করে বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখলো তার মানিব্যাগটি নেই। পরে তার মনে হলো, ওটা কবরের ভেতরে পড়ে গেছে। তাই সে ফিরে গিয়ে কবর খুঁড়লো। দেখলো, কবর জুড়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সে পুনরায় মাটি চাপা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী গেল। তার মায়ের কাছে সমস্ত ঘটনা জানালে তিনি বললেন, মেয়েটি নামাযের ব্যাপারে খামখেয়ালী করতো এবং সময় গড়িয়ে গেলে নামায পড়তো। বিনা ওজরে নামায কাযা করলে যদি এরূপ পরিণতি হতে পারে তাহলে বেনামাযীর পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে। তা ভাবতেও গা শিউরে উঠে।

শুধু নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে নামায পড়াই যথেষ্ট নয়। নামাযকে সুষ্টুভাবে ও বিশুদ্ধভাবে পড়াও জরুরী। নচেত অশুদ্ধ নামায পড়া নামায না পড়ারই সমতুল্য। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, একদিন এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলো। রাসূল (সাঃ) তখন মসজিদেই বসে ছিলেন। লোকটি নামায পড়লো। অতঃপর রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে সালাম করলো। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেনঃ তুমি ফিরে যাও এবং নামায পড়। কারণ, তুমি নামায পড়নি। সে চলে গেল এবং আগের মত আবার নামায পড়ে রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে সালাম করলো। তিনি সালামের জবাব দিয়ে আবার বললেনঃ তুমি ফিরে যাও এবং নামায পড়। কেননা, তুমি নামায পড়নি। এরূপ তিনবার নামায পড়ার পর লোকটি বললোঃ হে আল্লাহর রাসূল। আমি এর চেয়ে ভালভাবে নামায পড়তে পারি না। আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেনঃ "প্রথমে নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীর বল। অতঃপর যতটুকু পার কুরআন পাঠ কর। অতঃপর রুকু কর এবং

রুকুতে গিয়ে স্থির হও। অতঃপর উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াও। তারপর সিজদা দাও এবং সিজদায় গিয়ে স্থির হও। তারপর স্থির হয়ে বস। অতঃপর আবার সিজদা দাও এবং সিজদায় স্থির হও। এভাবে নামায শেষ কর।"

শিক্ষা ঃ ঈমানের পরেই নামায সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। সময়ানুবর্তিতার সাথে ও বিশুদ্ধভাবে নামায না পড়লে আখেরাতে নাজাত লাভের আশা করা যায় না।

৮০। উদ্যানের মালিকদের ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, ইয়ামানে একটি চমৎকার ফলের বাগান ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) এর উম্মতের জনৈক মুমিন ও সৎকর্মশীল ব্যক্তি এই উদ্যানটি তৈরি করেছিলেন। তাঁর নিয়ম ছিল যে, ঐ উদ্যানের ফল মূল আহরণের সময় তিনি দরিদ্র লোকদের জন্য তার একটা অংশ রেখে দিতেন। ফলে সেখান থেকে খাদ্য শস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল এবং ঐ বাগানের ওপর অনেকাংশে তাদের জীবিকা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এ জন্য প্রতি বছর ফসল কাটার মওসুমে সেখানে ফকীর মিসকীনদের ভীড় লেগে যেত।

হযরত ঈসা (আঃ) এর আকাশে উত্থিত হওয়ার কিছুকাল পর এই পূন্যবান ব্যক্তিও ইন্তিকাল করেন। তাঁর তিন পুত্র ঐ বাগান ও ক্ষেতের উত্তরাধিকারী হলো। তারা পরস্পর এই মর্মে শলা পরামর্শ করলো যে, এখন আমাদের সদস্য বেড়ে গেছে। সেই অনুপাতে ফসলের ফলন হচ্ছে না। তাই এখন আর পিতার আমলের মত ফকীর মিসকীনদের জন্য ফসল ও ফলমূল রেখে দেয়া সম্ভব নয়। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, কোন কোন পুত্র এও পর্যন্ত বললো যে, আমাদের পিতাতো বোকা ছিল বলে ফকীর মিসকীনদেরকে ফল-মূল বিলাতো। এখন আমাদের ঐ প্রথা বন্ধ করে দিতে হবে। তারা স্থির করলো যে, ভোর বেলা বেশ খানিকটা রাত থাকতে উঠে ফসল কেটে আনা হবে, যাতে ফকীর-মিসকীনরা টের না পায় এবং বাগানের কাছে ভীড় না জমায়। তারা দৃঢ়ভাবে সংকল্প নিল যে, ফকীর-মিসকীনদের জন্য কোনই অংশ রাখা হবে না।

কিন্তু ভোররাতের নির্দিষ্ট সময় ঘনিয়ে আসার আগেই ঐ বাগানে এক ভয়াবহ আগুনে ঝড় এসে সমস্ত ফসলকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল। অথচ বাগানের মালিকরা এ ঘটনার বিন্দু বিসর্গও টের পেল না। কারণ তারা ঘুমিয়ে ছিল এবং ঐ ঝড় নির্দিষ্ট বাগান ছাড়া অন্য কোথাও আঘাত হানেনি।

ভোররাতে তারা যথাসময় বাগানে গিয়ে দেখে সেখানে একটা ফাঁকা ময়দান ছাড়া আর কিছু নেই। প্রথমে তারা ভাবলো তারা পথ ভুলে অন্য কোথাও এসে পড়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তারা সব কিছু বুঝতে পারলো এবং অনুশোচনা করতে লাগলো। পরে তারা তওবা করে। ইমাম বাগাওয়ী বর্ণনা করেন যে, তওবা করার পর আল্লাহ তাদেরকে আরো ভালো একটা উদ্যান দান করেছিলেন এবং তারা তাদের পিতার নীতি অনুসরণ করে আরো সমৃদ্ধশালী হয়েছিল।

শিক্ষা ঃ এই ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের সূরা কালামে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এর শিক্ষা এই যে, আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ থেকে আল্লাহর পথে দান করতে থাকলে আল্লাহ সেই সম্পদ বাড়িয়ে দেন, তেমনি দান বন্ধ করলে তা তিনি ধ্বংসও করে দিতে পারেন। বিশেষত, যেখানে কোন সৎকর্ম আগে থেকে চালু রয়েছে সেখানে তা বন্ধ করে দিলে আল্লাহর গযব নাযিল হওয়া অবধারিত হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "তোমরা যদি আমার নিয়ামতের শোকর আদায় কর, তবে আমি তা আরো বাড়িয়ে দেব। আর যদি নাশোকরী কর তবে জেনে রেখ, আমার আযাব অত্যন্ত ভয়ংকর।" (সূরা ইবরাহীম) এ কথা সহজেই বোধগম্য যে, আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে দরিদ্রদেরকে বঞ্চিত করা এবং শুধু নিজেই সম্পূর্ণটা ভোগ করা চরম নাশোকরী ও অকৃতজ্ঞতার শামিল।

৮১। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বিরুদ্ধে শত্রুতার পরিণাম

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) এর আমলে বনী ইসরাইল গোত্রে একজন নামকরা আলেম ছিলেন। তাঁর নাম ছিল বালয়াম বাউরা। তিনি তাওরাতের হাফেয ও মুফাসসির ছিলেন এবং ইসমে আযম জানতেন। তাঁর একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল এই যে, আল্লাহর ইসমে আযম উচ্চারণ করে তিনি যে দোয়াই করতেন, তা আল্লাহ কবুল করতেন এবং এ বিষয়টি বনী ইসরাইল ও অন্যান্য গোত্রের লোকদের জানা ছিল।

হযরত মূসা (আঃ) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন বালয়াম বাউরা কিনানে বনী ইসরাইলের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে বাস করতেন এবং তাদের ও হযরত মূসার (আঃ) সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) এর ইন্তিকালের পর যখন তাঁর ভাগ্নে হযরত ইউশা ইবনে নূন (আঃ) বনী ইসরাইলের শাসক ও খলীফা নিযুক্ত হন, তখন বালয়াম বাউরা তাঁর

সরকারের একটি উচ্চ পদ লাভের প্রত্যাশা করেন। কিন্তু হযরত ইউশা (আঃ) তা দিতে অস্বীকার করায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে পার্শ্ববর্তী মোশরেক রাজ্য বেলকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। এই রাজ্যের রাজা তাকে বসবাসের জন্য একখন্ড জমি দান করেন এবং সেখানে তিনি বাড়ী বানিয়ে বসবাস করতে থাকেন।

ওদিকে হযরত ইউশা (আঃ) এর নেতৃত্বে বনী ইসরাইল পার্শ্ববর্তী ইল্লিয়া রাজ্য জয় করে বেলকা রাজ্যের সীমান্তে উপনীত হয়। বেলকার মোশরেক রাজ্য দখল করে সেখানে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আদেশ দেন। তদনুসারে হযরত ইউশা বেলকা রাজ্যের মোশরেক রাজাকে ইসলাম গ্রহণ নতুবা আত্মসমর্পনের জন্য চরমপত্র দেন। বেলকার রাজা চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করে হযরত ইউশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং তাতে হযরত ইউশার বাহিনী বিজয়ী হয়। বেলকার রাজার সৈন্যদের একাংশ নিহত হয় এবং অপরাংশ পালিয়ে যায়। এই অবস্থায় অনন্যোপায় হয়ে উক্ত রাজা বালয়াম বাউরার শরণাপন্ন হয়। সে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে যে, আমার এই বিপদের দিনে আপনার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন। আপনি আপনার আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন আমরা ইউশার সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করতে পারি ও তাকে তাড়িয়ে দিতে পারি।

বালয়াম বাউরা বললেন, হযরত ইউশা (আঃ) আল্লাহর নবী ও প্রিয় ব্যক্তি। তাঁর বিরুদ্ধে দোয়া করা আমার পক্ষে ঘোরতর পাপের কাজ হবে। তাছাড়া এরূপ দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা যায় না। আপনি বরঞ্চ ইসলাম গ্রহণ করুন। আপনার রাজ্য নিরাপদ থাকবে।

রাজা ভীষণ ক্রুদ্ধ হলো। সে বালয়াম বাউরাকে একদিকে হত্যার ভীতি প্রদর্শন করতে লাগলো, অপরদিকে বালয়াম বাউরার স্ত্রীর কাছে গোপনে দূত পাঠিয়ে বিপুল অর্থ প্রদানের প্রলোভন দিতে লাগলো। বালয়াম বাউরা দেখলেন, তিনি আপনজনদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি কাফের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের মুঠোর মধ্যে চরম অসহায় অবস্থায় পতিত হয়েছেন। এখানে রাজার বিপুল শক্তির মোকাবিলা করা তার সাধ্যাতীত। অপরদিকে অর্থের প্রলোভনেও তিনি দিশাহারা হয়ে পড়লেন। তাই তিনি রাজাকে বললেন, আমাকে একদিন সময় দিন। রাজা তাকে সময় দিল। বালয়াম বাউরার নিয়ম ছিল, কোন বিষয়ে দোয়া করতে হলে প্রথমে আল্লাহর কাছে অনুমতি চাইতেন। আল্লাহ তাকে স্বপ্নের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে,

আমার নবীর বিরুদ্ধে কোন দোয়া গ্রহণযোগ্য নয় এবং এরূপ দোয়া করলে তোমার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই বরবাদ হয়ে যাবে।

বালয়াম বাউরা রাজাকে তার স্বপ্নের কথা জানালেন। রাজা তাকে বললেন, আপনাকে আরো একদিন সময় দেয়া গেল। আবার অনুমতি প্রার্থনা করুন। বালয়াম বাউরা আবারও অনুমতি প্রার্থনা করে ঘুমিয়ে গেলেন। এবার তাকে স্বপ্নে কিছুই জানানো হলো না। বালয়াম বাউরা কিছুটা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেলেন। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে আছেন এমন সময় রাজার দূত এসে তাকে আবার তাড়া দিল দোয়া করার জন্য। এই সময় শয়তান তাকে এই মর্মে প্ররোচনা দিল যে, গত রাতে আল্লাহ যে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তাকে মৌ ন সম্মতি ধরে নেয়া যায়। তাছাড়া দোয়ার মাধ্যমে কাফের বাদশাকে বিজয়ী হতে সাহায্য করলে সে হয়তো তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে এবং পরবর্তী সময়ে তাকে হেদায়াত করা সহজ হবে। অথচ তিনি একথা ভেবে দেখলেন না যে, আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে শত্রুতার আচরণ করা কত বড় মারাত্মক গুনাহর কাজ এবং এরূপ কাজ করে কোন বাতিল শক্তিকে সত্যের দিকে আকৃষ্ট করার আশা দুরাশা মাত্র। তাছাড়া যে কাজ আল্লাহর কিতাবে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, স্বপ্নের মাধ্যমে তার রদবদল হতে পারে না। আসলে দুনিয়াবী স্বার্থের মোহে অন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি এ দিকটি ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি।

বালয়াম বাউরা চিরাচরিত নিয়মে তার গাধার পিঠে চড়ে পাহাড়ের ওপর নির্মিত তার নির্জন ইবাদতখানায় রওনা হলেন রাজার পক্ষে দোয়া করার মতলবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, এই সময় আল্লাহর হুকুমে গাধাটির চলনশক্তি রহিত হয়ে যায়। বালয়াম বাউরা তাকে প্রহার করতে আরম্ভ করলে সে বাকশক্তি প্রাপ্ত হয় এবং বলে যে, তুমি যে উদ্দেশ্যে যাচ্ছ, আল্লাহ আমাকে সেজন্য তোমাকে বহন করে নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। এই সময় রাজার লোকজনদের একটি বিরাট দল বালয়াম বাউরার সঙ্গে যাচ্ছিল। বালয়াম বাউরা অগত্যা সেই জায়গায় দাঁড়িয়েই দোয়া করলেন। কিন্তু তিনি যে দোয়া করলেন, তার মুখ দিয়ে ঠিক তার বিপরীত কথা তার অজান্তেই উচ্চারিত হতে লাগলো। তিনি বললেন, "রাজাকে বিজয়ী কর।" কিন্তু সবাই শুনতে পেল, যেন তিনি বলছেন "হযরত ইউশাকে বিজয়ী কর।" তাই রাজার লোকেরা চিৎকার করে প্রতিবাদ করতে লাগলো। তার বললো, ওহে বালয়াম, আপনি তো উল্টা দোয়া করছেন। বালয়াম বললেন, আমি ঠিকই দোয়া করছিলাম। কিন্তু আমার জিহ্বা এখন আমার আয়ত্বের বাইরে

চলে গেছে। এই সময়ে বালয়াম বাউরার জিহ্বা হঠাৎ কুকুরের জিহ্‌বার মতো লম্বা হয়ে বুকের উপর ঝুলে পড়লো । কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, শুধু জিহ্‌বা নয়, তার শরীরের ওপরের অর্ধাংশ কুকুরের মতো হয়ে যায় এবং নিম্নাংশ মানুষের মত বহাল থাকে।

এবার বালয়াম বাউরা বললো, আমার তো দুনিয়া ও আখেরাত দু'টোই বরবাদ হয়ে গেল। এখন তোমরা একটি কাজ কর। তোমরা তোমাদের সুন্দরী নারীদেরকে বনী ইসরাইলী সৈন্যদের মধ্যে লেলিয়ে দাও। এতে তারা ঐ নারীদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে এবং তাদের পরাজয় অবধারিত হবে। রাজা এই পরামর্শ অনুসারে কাজ করলো এবং সকল সুন্দরী যুবতীদেরকে সৈন্য বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে দিল। বনী ইসরাইলী বাহিনী এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারলো না। তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হলো এবং তাদের মধ্যে প্লেগ ছড়িয়ে পড়লো। ফলে বহু সংখ্যক সৈন্য মারা গেল এবং পরাজয়ের সম্মুখীন হলো। আল্লাহর নবী হযরত ইউশা (আঃ) এই অবস্থা দেখে সেনাবাহিনীর মধ্যে আল্লাহর ভীতি জাগিয়ে তুললেন এবং বেহায়া নারীগুলিকে ধরে ধরে হত্যা করলেন। সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃংখলা ও খোদাভীতি পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর তিনি পুনরায় সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ চালালেন। এবার তার বাহিনী জয়যুক্ত হলো এবং বেলকার রাজ্য থেকে মোশরেক রাজার রাজত্ব সমূলে উৎখাত করা হলো। বালয়াম বাউরা যুদ্ধে মারা না গেলেও তার কাছ থেকে ইসমে আযম কেড়ে নেয়া হলো এবং অতঃপর তার আর কোন দোয়া কবুল হতো না। আর তার দেহাকৃতিতে যে পরিবর্তন আনা হয়েছিল, তা তার মৃত্যু পর্যন্ত বহাল রইল। (তাফসীরে খাযেন, কাসাকুল আম্বিয়া, তাফসীরে মায়ারিফুল কুরআন)

শিক্ষা ঃ এই ঘটনা থেকে নিম্নলিখিত শিক্ষাসমূহ গ্রহণ করা যায়ঃ

১. নিজের জ্ঞান গরিমা ও ইবাদাত উপাসনার ব্যাপারে কারো গর্বিত হওয়া উচিত নয়। কারণ শয়তান ও খোদাদ্রোহী মানুষদের প্ররোচনায় বিপথগামী হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়, যদি আল্লাহ সাহায্য ও রহমত না করেন।

২. এমন পরিবেশ ও কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকা উচিত, যাতে ঈমান ও চরিত্র বিপন্ন হবার আশংকা থাকে। বিশেষতঃ দুনিয়াবী স্বার্থের ক্ষতির কারণে উত্তেজিত হয়ে সৎ লোকদের সংসর্গ ত্যাগ করে অসৎ ও বাতিলপন্থীদে সংসর্গ গ্রহণ করা নিজের ঈমান ও চরিত্রকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়ার শামিল।

৩. কোন অবস্থাতেই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত লোকদের সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত নয়। হাদীস কুদসীতে আল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কোন প্রিয়জনের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করে, তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করি।

৪. অসৎ ও পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাদের নিমন্ত্রণ ও উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এ কাজ করেই বালয়াম বাউরা আল্লাহর গযবে পতিত হয়েছিল।

৫. অশ্লীলতা ও হারামের অনুসরণ গোটা জাতির ধ্বংস ও পতন ডেকে আনে।

৬. অসৎ কাজে ও অশ্লীলতায় প্ররোচনাদানকারীকে চাই সে নারী বা পুরুষ যেই হোক না কেন, কঠোর হস্তে দমন করা কর্তব্য।

৭. আল্লাহর প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা, মেধা, প্রতিভা এবং ক্ষমতা ও পদমর্যাদাকে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর দ্বীনের ক্ষতি সাধনে ব্যবহার করা আল্লাহর গযবকে ডেকে আনার শামিল। এ ব্যাপারে সকলের সতর্ক থাকা উচিত।

৮২। হযরত আইয়ূব (আঃ) এর অগ্নিপরীক্ষা

হযরত আইয়ূব (আঃ) এমন একজন নবী ছিলেন, যাকে আল্লাহ তায়ালা দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত করে কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ধৈর্য অবলম্বন করে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ফলে আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সাবির অর্থাৎ ধৈর্যশীল উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্রথম দিকে হযরত আইয়ূব ছিলেন অত্যন্ত সুখী ও সম্পদশালী মানুষ, তাঁর ছিল বিপুল ধন সম্পদ, নয়নাভিরাম বাসভবন, বহু সন্তান-সন্তুতি, চাকর বাকর ও গবাদি পশু। কিন্তু অল্প কিছুকাল পরেই তিনি পরীক্ষায় পতিত হন। তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ ও চাকর নওকর তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। উপরন্তু তার শরীরে কুষ্টের মত এক মারাত্মক চর্মরোগ দেখা দেয়। জিহ্বা ও হৃৎপিন্ড ছাড়া তার শরীরের কোন অংশই ঐ রোগের কবল থেকে মুক্ত ছিল না। সেই অবস্থায়ও তিনি জিহ্বা ও মন দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করতেন।

ঘৃণার উদ্রেককারী এই রোগের দরুণ তার আপনজনেরাও তাকে ছেড়ে চলে যায়। একমাত্র তাঁর স্ত্রী কাছে থেকে তাঁর পরিচর্যা করতেন। তিনি ছিলেন হযরত ইউসুফ (আঃ) এর মেয়ে বা পৌ ত্রী লাইয়া, মতান্তরে রহীমা, সমস্ত সহায়-সম্পদ শেষ হয়ে গেলে তার স্ত্রী মজুরী খেটে অর্থোপার্জন করে তা দ্বারা খাওয়া ও পরিচর্যার ব্যয় নির্বাহ করতেন।

হযরত আইয়ূব লোকালয়ের বাইরে এক নির্জন স্থানে প্রায় সাত বছর অবস্থান করেন। তার কাছে কেউ আসতো না। তাঁর স্ত্রী যখন তাঁকে বললেনঃ আপনি এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তখন তিনি বললেনঃ আমি সত্তুর বছর আল্লাহর বিপুল নিয়ামতের মধ্যে কাটিয়েছি। মাত্র সাত বছর দুঃখ কষ্ট ভোগ করেই এত অস্থির হব কেন? যখন ধৈর্যধারণে অক্ষম হবো তখন দোয়া করবো।

অবশেষে এক সময় তার রোগ যন্ত্রণা যখন ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন।

আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁকে আদেশ দিলেনঃ নিজের পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত কর। মাটি থেকে স্বচ্ছ পানির ঝর্ণা ফুটে বেরুবে। সেই পানি পান কর ও তা দ্বারা গোসল কর। হযরত আইয়ূব আদেশ পালন করলেন। ঝর্ণার পানি দ্বারা গোসল করা মাত্রই তার সমস্ত রোগ দূর হয়ে গেল এবং তিনি একজন সুস্থ সবল যুবকে পরিণত হলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্য বেহেশতী পোশাক পাঠিয়ে দিলেন। সেই পোশাক পরে তিনি পরিষ্কার জায়গায় বসে রইলেন।

ওদিকে তাঁর স্ত্রী প্রতিদিনের মত মজুরী খেটে তাঁর পরিচর্যা করতে এলেন। কিন্তু স্বামীকে যথাস্থানে না পেয়ে কাঁদতে লাগলেন। পাশে বসা সুস্থ সবল হযরত আইয়ূবকে দেখেও তিনি চিনতে পারলেন না। তিনি তাকেই জিজ্ঞাসা করলেনঃ এখানে যে রোগা লোকটি পড়ে ছিল, তাকে দেখেছেন নাকি? তাকে কোন হিংস্র পশুতে খেয়ে ফেলেছে এই আশংকায় তিনি কাঁদতে লাগলেন।

হযরত আইয়ূব তার স্ত্রীর কান্নাকাটি দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি বললেনঃ আমিই আইয়ূব। আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করে আমাকে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ তাকে তার যাবতীয় ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফিরিয়ে দেন।

শিক্ষা ঃ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য দোয়া ও চেষ্টার পাশাপাশি ধৈর্যধারণও করতে হবে। কেননা আল্লাহ প্রত্যেক বিপদ-আপদ একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবতীর্ণ করেন ঈমান ও ধৈর্যের পরীক্ষা নেয়ার জন্য। যতক্ষণ আল্লাহর নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত না হয়, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ নবীগণ সবচেয়ে বেশী বিপদে আক্রান্ত হন, তাঁদের পর অন্যান্য সৎলোকেরা পর্যায়ক্রমে আক্রান্ত হন। প্রত্যেকের পরীক্ষা তার ঈমানের দৃঢ়তা অনুপাতে হয়ে থাকে।

৮৩। হযরত ঈসা (আঃ) ও দাম্ভিক দরবেশ

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) এর সময়ে ফিলিস্তিনে একজন প্রসিদ্ধ দরবেশ বাস করতো। সে হযরত ঈসার এমন প্রিয়পাত্র ছিল যে তিনি স্বয়ং কখনো কখনো তার খানকায় গিয়ে তাকে সদুপদেশ দিতেন। তৎকালে ঐ অঞ্চলে একজন কুখ্যাত নরঘাতক দস্যুও বাস করতো। সে শুধু ডাকাতি ও নরহত্যায়ই লিপ্ত ছিল না, সেই সাথে সমসাময়িক জুলুমবাজ সরকারের পোষা গুন্ডা হিসাবে হযরত ঈসা ও তার সঙ্গীসাথীদের ওপর অকথ্য নির্যাতনও চালাতো। এজন্য অন্যান্যের মত উল্লিখিত দরবেশও তাকে প্রচন্ডভাবে ভয় পেতো এবং ঘৃণা করতো।

সহসা এই দস্যুর জীবনে পরিবর্তন এলো এবং সে ঈমান আনার উদ্দেশ্যে হযরত ঈসার সাথে সাক্ষাত করতে গেলো। হযরত ঈসা এ সময় নিজ বাসস্থানে ছিলেন না। দস্যুটি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো যে, তিনি উক্ত দরবেশের খানকায় রয়েছেন। অগত্যা সে সেখানেই গিয়ে হাজির হলো। দরবেশের দরজায় কড়া নাড়লে ভেতর থেকে দরবেশ উকি দিয়ে দেখতে পেলো তার বহুল পরিচিত সেই দস্যুটি দাঁড়িয়ে, যার হাতে তাকে পূর্বে বহু নির্যাতন সইতে হয়েছে। সে ভেতর থেকে জিজ্ঞাসা করলো, "কে?" দস্যুটি জবাব দিলঃ "আমি অমুক। আমি আল্লাহর নবী ঈসার (আঃ) সাথে দেখা করতে চাই। আমি ঈমান আনতে চাই।" হযরত ঈসা ভেতরেই ছিলেন। তিনি দরবেশকে বললেন, "দরজা খুলে ওকে আসতে দাও।" কিন্তু দরবেশটি হযরত ঈসার স্নেহ আদর পেয়ে দাম্ভিক ও একগুঁয়ে হয়ে উঠেছিল। সে হযরত ঈসার সাথে বাকবিতন্ডা শুরু করে দিল। তাকে এই বদ লোকটির সাথে সাক্ষাত না করতে অনুরোধ করলো। হযরত ঈসা তাকে যতই বুঝান যে, সে যত খারাপই থাকুক এখন ভালো হতে এসেছে, তাকে সুযোগ দিতে হবে, দরবেশ ততই একগুয়েমী দেখাতে থাকে। সে বললো, এই লোকটি এত পাপী যে, আল্লাহর নবী ও তার মত দরবেশের সাথে দেখা করারও সে যোগ্য নয়। এমনকি সে এতদূরও বললো যে, "এত বড় পাপী লোকের সাথে আল্লাহ যদি আমাকে পরকালে এক সাথে বেহেশতে দেন তবে তাও হবে আমার দোজখ তুল্য।"

অতঃপর দরবেশের অনড় মনোভাব দেখে হযরত ঈসা ওহীর নির্দেশক্রমে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং বাইরে একটি গাছের নীচে বসে দস্যুকে তওবা করালেন ও ইসলাম গ্রহণ করালেন। এরপর হযরত ঈসার নিকট একটি ওহী নাযিল হলো। হযরত ঈসাকে আল্লাহ আদেশ দিলেন ঐ

দরবেশকে তিনি যেন জানিয়ে দেন যে, আল্লাহ্ তার মনের আশা পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাকে এই নওমুসলিমের সাথে একত্রে বেহেস্তে বাস করতে হবে না। প্রচন্ড ঘৃণা ও হিংসার দায়ে আল্লাহ্ তার সকল নেক আমল বাতিল করে দিয়ে তার জন্য দোজখের ফায়সালা দিয়েছেন এবং তওবাকারী আগন্তুকের জন্য বেহেশতের।

শিক্ষাঃ কোন ব্যক্তি তওবার মাধ্যমে একনিষ্ঠভাবে সত্যের পথে ফিরে আসার পর তার বিরুদ্ধে তার পূর্ববর্তী জীবনের প্রাপ্ত কর্মকান্ডের জন্য ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করা অন্যায়।

৮৪। হযরত ঈসা (আঃ), তিন সহচর ও স্বর্ণের ইট

একবার হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর তিন সহচরকে সাথে নিয়ে সফরে বেরুলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় দু'টো স্বর্ণের ইট পাওয়া গেল। হযরত ঈসার (আঃ) তিন সহচর সঙ্গে সঙ্গে ইট দু'খানা তুলে নিতে ছুটে গেল। তিনি তাদেরকে তা স্পর্শ করতে নিষেধ করে বললেনঃ "এ দু'টো স্বর্ণের ইট দ্বারা হয়তো আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। এ দু'টো ইট তোমাদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করতে পারে।" কিন্তু ঐ তিন সহচর তার উপদেশে কর্ণপাত করলো না। তারা পরস্পর পরামর্শ করে একমত হলো যে, ইট দুটো তারা ভেঙ্গে অথবা বিক্রি করে ভাগ করে নেবে। হযরত ঈসা (আঃ) তাদের অনড় মনোভাব দেখে বিরক্ত হয়ে তাদেরকে ত্যাগ করে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর ঐ তিন সহচরের প্রচন্ড ক্ষিধে পেলে তার তাদের একজনকে বাজারে খাবার কিনতে পাঠালো। ইত্যবসরে অবশিষ্ট দু'জন শয়তানের কু-প্ররোচনায় ষড়যন্ত্র আটলো যে, তাদের তৃতীয় সঙ্গী যেই খাবার নিয়ে আসবে, অমনি ওরা দু'জন তার ওপর হামলা চালিয়ে তাকে খতম করে ফেলবে। তাহলে ইট দু'খানা আর ভাগ করতে হবে না। দু'জনে আস্ত একখানা করে নিতে পারবে। ওদিকে যে সঙ্গীটি বাজারে খাবার কিনতে গিয়েছিল, শয়তান তাকেও বিপথগামী করলো। সে নিজের খাবার খেয়ে নিল আর বাকী দু'জনের খাবারে বিষ মিশিয়ে আনলো, যাতে ওরা দু'জনই মারা যায় এবং সে একাই ইট দু'খানা দখল করতে পারে।

যথাসময়ে খাবার নিয়ে তৃতীয় সঙ্গীটি ফিরে এলো আর সিদ্ধান্ত মোতাবেক তৎক্ষণাত দু'জনে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। তারা মারতে মারতে তাকে মেরেই ফেললো। তারপর লাশটা এক পাশে সরিয়ে রেখে তারা পরম আনন্দে খেতে বসে গেল। আর যায় কোথায়। এক লোকমা খেতেই চিৎকার করে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়লো।

পরদিন হযরত ঈসা ঐ এলাকায় ফিরে এলে দেখলেন, তার তিন সহচরই মরে পড়ে আছে। আর তাদের লাশের পাশেই জ্বল জ্বল করছে স্বর্ণের ইট দু'টো।

শিক্ষা ঃ এ কিস্‌সাটিও অত্যন্ত শিক্ষামূলক। প্রথমতঃ চুক্তি লংঘন করে তারা নিজেদের সঙ্গী তথা শরীকদেরকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করেছিল, যার পরিণাম হয়েছিল অত্যন্ত করুণ ও মর্মান্তিক। তাই কখনো পারস্পরিক চুক্তি বা ওয়াদা লংঘন করা চাই না এবং কারো ন্যায্য অধিকার হরণ করা উচিৎ নয়।

দ্বিতীয়তঃ তারা আল্লাহর নবীর সাথে একটি মহৎ উদ্দেশ্যে সফরে বেরিয়েছিল। পথিমধ্যে পার্থিব সম্পদের প্রলোভনে সেই মহৎ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় এবং আল্লাহর নবীর নিষেধাজ্ঞাও অমান্য করে। তাই মনে রাখতে হবে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নাফরমানী এবং বাতিলের প্রলোভনে সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে থাকে।

৮৫। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও বিবি সারার ঘটনা

একবার হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় স্ত্রী হযরত সারাকে সাথে নিয়ে সফর করছিলেন। পথিমধ্যে একটি রাজ্যে তাকে যাত্রা বিরতি করতে হয়। ঐ রাজ্যের রাজা ছিল অত্যন্ত দুরাচারী যালেম। তার নিয়ম ছিল, কোন পথিকের সাথে তার স্ত্রী থাকলে সে স্ত্রীকে গ্রেফতার করতো ও তার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালাতো। তবে কেউ বোন বা মেয়েকে সাথে নিয়ে সফর করলে তাদের কোন ক্ষতি করতো না।

হযরত ইবরাহীমের সস্ত্রীক ঐ রাজ্যে পৌঁছা মাত্রই রাজার কাছে খবর পৌঁছে গেল। হযরত ইবরাহীম পূর্বাহ্নে এলাকার লোকদের কাছ থেকে রাজার নিষ্ঠুর নিয়মের কথা জেনে নিয়েছিলেন। তাই তিনি আগে থেকে পরিকল্পনা করে রাখলেন যে, রাজার কাছে নীত হলে তিনি সারাকে স্ত্রী নয় বোন বলে পরিচয় দেবেন।

যথাসময়ে রাজার প্রহরীরা তাঁদের উভয়কে ধরে রাজ দরবারে নিয়ে গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, এই মহিলা তোমার কে? তিনি বললেনঃ আমার বোন। রাজা তার কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য সারাকে আলাদা ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো। বিবি সারাকে হযরত ইবরাহীম আগেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে, অত্যাচারী রাজার অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমাদেরকে এই মিথ্যা কথা বলতে হবে। আমি বলবো তুমি আমার বোন। আর তুমিও আমাকে ভাই বলবে। সেই কথা অনুসারে হযরত সারা রাজাকে

জানালেন যে, আমরা উভয়ে ভাইবোন। আসলে তাদের মনে মনে ছিল যে, তারা ইসলামী ভাই বোন- এই অর্থেই ঐ কথা বলবেন।

সারাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যখন আলাদা জায়গায় ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন হযরত ইবরাহীম নামায পড়ে নিভৃতে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে লাগলেন এবং সারার নিরাপত্তার জন্য দোয়া করতে লাগলেন। অবশেষে সারার জবাবে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা উভয়কে মুক্তি দিল।

শিক্ষাঃ

১. যালেমের যুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় না থাকলে মিথ্যা বলা যাবে। তবে সে ক্ষেত্রেও নির্জলা মিথ্যা বলার চেয়ে 'তাওরিয়া' করাই শ্রেয়। হযরত ইবরাহীম ইসলামী ভ্রাতৃত্বের কথা মনে রেখে প্রকাশ্যে ভাইবোন বলে পরিচয় দিয়েছিলেন, সেটা এক ধরনের তাওরিয়া অর্থাৎ পরোক্ষভাবে কথা বলা। যেখানে এটাও সম্ভব না হবে, সেখানে আত্মরক্ষার জন্য নির্জলা মিথ্যা কথা বলাও বৈধ হবে।

২. ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো যাদের জীবনের লক্ষ্য ও ব্রত, তাদেরকে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতঃ সংশ্লিষ্ট অঞ্চল ও যুগের রীতি প্রথা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হবে এবং কিভাবে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা যায় সে ব্যাপারে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সাথে পরিকল্পনা করতে হবে।

৩. যথাযথ বিচক্ষণতা ও কুশলতা প্রয়োগ করার পরও সাফল্যের জন্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়া অব্যাহত রাখতে হবে। কোন অবস্থাতেই আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

৮৬। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও ভিক্ষুক

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এত অতিথি পরায়ন ছিলেন যে, প্রতিদিন অন্ততঃ একজন অতিথিকে সাথে না নিয়ে খাওয়া দাওয়া করতেন না।

একদিন সারাদিনেও তিনি কোন অতিথি পেলেন না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সময় তিনি যখন হতাশ হয়ে গৃহের ভেতরে প্রবেশ করতে যাবেন এমন সময় একজন ভিক্ষুক এসে হাজির হলো। তিনি পরম আনন্দে ভিক্ষুককে বসালেন এবং খাবার দিলেন।

সারাদিনের ক্ষুধার্ত ভিক্ষুকটি খাবার পেয়েই গোগ্রাসে খাওয়া শুরু করলো। হযরত ইবরাহীম দেখলেন, বিছমিল্লাহ না বলেই ভিক্ষুকটি খাওয়া শুরু করেছে এবং বুভুক্ষের মত গিলছে। আল্লাহর প্রিয় নবী ইবরাহীম (আঃ)

এর এটা সহ্য হলো না। তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "কি হে! তুমি খাওয়ার আগে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে না যে!"

ভিক্ষুক বললোঃ (নাউজুবিল্লাহ) আমি বাপু আল্লাহ-টাল্লা মানিনে। খাবার পেলে খাবো, না পেলে উপোষ করবো। এর সাথে আবার আল্লাহর নাম নেবার কি সম্পর্ক?

হযরত ইবরাহীম রেগে আগুন হয়ে বললেনঃ "তবে রে হতভাগা! এর একটি দানাও তুই স্পর্শ করতে পারবিনে, এক্ষুনি দূর হ' আমার সামনে থেকে।"

বেচারা ভিক্ষুক আর কি করবে। এক গ্রাস কি দু'গ্রাস খেয়েছিল। আর খেতে পারলো না। হযরত ইবরাহীম ততক্ষণে তার খাবারের থালাটাও কেড়ে নিয়েছেন। অগত্যা সে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিদায় নিল।

কিছুক্ষণ পরেই ওহী এলো। আল্লাহ ধমকের সুরে হযরত ইবরাহীমকে বললেনঃ "হে ইবরাহীম! দীর্ঘ আশি বছর যাবত এই অবিশ্বাসী নাস্তিককে আমি আমার পৃথিবীতে বসবাস ও চলাফেরা করতে দিয়েছি, খাবার সরবরাহ করেছি। আর তুমি কি না একটি বেলাও তাকে সহ্য করতে ও খাওয়াতে পারলে না।"

অনুতপ্ত হয়ে হযরত ইবরাহীম ভিখারীটিকে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলেন না। সেই থেকে হযরত ইবরাহীম মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সকল অভাবী মানুষকে দয়া প্রদর্শন করতে এবং সব রকমের অতিথির সমাদর করতেন।

শিক্ষা ঃ

বিপন্ন মানুষের সেবা করার ব্যাপারে জাতি ধর্ম বর্ণ প্রভৃতির ভেদাভেদ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূল (সাঃ) অমুসলিম পথিক বা অতিথিকে পরম সমাদরে আপ্যায়ন করাতেন-এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। হযরত ঈসা (আঃ) এবং অন্যান্য নবীদের জীবনেও এর নজীর রয়েছে। অমুসলিম দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাতের টাকা বা জিনিসপত্র এবং অন্যান্য নফল সদকাও দেয়া যায়। তবে অমুসলিমের ব্যাপারে ইসলামে যে জিনিসটি গুরুত্ব দিয়ে নিষিদ্ধ করেছে তাহলো এই যে,

১. কোন মুসলিমের চেয়ে তাকে অগ্রাধিকার দেয়া যাবে না।
২. তাদের সাথে নিস্প্রয়োজনে বন্ধুত্ব ও মাখামাখি করা যাবে না।
৩. মুসলমানদের নেতৃত্বে ও শাসন ক্ষমতায় তাদেরকে অংশীদার করা যাবে না।

৮৭। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তদীয় পরিবারের মক্কায় পুনর্বাসন

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্বীয় স্ত্রী হাজেরাকে ও পুত্র ইসমাইলকে দুধ খাওয়ার বয়সে নিয়ে মক্কায় আগমন করেন। এখানে কাবা শরীফের নিকটে কিছুটা উঁচুতে জমজমের ওপরে তাদেরকে রাখেন। সে সময় মক্কায় আর কোন মানুষ বাস করতো না এবং সেখানে পানি ছিল না। তিনি স্ত্রী পুত্রের কাছে খোরমা ভর্তি একটি ব্যাগ এবং পানি ভর্তি একটি মশক অর্পণ করেন। তারপর তিনি সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হন। এ সময় ইসমাইলের মা তাঁর পিছু পিছু এগিয়ে যান এবং জিজ্ঞাসা করেনঃ "হে ইবরাহীম! এই জনপ্রাণীহীন মরুভূমিতে আমাদেরকে রেখে আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" হযরত ইবরাহীম কোন জবাব দিলেন না। হযরত হাজেরা পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন। এবারও তিনি নীরব রইলেন। তিনি বললেনঃ "আল্লাহ কি আপনাকে এরূপ করার আদেশ দিয়েছেন?" হযরত ইবরাহীম জবাবে বললেনঃ "হ্যাঁ।" তখন হযরত হাজেরা বললেনঃ "তা হলে আপনি যান। আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না।" অতঃপর তিনি ঘরে ফিরে এলেন। হযরত ইবরাহীম চলতে লাগলেন। যখন তিনি মক্কার শেষ প্রান্তে উপনীত হলেন এবং তার চোখ থেকে কাবা শরীফ উধাও হয়ে গেল, তখন তিনি কাবামুখী হয়ে দু'হাত তুলে এভাবে দোয়া করলেনঃ "হে আমার মনিব! আমি স্বীয় পরিবারকে এক ঊষর মরুপ্রান্তরে তোমার মহিমান্বিত ঘরের কাছে রেখে গেলাম, যেন তারা নামায কায়েম করে। অতএব, হে আমদের প্রতিপালক! মানুষের মনকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফল-মূল ও খাদ্য-শস্য দাও। হয়তো তারা কৃতজ্ঞ হবে।"

ইসমাইলের মা ঐ পানি পান করতে ও ইসমাইলকে দুধ খাইয়ে লালন পালন করতে লাগলেন। যখন পানি ফুরিয়ে গেল, উভয়ে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন। শিশু ইসমাইল তখন ভীষণভাবে ছটফট করছেন। তা দেখে হাজেরা অস্থির হয়ে নিকটবর্তী সাফা পাহাড়ে উঠে কোন মানুষ বা পানি পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখলেন। কিন্তু কিছুই পেলেন না। সেখান থেকে মারওয়া পাহাড়ে গেলেন। সেখানেও কিছু পেলেন না। নিরুপায় ও দিশেহারা অবস্থায় তিনি সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে সাতবার ছুটাছুটি করলেন। বস্তুতঃ এ কারণেই হজ্জের সময় মানুষ সাফা ও মারওয়ার মাঝে ছুটাছুটি করে থাকেন। সহসা মারওয়ায় দাঁড়িয়ে তিনি একটি আওয়াজ শুনলেন। হাজেরা সেই অজানা আওয়াজ উত্থাপনকারীকে বললেনঃ "তোমার আওয়াজ আমার কানে পৌঁছেছে। তবে তোমার কাছে কোন সাহায্যের উপকরণ আছে কিনা

জানাও।" সহসা দেখলেন, জমজমের স্থানে এক ফেরেশতা দাঁড়িয়ে আছে। সেই ফেরেশতা তার পাখা দিয়ে একটু মাটি খুঁড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে পানি বেরিয়ে এলো। হযরত হাজেরা তাঁর মশকটিতে পানি ভরে নিলেন। রাসূল (সাঃ) বলেনঃ হাজেরা যদি তৎক্ষণাত পানিতে হাত না দিতো, তবে তা একটি বিরাট নদীতে পরিণত হতো।

হযরত হাজেরা ঐ পানি নিজে পান করলেন এবং ইসমাইলকে দুধ খাওয়ালেন। ফেরেশতা তাকে বললেনঃ তুমি চিন্তিত হয়ো না। এই স্থানে আল্লাহর একটি ঘর আছে। এই শিশু এবং তার বাবা ঘরটি নতুন করে নির্মাণ করবে। এই ঘরের প্রতিবেশীদেরকে আল্লাহ্ ধ্বংস করবেন না।

তারপর হাজেরা ও ইসমাইল বসবাস করতে লাগলেন। হযরত ইবরাহীম মাঝে মাঝে তাদেরকে দেখতে আসতেন। আবার চলে যেতেন। (ইত্যবসরে ইসমাইলের কুরবানীর ঘটনা ঘটে)। ইতিমধ্যে জমজমের পানির সুবাদে ঐ এলাকায় মানব বসতি গড়ে ওঠে এবং যৌ বনে পদার্পন করার পর হযরত ইসমাইল বিয়ে করেন।

একদিন হযরত ইবরাহীম হযরত ইসমাইলের গৃহে এলেন। তখন হাজেরার ইন্তিকাল হয়েছে এবং ইসমাইলের স্ত্রী গৃহে ছিলেন। হযরত ইবরাহীম পুত্রবধুকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইসমাইল কোথায়? সে বললোঃ খাদ্য সংগ্রহ করতে বাইরে গেছে।

হযরত ইবরাহীমঃ তোমরা কেমন আছ?

পুত্রবধুঃ আমরা খুব অনটনে ও দুরবস্থায় আছি।

হযরত ইবরাহীমঃ ইসমাইল এলে তাকে আমার ছালাম দিও এবং বলো, সে যেন ঘরের কপাটটি পাল্টে ফেলে। এই বলে পুত্রবধুকে নিজের পরিচয় না দিয়ে ইবরাহীম (আঃ) প্রস্থান করলেন।

ইসমাইল গৃহে ফিরলে তার স্ত্রী তাকে আগন্তুক ও তার সাথে তার কথোপকথনের বিবরণ দিল। হযরত ইসমাইল বৃদ্ধ আগন্তুকের হুলিয়া ও কথোপকথনের বিবরণ শুনে বললেনঃ "উনি আমার পিতা। আমাকে তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আদেশ দিয়েছেন। তুমি তোমার বাপের বাড়ী চলে যাও।" অতঃপর ইসমাইল তাকে তালাক দিয়ে নতুন স্ত্রী ঘরে আনলেন।

কিছুদিন পর পুনরায় ইবরাহীম (আঃ) এলেন। এদিনও ইসমাইল গৃহে ছিলেন না। নতুন পুত্রবধু ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার স্বামী কোথায়? সে বললোঃ তিনি আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আনতে গেছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তোমরা কেমন আছ?" সে বললোঃ "আল্লাহর শোকর, আমরা খুব ভালো আছি।"

হযরত ইবরাহীম ঃ তোমরা কি খাও?

পুত্রবধূ ঃ গোশত।

হযরত ইবরাহীম ঃ কি পান কর?

পুত্রবধূ ঃ পানি।

হযরত ইবরাহীম ঃ হে আল্লাহ! এদের খাদ্য ও পানিতে বরকত দাও।

রাসূল (সাঃ) বলেনঃ সেদিন ইসমাইলের ঘরে কোন চাউল বা গম ছিল না। থাকলে সেগুলিতেও তিনি বরকত কামনা করতেন। আজ মক্কায় যে খাদ্যের প্রাচুর্য, তা হযরত ইবরাহীমের দোয়ার ফল।

হযরত ইবরাহীম বললেনঃ ইসমাইল এলে তাকে বলো, সে যেন তার ঘরের কপাট আর না পাল্টায়।

অতঃপর ইসমাইল গৃহে ফিরলে তার স্ত্রী তাকে সমস্ত ঘটনা জানালেন। ইসমাইল বললেনঃ এই আগন্তুক আমার পিতা। 'কপাট' বলে তিনি তোমার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং তোমাকে বহাল রাখতে বলেছেন।

কিছুদিন পর হযরত ইবরাহীম এসে ইসমাইলকে জানালেন যে, আল্লাহ তাকে কাবা শরীফ পুনঃনির্মাণের আদেশ দিয়েছেন। ইসমাইল সানন্দে সায় দিলেন এবং সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। ইসমাইল পাথর বয়ে আনেন এবং হযরত ইবরাহীম কাবা নির্মাণ করেন। এভাবে কাবার পুনঃনির্মাণ সম্পন্ন হয়। (সংক্ষেপিত) (বুখারী)

শিক্ষা ঃ

এই ঘটনাটি বহু মূল্যবান শিক্ষায় পরিপূর্ণ। যেমনঃ

১. সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য। সংসারে অভাব অনটন থাকলে তা মানুষের কাছে ব্যক্ত করা অনুচিৎ।

২. ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা এবং এজন্য পরিবার পরিজনকে রেখে বিদেশে সফর করার প্রয়োজন হলে তাতেও কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। বিশেষতঃ মুমিন মহিলাদের পক্ষ থেকে পুরুষদেরকে এ ব্যাপারে বাধা দেবার পরিবর্তে উৎসাহ দেয়া কর্তব্য।

৩. আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতার অর্থ খাদ্য দ্রব্যের সন্ধানে চেষ্টা না চালিয়ে ঘরে বসে থাকা নয়। হযরত হাজেরা স্ত্রীলোক হয়েও দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ঘরে রেখে খাদ্য ও পানির সন্ধানে বাইরে ছুটাছুটি করেছিলেন। হালাল রুজীর সন্ধানে পর্দা সহকারে বাইরে যাওয়া নারীর জন্যও অবৈধ নহে। তবে স্থায়ী পেশা হিসাবে বহিরাঙ্গনে (যেখানে পুরুষদের উপস্থিতি রয়েছে) চলাফেরা এড়িয়ে চলাই উত্তম।

৪ পুরুষদের ইসলামী দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও নিজ পরিবারের লোকজনদের নৈতিকতা ও তাকওয়া পরহেজগারীর তদারকী অব্যাহত রাখা কর্তব্য এবং তাদের সততা অনুশীলনের বাধা অপসারণ করা অত্যন্ত জরুরী।

৮৮। হযরত মূসা (আঃ) ও পানির বোতল

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) বলেনঃ একবার হযরত মূসা (আঃ) এর মনে প্রশ্ন জাগলো যে, আল্লাহ্ তায়ালা কেন ঘুমান না? আল্লাহ তায়ালা তার মনের প্রশ্ন জানতে পেরে তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। এই ফেরেশতা হযরত মূসার দু'হাতে দু'টো পানি ভর্তি বোতল দিয়ে তা ধরে রাখতে বললেন এবং যতক্ষণ অনুমতি না দেয়া হবে, ততক্ষণ বোতল কোথাও নামিয়ে রাখা চলবে না বলে সাবধান করে দিলেন। হযরত মূসা ফেরেশতাকে আল্লাহর প্রেরিত মনে করে তার আদেশকেও আল্লাহর আদেশ বলে বিশ্বাস করলেন এবং তদনুযায়ী কাজ করলেন।

দীর্ঘ সময় বোতল দু'টো ধরে রাখতে রাখতে তিনি ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর দু'চোখে ঘুম আসতে লাগলো। যখনই ঘুম গাঢ় হয় অমনি দু'হাতের বোতল দু'টি কাছাকাছি চলে আসে এবং সংঘর্ষের উপক্রম হয়। অমনি ফেরেশতা তাকে জাগিয়ে দেন এবং তিনি সতর্ক হয়ে যান। এক সময় তার ঘুম অত্যন্ত প্রবল হলো। দু'হাতের বোতল দু'টো প্রচন্ড শব্দে পরস্পরে আঘাত লেগে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। তখন ফেরেশতা বললেনঃ আল্লাহ্ আপনার জন্য শিক্ষা স্বরূপ এ ঘটনাটি ঘটিয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালা এই বোতল দু'টির মতই আকাশ ও পৃথিবীকে সামাল দিয়ে রেখেছেন। তিনি যদি ঘুমুতেন তাহলে আকাশ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। (বায়হাকী, দারকুতনী)

শিক্ষা ঃ

এ ঘটনাটি থেকে অত্যন্ত মূল্যবান শিক্ষা লাভ করা যায়।

১. ক্ষুধা, ঘুম প্রভৃতি জৈবিক প্রয়োজন সাধারণ সৃষ্ট জীবের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ এ সব দুর্বলতার অনেক ঊর্দ্ধে। তিনি সদা সচেতন ও সদা জাগ্রত। এ জন্যই বিশ্বজগতের নিয়ম শৃংখলা সুষ্ঠুভাবে চালু রয়েছে।

২. এ হাদীস থেকে জানা গেল, আল্লাহ তায়ালা বিশ্বজগতকে শুধু সৃষ্টি করেই অবসর গ্রহণ করেননি বা ক্ষান্ত থাকেননি। বরং তিনি প্রতিটি সৃষ্টির লালন পালনেরও দায়িত্ব পালন করে চলেছেন এবং প্রতি মুহূর্তে তার তত্ত্বাবধান করছেন।

এখানে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, হযরত মূসা (আঃ) এর মতো একজন বিশিষ্ট নবীর মনে এ ব্যাপারে প্রশ্ন দেখা দিল কেন। এর জবাব এই যে, আল্লাহ্ যে ঘুমায় না সে ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাসের কোন দুর্বলতা বা কমতি ছিল না। তিনি কেবল বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে নিরীক্ষণ করে আরো নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন এবং তাতে আপত্তিজনক কিছু নেই। হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কেও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ মৃতকে কিভাবে জীবিত করবেন সে সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা একটি মৃত পাখীকে টুকরো টুকরো করে তাকে পুনরুজ্জীবিত করে দেখিয়েছিলেন এবং তাকে নিশ্চিত করেছিলেন।

মুসনাদে আহমাদে উদ্ধৃত অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, আসলে হযরত মূসার পক্ষ থেকে নয় বরং বনী ইসরাইলের পক্ষ থেকে হযরত মূসার নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ ঘুমান না কেন?

৮৯। হযরত মূসা (আঃ) ও খিজির (আঃ) এর সফর

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ একবার হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাইলের এক সমাবেশে ভাষণ দিলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, পৃথিবীতে কে সবচেয়ে জ্ঞানী? মূসা জবাব দিলেন, আমি। তার এ জবাবে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন। কেননা আল্লাহ্ই যে তার জ্ঞানের উৎস, সে কথা তিনি উল্লেখ করেননি। আল্লাহ্ তাকে বললেন দুই নদীর সংযোগস্থলে আমার এক বান্দা আছে। সে তোমার চেয়েও বেশী জ্ঞানী। মূসা বললেনঃ আমি তাঁর নিকট কিভাবে পৌঁছবো। আল্লাহ্ বললেনঃ তুমি একটি ভাজা মাছ নিয়ে রওনা হও। যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানেই তার সাক্ষাত পাবে। মূসা স্বীয় খাদেম নবী ইউশা ইবনে নূনকে সাথে নিয়ে ভাজা মাছসহ চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তারা সাগর পারের একটি পাথরের কাছে পৌঁছে বিশ্রাম করতে লাগলেন। মূসা সেখানে ঘুমিয়ে পড়লেন। সেই অবসরে মাছটি জীবিত হয়ে সাগরে নেমে গেল। খাদেম ব্যাপারটি জানলেও মূসাকে তা বলতে ভুলে গেল। অতঃপর বিশ্রাম শেষে আবার উভয়ে পথ চলতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে উভয়ে ক্ষুধার্ত হলেন। হযরত মূসা বললেনঃ খাবার আনো। তখন খাদেম বললোঃ শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে কথাটা আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। খাদ্য হিসাবে যে ভাজা মাছটি ছিল তা ইতিপূর্বে আমরা যেখানে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম সেখানে জ্যান্ত হয়ে সমুদ্রে চলে

গেছে। মূসা বললেনঃ ঐ জায়গাটাই তো আমি খুঁজছি। এই বলে তারা আবার সেখানে ফিরে গেলেন।

সেখানে পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি বসে আছে। মূসা তাকে সালাম করলেন। ঐ ব্যক্তি সালামের জবাব দিয়ে বললোঃ এ দেশে তো সালামের রীতি নেই। মূসা বললেনঃ আমি মূসা। লোকটি বললোঃ বনী ইসরাইলের নবী মূসা? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আপনি আল্লাহর কাছ থেকে যে সব নিগুঢ় তত্ত্ব শিখেছেন, তার কিছু কিছু শেখার জন্য আমি এসেছি। আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি? তিনি বললেনঃ হে মূসা! আমি খিযির। আমাকে আল্লাহ্ এমন কিছু জ্ঞান দান করেছেন যা তোমাকে দেননি। আবার তোমাকে এমন কিছু জ্ঞান দান করেছেন যা আমাকে দেননি। এখন আমার সাথে থেকে তুমি ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। কারণ যার রহস্য তুমি জান না, সে সব ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করা সম্ভব নয়। মূসা বললেনঃ ইনশায়াল্লাহ! আমি ধৈর্যধারণ করবো এবং অনুগত থাকবো। খিযির বললেনঃ ঠিক আছে। তুমি যদি থাকতে চাও, তাহলে আমি নিজে যতক্ষণ কোন জিনিসের ব্যাখ্যা না দেবো, ততক্ষণ তুমি কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করতে পারবে না। অতঃপর তারা রওনা দিলেন এবং সাগরের তীর ধরে চলতে লাগলেন। একটি নৌ কায় তারা সাগর পার হলেন। নৌ কার মাঝি খিযিরকে চিনতো বলে তাদের ভাড়াও নিল না। অথচ কিনারে গিয়ে ভিড়া মাত্রই খিযির একখানা কুড়াল দিয়ে নৌ কাটিকে বিরাট ছিদ্র করে দিলেন। মূসা তৎক্ষণাত বলে উঠলেনঃ এ কি করলেন আপনি? বিনা ভাড়ায় নৌ কায় পার হয়ে এমন কান্ডটি ঘটালেন, যাতে যাত্রীরা ডুবে মরে? খিযির বললেনঃ আমি তো বলেছিলাম, তুমি ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। মূসা বললেনঃ আমার ভুল হয়ে গেছে। এবারের জন্য আমাকে মাফ করে দিন।

তারা আবার চলতে লাগলেন।

পথিমধ্যে এক জায়গায় দেখলেন কয়েকটি বালক খেলা করছে। খিযির হঠাৎ একটি বালককে জাপটে ধরলেন এবং ছুরি বের করে তাকে জবাই করে ফেললেন। মূসা এবারও আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। তীব্র প্রতিবাদ করে বললেনঃ সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে এই বালককে হত্যা করে আপনি একটি জঘন্য অপরাধ করেছেন। খিযির এবারও আগের মত বললেন, আমি তো জানতাম তোমার এসব সহ্য হবে না। মূসা বললেনঃ আচ্ছা বেশ! আর যদি কখনো কিছু বলি, আমাকে বিদায় করে দেবেন। খিযির এবারও মাফ করে দিয়ে পুনরায় পথ চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তারা এক গ্রামে হাজির হলেন এবং গ্রামবাসীর কাছে খাবার চাইলেন। কিন্তু তারা খাবার দিল না।

অগত্যা গ্রামটি ত্যাগ করে চললেন। গ্রামের এক প্রান্তে একটি পুরনো প্রাচীর দেখলেন, যা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। খিযির সেই প্রাচীরটি মেরামত করে দিলেন। মূসা এতে ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে বললেন, যে গ্রামবাসী আমাদের মেহমানদারী করলো না তাদের আপনি বিনা মজুরীতে প্রাচীর মেরামত করে দিলেন। ইচ্ছা করলে আপনি অন্ততঃ মজুরী আদায় করতে পারতেন। এবার খিযির বললেনঃ আর তোমাকে নিয়ে চলতে পারলাম না। তুমি এক্ষুনি বিদায় হও। তবে যাবার আগে আমার যে সব কর্মকান্ডের রহস্য বুঝতে না পেরে তুমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলে, তার তাৎপর্য শুনে নাও। নৌ াকাটি ছিদ্র করলাম এ জন্য যে, ঐ এলাকায় এক অত্যাচারী রাজা ছিল, যে কোন নিখুঁত নৌ কা পেলেই তা কেড়ে নিত। আমি নৌ কায় খুঁত করে দিলাম, যাতে তার দরিদ্র চালকরা তাকে কিঞ্চিৎ মেরামত করে তা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে পারে এবং রাজা কেড়ে নিতে না পারে। আর বালকটাকে হত্যা করলাম এ জন্য যে, সে বড় হয়ে কাফের হতো এবং তার মুমিন পিতামাতাকে কষ্ট দিতো। আর প্রাচীরটি মেরামত করার কারণ এই যে, ওর নীচে দু'জন পিতৃহীন শিশুর সম্পদ প্রোথিত ছিল এবং তাদের বড় হওয়া পর্যন্ত ঐ সম্পদ রক্ষিত থাকা দরকার। আর মনে রেখ, এসব কর্মকান্ড আমি নিজের ইচ্ছায় করিনি। বরং আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে করেছি।

পর্যালোচনা ও শিক্ষাঃ

এই ঘটনাটি কুরআনে সূরা কাহাফেও সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তবে আলোচ্য হাদীসে এটি অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে বর্ণিত হওয়ায় এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। আলোচ্য ঘটনায় বর্ণিত হযরত খিযির অধিকাংশ বিজ্ঞ মুফাসসিরদের মতে একজন ফেরেশতা। কেননা এ ধরনের শরীয়ত বিরোধী কর্মকান্ড একজন নবী তো দূরের কথা, কোন সাধারণ মুসলমানের দ্বারাও সংঘটিত হতে পারে না। তবে ফেরেশতারা আল্লাহর হুকুমে এ ধরনের কাজ করতে পারেন। এ ঘটনার প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় হলোঃ

১. কোন ব্যাপারে অহংকার করা উচিত নয়। বিশেষতঃ জ্ঞানের বড়াই অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

২. যে কাজ শরীয়ত বিরোধী মনে হবে, তার প্রতিবাদ সঙ্গে সঙ্গেই করা উচিত। এমনকি প্রতিবাদ না করার ওয়াদা করে থাকলেও সেই ওয়াদা ভঙ্গ করে প্রতিবাদ করা কর্তব্য। হযরত মূসা (আঃ) এই আদর্শই সমুন্নত করেছেন।

৯০। হযরত মূসা (আঃ) ও ইসতিস্কার নামায

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার হযরত মূসা (আঃ) এর আমলে মিশরে ভীষণ খরা ও অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। বনী ইসরাইলের লোকেরা হযরত মূসাকে অনুরোধ জানায় যে, আপনি আমাদেরকে নিয়ে ইসতিস্কার নামায পড়ুন এবং বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন। হযরত মূসা বিপুল সংখ্যক লোককে সাথে নিয়ে একটি মাঠে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ইসতিস্কার নামায পড়লেন এবং অনেক কান্নাকাটি করে দোয়া করলেন। কিন্তু বৃষ্টিও হলো না, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন জবাবও এলো না।

পরদিন তিনি আবার ইসতিস্কার নামায পড়ালেন। এভাবে তৃতীয় দিনও পড়ালেন। শেষের দিন নামাযের পর অনেক বেশী সময় ধরে দোয়া করলেন। দোয়ার পর আল্লাহর কাছ থেকে ওহী এলো যে, "হে মূসা! সমবেত লোকদের মধ্যে এমন একজন লোক রয়েছে যে আজকের আগে আর কখনো আল্লাহর নাম মুখে আনেনি। অধিকন্তু অত্যন্ত জঘন্য পাপ কাজে লিপ্ত ছিল। ঐ লোকটিকে দল থেকে বের করে দিয়ে দোয়া করো। নচেত আমি দোয়া কবুল করবো না।"

হযরত মূসা আল্লাহর ওহীর নির্দেশ সমবেত লোকদেরকে জানালেন এবং বললেন, আল্লাহ এই ব্যক্তির নাম বলেননি তবে এই ব্যক্তি নিজে নিজের সম্পর্কে নিশ্চয়ই ওয়াকিফহাল। দেশের সমগ্র জনগণের স্বার্থে আমি তাকে এই স্থান ত্যাগ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

হযরত মূসা বার বার আবেদন জানাতে লাগলেন। কিন্তু কোন ফলোদয় হলো না। এভাবে কয়েক ঘন্টা কেটে যাওয়ার পর সহসা আকাশে মেঘের আনাগোনা শুরু হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। অতঃপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হলো।

বৃষ্টি হওয়ায় জনগণ খুশী হলেও হযরত মূসা পড়ে গেলেন একটু বেকায়দায়। কারণ ওহীর নির্দেশমত কোন পাপী লোককে বেরিয়ে যেতে দেখা গেলো না। তথাপি বৃষ্টি হলো। এতে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিল যে, হযরত মূসা ওহীর নামে যে কথা বলেছিলেন তা সত্য ছিল কিনা।

অগত্যা তিনি ঘটনার ব্যাখ্যা চাইলেন আল্লাহর কাছে। আল্লাহ জবাবে বললেনঃ হে মূসা! তুমি যখন বারবার পাপীকে স্থান ত্যাগ করার আবেদন জানাচ্ছিলে, সে তখন মনে মনে আমার কাছে অনুশোচনা প্রকাশ করে তওবা করেছিল এবং বলছিলঃ "হে আল্লাহ! এত লোকের সামনে আমাকে অপদস্থও করোনা, আর আমার জন্য দেশবাসীকে কষ্টও দিওনা। আমাকে মাফ করে দিয়ে বৃষ্টি দাও।" আমি তার দোয়া কবুল করে বৃষ্টি দিয়েছি। (বুখারী)

শিক্ষা ঃ গুনাহ্ বা ভুলত্রুটীর জন্য কোন মানুষকে লজ্জা দেয়া বা লোকজনের সামনে হেয় করা উচিত নয়।

৯১। হযরত খিজিরের (আঃ) বদান্যতা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ একবার হযরত খিজির (আঃ) বনী ইসরাইলের কোন বাজারে ঘোরাফিরা করছিলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তার কাছে এসে এভাবে আবেদন জানায়ঃ "হে আগন্তক! আমি একজন ক্রীতদাস। আমার মনিব আমাকে চারশো' দিরহামের বিনিময়ে মুক্তি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখন আমি এই মুক্তিপন সংগ্রহের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছি। আপনার কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করছি। আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন।" হযরত খিজির বললেনঃ "আল্লাহর যা ইচ্ছা, সেটা একভাবে সম্পন্ন হবেই। আমার কাছে তোমাকে দেওয়ার মত একটি কানাকড়িও নেই। আমাকে মাফ কর।" ক্রীতদাসটি পুনরায় বললোঃ "আমি আল্লাহর দোয়াই দিয়ে আপনার কাছে কিছু সাহায্য চাই। আপনার মুখমন্ডলে একজন দানশীল ও মহানুভব ব্যক্তির লক্ষণ পরিস্ফুট। আল্লাহ্ আপনাকে অশেষ বরকত দান করুন।" খিজির আবারো নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে বললেনঃ "তুমি আমাকে একটি দাস হিসাবে বাজারে বিক্রী করে যে অর্থ সংগ্রহ করতে পারো, কর। এ ছাড়া আর কোন ভাবে তোমাকে সাহায্য করতে আমি সক্ষম নই।" ক্রীতদাসটি বললোঃ "এটা কি সমিচীন হবে?" খিজির বললেনঃ "অবশ্যই, তুমি একটি গুরুতর বিপদে পড়ে আমার সাহায্য চেয়েছ। আমি তোমাকে বঞ্চিত করতে চাই না। তুমি আমাকে বিক্রী কর।"

এরপর লোকটি তাকে বাজারে নিয়ে যায় এবং চারশো দিরহামে বিক্রী করে। যে ব্যক্তি হযরত খিজিরকে কিনে নিয়ে যায়, সে তাকে কোন কাজে না লাগিয়ে অতিথির মত যত্নে রাখে। কিছুদিন পর হযরত খিজির তাকে বললেনঃ "আপনি আমাকে নিজের কাজকর্মের জন্যই কিনে এনেছেন। অথচ কোন কাজ করতে দিচ্ছেন না। এ কেমন কথা। আমাকে কাজের আদেশ দিন।"

মনিব বললোঃ "আপনি একজন বয়োবৃদ্ধ প্রবীণ ব্যক্তি। আপনাকে কাজে খাটিয়ে কষ্ট দেয়াটা আমার অপছন্দ।" হযরত খিজির বললেনঃ "আমার কোন কষ্ট হবে না। আপনি আদেশ করে দেখুন।" তখন মনিব বললোঃ "বেশ, তাহলে এই পাথরটি সরিয়ে ওখানটায় রাখুন।" আদেশ দিয়ে মনিব বিশেষ কাজে বাইরে গেল। পাথরটি এত বিরাট ও ভারী ছিল যে, ছয়জন মানুষ একটানা সারাদিন পরিশ্রম করা ছাড়া তা সরানো সম্ভব ছিল না। অথচ

একঘন্টা পরে মনিব ফিরে এসে দেখে, বৃদ্ধ ক্রীতদাস একাই পাথর যথাস্থানে সরিয়ে রেখেছে। সে বললোঃ "আপনি চমৎকার কাজ করেছেন। এত বড় শক্ত কাজ করার ক্ষমতা আপনার আছে, তা আমার ধারণারও বাইরে ছিল।"

কিছুদিন পর মনিবের প্রবাসে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। সে হযরত খিজিরকে বললোঃ "আমি আপনাকে একান্ত বিশ্বস্ত, সৎ ও আমানতদার লোক মনে করি। আমার অবর্তমানে আপনি আমার পরিবার পরিজনকে ন্যায় সংগত আচরণ সহকারে দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করবেন।" বৃদ্ধ ক্রীতদাস বললোঃ "আর কোন কাজ থাকলে তাও বলে যান।" সে বললোঃ "আপনাকে বাড়তি কষ্ট দেয়া আমার মনোপুত নয়।" ক্রীতদাস বললো, "আমার কোন কষ্ট হবে না।" অগত্যা মনিব বললোঃ "বেশ, তাহলে আমার ঘরের ভিত্ তৈরীর অপেক্ষায় রয়েছে। আপনি কিছু ইটা লাগিয়ে কিছুটা ভিতের কাজ করে রাখবেন।" এরপর মনিব সফরে বেরিয়ে গেল। সফর থেকে ফিরে সম্পূর্ণ ভিত তৈরী হয়ে গেছে দেখে সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। এবার সে তার বৃদ্ধ ক্রীতদাসকে বললোঃ "আল্লাহর দোহাই, আপনি কে এবং আপনার রহস্য কি আমাকে খুলে বলুন।"

হযরত খিজির বললেন, "আপনি যেমন আল্লাহর দোহাই দিয়েছেন, তেমনি আল্লাহর দোহাই দিয়ে অন্য একজনের প্রার্থনাই আমাকে এই দাসত্বের পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে। আমি কে সে কথা আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। আমি খিজির। আমার নাম আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। দেয়ার মত একটি কপর্দকও তখন আমার কাছে ছিল না। তাই অক্ষমতা জানালাম। কিন্তু সেই নাছোড়বান্দা আমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে পুনরায় মিনতি জানালো কিছু সাহায্যের জন্য। তখন আমি নিজেকে তার মালিকানায় সোপর্দ করি। অতঃপর সে আমাকে বাজারে বিক্রি করে। আমি আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, যে ব্যক্তির কাছে কোন অসহায় ব্যক্তি আল্লাহর দোহাই দিয়ে কোন সাহায্য চাইবে এবং সে দিতে সক্ষম হয়েও তাকে বঞ্চিত করবে, সে কেয়ামতের দিন অত্যন্ত জীর্নশীর্ণ হাড্ডিসার অবস্থায় উঠবে।

এ কথা শোনার পর মনিব বললো "আমি আল্লাহর ও আপনার ওপর ঈমান এনেছি। হে আল্লাহর নবী! না জেনে শুনে আপনাকে কষ্ট দেয়ায় আমি অনুতপ্ত।" হযরত খিজির বললেনঃ "তাতে আপনার কোন দোষ হয়নি। আপনি যা করেছেন সততার সাথে ও সুষ্ঠুভাবেই করেছেন।" মনিব বললোঃ "হে আল্লাহর নবী! আপনি আমার সহায় সম্পদ ও পরিবার পরিজন সম্পর্কে যেমন ভালো মনে করেন, আদেশ দিলে আমি তদনুযায়ী কাজ করবো, নচেত আপনি মুক্তি চাইলে মুক্ত করে দেবো।"

হযরত খিজির বললেনঃ "আমার প্রত্যাশা এই যে, আমাকে মুক্তি দিন যাতে আমি নিজের আসল মনিব আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত হতে পারি।" অতঃপর লোকটি তাকে মুক্ত করে দিল। তখন হযরত খিজির বললেনঃ "মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। যিনি আমাকে মানুষের গোলামীর বন্ধনে আবদ্ধ করার পর তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।" (তাবরানী-তারগীব ও তারহীব)

শিক্ষা ঃ উল্লিখিত কেস্‌সাটি থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যেঃ

১. কোন অধিনস্ত ব্যক্তি বেশভূষায় যত মামুলী ও নগন্য মনে হোক না কেন, বয়সে প্রবীণ ও আচরণে ন্যায়পরায়ন হলে তার সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে হবে এবং তার দৈহিক খাটুনি যথাসম্ভব কমিয়ে দিতে হবে। ইসলামের ইতিহাসে এমন অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, জ্ঞানীগুণী ও চরিত্রবান ব্যক্তি দাস বংশোদ্ভূত বা স্বয়ং কোন ক্রীতদাস হলেও তাকে সমাজ ও রাষ্ট্রে যথোপযুক্ত মর্যাদাপূর্ণ আসন দান করা হয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তি খিলাফাতে রাশেদার আমলে রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি, সেনাপতি, মুফতী ও মুহাদ্দীস এবং ভারতে দিল্লীর শাহী মসনদেও আসীন হয়েছেন।

২. বিশেষতঃ কোন দুস্থ ব্যক্তি যদি আল্লাহর দোহাই দিয়ে কোন সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহলে তাকে কিছুতেই খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়া উচিত নয়। কারণ তার আল্লাহর দোহাই দেয়ার অর্থ এও হতে পারে যে, সে নিজের অভাবের সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহর নামে শপথ করছে বা আল্লাহকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করছে। কাজেই তাকে বঞ্চিত করার অর্থ হবে তার শপথকে অগ্রাহ্য বা অবমাননা করা। তবে যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, সে ব্যক্তি স্বয়ং অভাবী বা অসমর্থ হলে সেটা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

৩. মানুষ মূলতঃ একমাত্র আল্লাহর গোলাম বা দাস। কোন মানুষের গোলামী- চাই তা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত যেভাবেই হোক না কেন, তা তার জন্য এক শোচনীয় অভিশাপ ছাড়া আর কিছু নয়। তাই যে কোন মানুষের গোলামী বা পরাধীনতা ঘুচানো ও তাকে স্বাধীন মানুষের মর্যাদা দানের জন্য সাধ্যমত সব কিছু করা ও সব রকমের ত্যাগ স্বীকার করা প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য।

৪. নিয়োগকারীর যেমন কর্তব্য শ্রমিক ও কর্মচারীদের সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য না করা, তেমনি শ্রমিক কর্মচারীদেরও উচিৎ কাজে ফাঁকি না দেয়া এবং যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করা। অধিনস্থদের ওপর ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ চাপানো যেমন গুনাহ, তেমনি বেতনভুক কর্মচারীরা কাজে

ফাঁকি দিয়ে বেতন ও পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে তা হারাম ও অবৈধ উপার্জনে পরিণত হবে।

৫. পরোপকার ও জনসেবা চিরদিন আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ ও নবীগণের একটি মহান ব্রত। আলোচ্য ঘটনায় আল্লাহর নবী হযরত খিজির ক্রীতদাসের ছদ্মবেশ ধারণ করে একজন দাসকে মুক্ত করার যে অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অনুকরণীয়। হযরত ঈসা, হযরত ইবরাহীম এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহ প্রায় সকল নবীর জীবনে আমরা এ ধরনের মহানুভবতার নজীর দেখতে পাই। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, মুসলিম জাতির বিশেষতঃ সচ্ছল ও বিত্তশালী লোকদের মধ্যে এই শিক্ষার প্রভাব ক্রমশঃ লোপ পেতে চলেছে। ফলে দরিদ্র মুসলমানগণ সর্বত্র নিগৃহীত ও খৃস্টান ধর্মযাজকদের প্রলোভন ও প্রতারণার শিকার হচ্ছে।

৯২। শাদ্দাদের বেহেশতের কাহিনী

হযরত হুদ আলাইহিস সালামের আমলে শাদ্দাদ নামে একজন অতীব পরাক্রমশালী ও ঐশ্বর্যশালী মহারাজা ছিল। আল্লাহর হুকুমে হযরত হুদ (আঃ) তার নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন এবং দাওয়াত গ্রহণ করলে আখেরাতে বেহেশত অন্যথায় দোজখে যাওয়া অবধারিত বলে জানান। শাদ্দাদ তাঁর নিকট বেহেশত ও দোজখের বিস্তারিত বিবরণ জানতে চাইলে হযরত হুদ (আঃ) তাকে বিস্তারিত বিবরণ জানান। শাদ্দাদ তাঁকে বললোঃ তোমার আল্লাহর বেহেশত আমার প্রয়োজন নেই। বেহেশতের যে নিয়ামত ও সুখ-শান্তির বিবরণ তুমি দিলে, অমন বেহেশত আমি নিজে এই পৃথিবীতেই বানিয়ে নেব। তুমি দেখে নিও।

হযরত হুদ (আঃ) তাকে হুঁশিয়ার করে দিলেন যে, আল্লাহর পরকালে যে বেহেশত তৈরী করে রেখেছেন, তোমার বানানো বেহেশত তার ধারে কাছেও যেতে পারবে না। অধিকন্তু তুমি আল্লাহর সাথে পাল্লা দেয়ার জন্য অভিশপ্ত হবে। কিন্তু শাদ্দাদ কোন হুঁশিয়ারীর তোয়াক্কা করলো না। সে সত্যি সত্যিই দুনিয়ার ওপর একটি সর্বসুখময় বেহেশত নির্মাণের পরিকল্পনা করলো। তার ভাগ্নে জোহাক তাজী তখন পৃথিবীর অপর প্রান্তে এক বিশাল সম্রাজ্যের অধিকারী ছিল। অধিকন্তু পারস্যের সম্রাট জামসেদের সম্রাজ্য দখল করে সে প্রায় অর্ধেক দুনিয়ার প্রবল প্রতাপশালী সম্রাটে পরিণত হয়েছিল। মহারাজা শাদ্দাদ সম্রাট জোহাক তাজীকে চিঠি লিখে তার বেহেশত নির্মাণের পরিকল্পনা জানালো। অতপর তাকে লিখলো যে, তোমার রাজ্যে যত স্বর্ণ-রৌপ্য, হিরা-

জহরত ও মনি-মানিক্য আছে তা সব সংগ্রহ করে আমার দরবারে পাঠিয়ে দাও। আর মেশক আম্বর প্রভৃতি সুগন্ধী দ্রব্য যত আছে, তাও পাঠিয়ে দাও।

অন্যান্য অনুগত রাজা মহারাজাদের নিকটও সে একইভাবে চিঠি লিখলো এবং বেহেশত নির্মাণের পরিকল্পনা জানিয়ে সবাইকে প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রী পাঠানোর আদেশ জারী করলো। পৃথিবীর সকল অঞ্চলের অনুগত রাজা-মহারাজারা তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলো।

এবার বেহেশতের স্থান নির্বাচনের পালা। বেহেশত নির্মাণের উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করার জন্য শাদ্দাদ বহু সংখ্যক সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করলো। অবশেষে ইয়ামানের একটি শস্য শ্যামল অঞ্চলে প্রায় একশো চল্লিশ বর্গমাইল এলাকার একটি জায়গা নির্বাচন করা হলো।

বেহেশত নির্মাণের জন্য নির্মাণ সামগ্রী ছাড়াও বিভিন্ন দেশ থেকে বাছাই করা দক্ষ মিস্ত্রী আনা হলো। প্রায় তিন হাজার সুদক্ষ কারিগরকে বেহেশত নির্মাণের কাজে নিয়োগ করা হলো। নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গেলে শাদ্দাদ তার অধীনস্থ প্রজাদের জানিয়ে দিল যে, কারো নিকট কোন সোনা রূপা থাকলে সে যেন তা গোপন না করে এবং অবিলম্বে রাজ দরবারে পাঠিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে তল্লাশী চালানোর জন্য হাজার হাজার কর্মচারীকে নিয়োগ করা হলো। এই কর্মচারীরা কারো কাছে এক কণা পরিমাণ সোনা রূপা পেলেও তা কেড়ে নিতে লাগলো। এক বিধবার শিশু মেয়ের কাছে চার আনা পরিমাণ রূপার গহনা পেয়ে তাও তারা কেড়ে নিল। মেয়েটি কেঁদে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। তা দেখে বিধবা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানালো যে, হে আল্লাহ, এই অত্যাচারী রাজাকে তুমি তার বেহেশত ভোগ করার সুযোগ দিও না। দুঃখিনী মজলুম বৃদ্ধার এই দোয়া সম্ভবতঃ কবুল হয়ে গিয়েছিল।

ওদিকে মহারাজা শাদ্দাদের বেহেশত নির্মাণের কাজ ধুমধামের সাথে চলতে লাগলো। বিশাল ভূখন্ডের চারিদিকে চল্লিশ গজ জমি খনন করে মাটি ফেলে দিয়ে মর্মর পাথর দিয়ে বেহেশতের ভিত্তি নির্মাণ করা হলো। তার ওপর সোনা ও রূপার ইট দিয়ে নির্মিত হলো প্রাচীর। প্রাচীরের ওপর জমরূদ পাথরে ভীম ও বর্গার ওপর লাল বর্ণের মূল্যবান আলমাছ পাথর ঢালাই করে প্রাসাদের ছাদ তৈরী হলো। মূল প্রাসাদের ভেতরে সোনা ও রূপার কারুকার্য খচিত ইট দিয়ে বহু সংখ্যক ছোট ছোট দালান তৈরী করা হলো।

সেই বেহেশতের মাঝে মাঝে তৈরী করা হয়েছিল সোনা ও রূপার গাছ গাছালি এবং সোনার ঘাট ও তীর বাধা পুষ্করিনী ও নহর সমূহ। আর তার কোনটি দুধ, কোনটি মধু ও কোনটি শরাব দ্বারা ভর্তি করা হয়েছিল। বেহেশতের মাটির পরিবর্তে শোভা পেয়েছিল সুবাসিত মেশক ও আম্বর এবং

মূল্যবান পাথর দ্বারা তার মেঝে নির্মিত হয়েছিল। বেহেশতের প্রাঙ্গন মনি মুক্তা দ্বারা ঢালাই করা হয়েছিল।

বর্ণিত আছে যে, এই বেহেশত নির্মাণ করতে প্রতিদিন অন্ততঃ চল্লিশ হাজার গাধার বোঝা পরিমাণ সোনা রূপা নিঃশেষ হয়ে যেত। এইভাবে একাধারে তিনশো বছর ধরে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।

এরপর কারিগরগণ শাদ্দাদকে জানালো যে, বেহেশত নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। শাদ্দাদ খুশী হয়ে আদেশ দিল যে, এবার রাজ্যের সকল সুন্দর সুন্দর যুবক-যুবতী ও বালক-বালিকাকে বেহেশতে এনে জড়ো করা হোক। নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত হলো।

অবশেষে একদিন শাদ্দাদ সপরিবারে স্বীয় বেহেশত অভিমুখে রওনা হলো। তার অসংখ্য লোক লশকর বেহেশতের সম্মুখস্ত প্রান্তরে তাকে অভিবাদন জানালো। শাদ্দাদ অভিবাদন গ্রহণ করে বেহেশতের প্রধান দরজার কাছে গিয়ে উপনীত হলো। দেখলো, একজন অপরিচিত লোক বেহেশতের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সে তাকে জিজ্ঞাসা করলোঃ তুমি কে?

লোকটি বললেনঃ আমি মৃত্যুর ফেরেশতা আজরাইল।

শাদ্দাদ বললোঃ তুমি এখন এখানে কি উদ্দেশ্যে এসেছ?

আজরাইল বললেনঃ আমার প্রতি নির্দেশ এসেছে তোমার জান কবজ করার।

শাদ্দাদ বললোঃ আমাকে একটু সময় দাও। আমি আমার তৈরী পরম সাধের বেহেশতে একটু প্রবেশ করি এবং এক নজর ঘুরে দেখি।

আজরাইল জবাব দিলেনঃ তোমাকে এক মুহূর্তও সময় দানের অনুমতি নেই।

শাদ্দাদ বললোঃ তাহলে আমাকে অন্ততঃ ঘোড়া থেকে নামতে দাও।

আজরাইল বললেনঃ না, তুমি যে অবস্থায় আছ, এই অবস্থায়ই তোমার জান কবজ করা হবে।

শাদ্দাদ ঘোড়া থেকে এক পা নামিয়ে দিল। কিন্তু তা বেহেশতের চৌ কাঠ স্পর্শ করতে পারলো না। এই অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটলো। তার বেহেশতের আশা চিরতরে নির্মূল হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে আল্লাহর নির্দেশে জিবরাইল (আঃ) এক প্রচন্ড আওয়াজের মাধ্যমে শাদ্দাদের বেহেশত ও লোক লস্কর সব ধ্বংস করে দিলেন। এভাবে শাদ্দাদের রাজত্ব চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে যে, হযরত মুয়াবীয়ার রাজত্বকালে আব্দুল্লাহ বিন কালব নামক এক ব্যক্তি ইয়ামানের একটি জায়গায় একটি মূলবান পাথর পেয়ে তা হযরত মোয়াবীয়ার নিকট উপস্থাপন করেন।

সেখানে তখন কা'ব বিন আহ্‌বার নামক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি উক্ত মূল্যবান রত্ন দেখে বললেন, এটি নিশ্চয়ই শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের ধ্বংসাবশেষ। কেননা আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতের মধ্যে আব্দুল্লাহ নামক এক ব্যক্তি শাদ্দাদের বেহেশতের স্থানে গিয়ে কিছু নিদর্শন দেখতে পাবে।

শিক্ষা ঃ এই কাহিনীর সবচেয়ে বড় শিক্ষা এই যে, জুলুম ও নির্যাতনের মাধ্যমে অপহৃত সম্পদ অনেক সময় কাজে লাগে না। আর মজলুমের দোয়া যে আল্লাহর কাছে অবধারিতভাবে কবুল হয়ে থাকে, সে কথা একাধিক হাদীস থেকেও জানা যায় এবং এই ঘটনার মাধ্যমেও তা আরেকবার জানা গেল।

৯৩। হযরত ঈসা (আঃ) এর উম্মতের এক দরবেশের কাহিনী

ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আকাশে উত্থিত হওয়ার পর যখন তাঁর উম্মতের মধ্যে নানা রকমের শেরক ও বিদয়াতের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে, তখন যারা হযরত ঈসা (আঃ) আনীত আল্লাহর আসল দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেন এবং তার প্রচার চালাতে থাকেন, তাদের একটি দল এক সময়ে ইয়ামানের নাজরান প্রদেশে বসতি স্থাপন করে। এই দলটির যিনি নেতা ছিলেন তাঁর নাম ছিল ফিমিউন। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত সৎ, ন্যায়পরায়ন, দুনিয়ার স্বার্থত্যাগী ও কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তি। তাঁর দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হতো। প্রথমে তিনি দেশ থেকে দেশান্তরে সফর করে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করতেন এবং প্রধানতঃ পল্লী অঞ্চলের মানুষের অতিথি হতেন। যে গ্রামেই তিনি পুণ্যবান ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হয়ে যেতেন সেখান থেকে অন্যত্র চলে যেতেন, যেখানে কেউ তাকে চেনে না। কেননা তিনি আশংকা করতেন যে, ভক্তদের ভক্তি ও আতিথেয়তার বাড়াবাড়ি তাকে দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন করে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যেতে পারে। তিনি শুধু নিজের উপার্জন থেকে খাওয়া দাওয়া করতেন। ঈসায়ী শরিয়তের বিধি অনুযায়ী তিনি রবিবারে কোন কাজ করতেন না এবং সেদিন একটি নির্জন এলাকায় গিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নামায ও ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। একবার সিরিয়ার একটি গ্রামে অবস্থানকালে তিনি গোপনে নামায পড়েন। কিন্তু একজন গ্রামবাসী তা দেখে ফেলে। তার নাম ছিল সালেহ। সে ফিমিউনকে এত ভালোবেসে ফেললো যে জীবনে সে আর কখনো কাউকে অতটা ভালোবাসেনি। ফিমিউন যেখানে যেতেন সে তার

সাথে সেখানে যেতো, কিন্তু ফিমিউন তা টের পেতেন না। একদিন রবিবার তিনি যথারীতি নির্জন জায়গায় গেলে তার অজান্তেই সালেহ্ তাঁর পিছু পিছু যায়। সালেহ্ অতি সংগোপনে অদূরে বসে তার কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগলো। দেখলো ফিমিউন নামায পড়ছেন। নামায পড়ার সময় সহসা দেখলো, তানীন নামক সাত শিংধারী একটা সাপ ফিমিউনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ফিমিউন সাপকে দেখে তার মৃত্যুর জন্য দোয়া করতেই সাপটি মারা পড়লো। সালেহ্ সাপকে তার দিকে এগুতে দেখেছিল, কিন্তু সে যে মারা গেছে, তা সে দেখতে পায়নি। সে ভয়ে চিৎকার করে বললোঃ "ওহে ফিমিউন! তোমার দিকে সাপ এগিয়ে গেছে।" কিন্তু ফিমিউন তার চিৎকারে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তিনি নামায অব্যাহত রাখলেন এবং শেষ করলেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে তিনি চলে গেলেন। ফিমিউনের জানতে বাকী থাকলো না যে, এখানে লোকজন তাকে চিনে ফেলেছে। আর সালেহ্ও বুঝতে পারলো যে, ফিমিউন তার উপস্থিতি টের পেয়ে গেছেন। সে তাঁকে বললোঃ "হে ফিমিউন! তুমি নিশ্চয়ই অবগত আছ যে, আমি আজ পর্যন্ত তোমার মত কাউকে ভালবাসিনি। আমি তোমার সাথে থাকতে চাই।"

ফিমিউন বললেনঃ "তোমার ইচ্ছাটা মন্দ নয়। তবে আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। তুমি যদি মনে কর, এভাবে আমার সাথে টিকে থাকতে পারবে, তাহলে থাকো।" সালেহ্ তার সহচর হয়ে গেল। গ্রামবাসী ফিমিউনের রহস্য প্রায় বুঝে ফেলার উপক্রম করেছিল। সে সময় কোন ব্যক্তির হঠাৎ কোন অসুখ-বিসুখ হলে বা দুর্ঘটনা ঘটলে ফিমিউন তার জন্য দোয়া করতেন এবং তৎক্ষণাত সে ভালো হয়ে যেতো। কিন্তু কোন বিপন্ন বা রুগ্ন ব্যক্তি তাকে ডাকলে তিনি যেতেন না। এক গ্রামবাসীর ছেলের অসুখ হলো। সে ফিমিউনের বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে জানলো যে, কারো বাড়ী তাকে ডাকা হলে তিনি যান না। তবে তিনি মজুরীর বিনিময়ে মানুষের বাড়ীঘর নির্মাণ করেন। লোকটি তার ছেলেকে নিজের কক্ষে রাখলো এবং তাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল। তারপর সে ফিমিউনের কাছে গিয়ে বললোঃ "ওহে ফিমিউন! আমি নিজের বাড়ীতে কিছু কাজ করাতে চাই। তুমি আমার সাথে চল, কি কাজ করতে হবে তা দেখে আসবে।" ফিমিউন তার সাথে গেলেন এবং তার কক্ষে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি সেই গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার এ ঘরে আপনি কি কাজ করতে চান? লোকটি কাজের বিবরণ দিয়ে বালকের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে ফেললো এবং বললোঃ "হে ফিমিউন! এই যে আল্লাহর এক বান্দা অসুস্থ। তার ভালো

হওয়ার জন্য দোয়া করুন।" তিনি দোয়া করতেই বালক সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

ফিমিউন বুঝলেন, এখানেও তিনি পরিচিত হয়ে গেছেন। তাই তিনি ঐ গ্রাম থেকে প্রস্থান করলেন। সালেহ তাঁর সাথে চললো। সিরিয়ার একটি অঞ্চল দিয়ে চলার সময় পার্শ্ববর্তী একটি প্রকান্ড গাছের ওপর থেকে এক ব্যক্তি ডাকলোঃ "হে ফিমিউন!" ফিমিউন ডাকে সাড়া দিলেন। সে বললোঃ আমি তোমার অপেক্ষায় রয়েছি এবং ভাবছি, কখন তুমি আসবে। সহসা তোমার আওয়াজ শুনে চিনলাম যে তুমি এসেছ। তুমি যেওনা। আমি এক্ষুনি মারা যাচ্ছি, তুমি আমার জানাজা পড়াবে। লোকটি সত্যিই মারা গেল। ফিমিউন তার জানাজা পড়ালেন এবং দাফন করলেন। তারপর আবার রওনা হলেন এবং সালেহ তাকে অনুসরণ করলো। এ সময় তারা আরব ভূখন্ডের বেশ খানিকটা অতিক্রম করে ফেলেছেন। সহসা একটি আরব কাফেলা তাদের উভয়কে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে নাজরানে বিক্রি করলো। নাজরানবাসী তখন বাদবাকী আরবদের মত পৌ ত্তলিক। তারা তাদের সামনে অবস্থিত একটি দীর্ঘ খেজুর গাছের পূজা করতো। প্রতি বছর তার কাছে মেলা বসতো। মেলার সময় লোকেরা ঐ গাছকে সবচেয়ে সুন্দর কাপড় ও অলংকারাদি উৎসর্গ করতো। কাফেলাটি ঐ গাছের কাছে গেল এবং সেখানে একদিন অবস্থান করলো।

নাজরানের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কাফেলার কাছ থেকে ফিমিউনকে এবং অপর একজন সালেহকে কিনে নিল। রাতে ফিমিউনকে তার মনিব যে ঘরে থাকতে দিত, তিনি সেখানে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। তাঁর ঘরটি কোন আলো ছাড়াই সারারাত আলোকিত থাকতো। তাঁর মনিব এটা দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলো। সে তাঁকে তাঁর ধর্ম কি জিজ্ঞেস করলো। ফিমিউন তাকে তাঁর ধর্মের বিষয়ে অবহিত করলেন এবং বললেনঃ তোমরা গোমরাহীর ভেতরে লিপ্ত আছ। এই খেজুর গাছ কারো ক্ষতি বা উপকার কিছুই করতে পারে না। আমি যে খোদার ইবাদত করি তাকে যদি আমি বলি এই গাছকে ধ্বংস করে দিন, তিনি অবশ্যই তাকে ধ্বংস করে দেবেন। তিনি আল্লাহ, তার কোন শরীক নাই। তার মনিব বললোঃ বেশ তুমি গাছটাকে ধ্বংস করে দেখাও তো দেখি। এটা করতে পারলে আমরা সকলে তোমার ধর্ম গ্রহণ করবো এবং আমাদের ধর্ম ত্যাগ করবো। ফিমিউন ওজু করে দু'রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে ঐ গাছটির ধ্বংসের জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ তৎক্ষণাত একটা ঝড় বইয়ে দিয়ে গাছটিকে সমূলে উৎপাটিত করে মাটিতে ফেলে

দিলেন। তখন নাজরানবাসী তার ধর্মে দীক্ষিত হলো। তারা হযরত ঈসা (আঃ) এর আসল ও অবিকৃত শরীয়তের অনুসারী হলো। এরপর নাজরানবাসীর ওপর এমন কিছু আপদ নেমে আসে, যা দুনিয়ার সর্বত্র সত্য দ্বীনের অনুসারীদের ওপর নেমে থাকে। সেই থেকে নাজরানে ঈসায়ী ধর্মের অভ্যুদয় ঘটে।

শিক্ষা ঃ এই ঘটনাটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এই যে, ইসলাম প্রচারের কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের সব সময় নিজস্ব স্বতন্ত্র জীবিকার ব্যবস্থা রাখা উচিত। যাতে জীবিকার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল, লোভ মুক্ত ও হালাল উপার্জনে ব্রতী থাকা যায়। আর সর্বাবস্থায় তাদের দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়া ও তাকওয়া ভিত্তিক জীবন যাপন করা উচিত।

৯৪। হযরত সোলায়মানের (আঃ) ন্যায় বিচার

(ক) হযরত সোলায়মান (আঃ) এর আমলে একদিন দুই মহিলা তাঁর দরবারে বিচারপ্রার্থী হয়ে এলো। এদের একজনের কোলে ছিল একটি শিশু। কিন্তু উভয় মহিলাই শিশুটি নিজের বলে দাবী জানাচ্ছিল।

হযরত সোলায়মান প্রথমে উভয়ের যুক্তি প্রমাণ আলাদা আলাদা ভাবে শুনলেন। তারপর তিনি উভয়কে একটি সমঝোতায় উপনীত হওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তারা কিছুতেই সমঝোতায় আসতে রাজী হলো না। অগত্যা হযরত সোলায়মান এই মর্মে রায় দিলেন যে, তোমরা যখন কোনমতেই আপোষ রফা করতে রাজী নও, তখন এই শিশুকে আমি দ্বিখন্ডিত করে উভয়কে সমান সমান অংশ দিয়ে দেব।

এ কথা শুনে এক মহিলা তো নীরব রইল। কিন্তু অপরজন চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। সে বললোঃ "দোহাই আল্লাহর! আপনি শিশুটিকে কাটবেন না। ওকে বরং ঐ মহিলার কোলেই দিয়ে দিন, ও বেঁচে থাকুক। আমি না হয় মাঝে মাঝে দিয়ে দেখে আসবো।"

এ কথা শোনার পর হযরত সোলায়মানের আর বুঝতে বাকী থাকলো না যে, শেষোক্ত মহিলাই শিশুটির আসল মা। তাই শিশুটি তিনি তাকেই দিলেন। (বুখারী)

৪. **শিক্ষা ঃ** একজন ন্যায় পরায়ন ও বিচক্ষণ শাসক বা বিচারককে শুধু শরীয়ত ও আইন জানলেই চলে না সেই সাথে মানুষের মনস্তত্বও জানতে হয়। নচেৎ সুবিচার নিশ্চিত করা যায় না।

(খ) একবার দুই ব্যক্তি হযরত দাউদ (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হলো। তাদের একজন ছাগল-ভেড়া পালন এবং অপরজন কৃষি কাজ করে

জীবিকা নির্বাহ করতো। কৃষিজীবী লোকটি ছাগল-ভেড়া পালনকারীর বিরুদ্ধে নালিশ করলো যে, সে নিজের একপাল ছাগল ভেড়া ছেড়ে দিয়ে আমার ক্ষেতের সমস্ত ফসল খাইয়ে ফেলেছে। হযরত দাউদ (আঃ) অভিযুক্ত ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করলেন। অতঃপর যে ছাগল ভেড়াগুলো ফসল নষ্ট করেছে, সবগুলোর দামও জেনে নিলেন। তিনি যখন জানলেন যে, নষ্টকৃত ফসরের মূল্য নষ্টকারী ছাগল ভেড়াগুলোর সমান, তখন তিনি ফসলের মালিককে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঐ ছাগল ভেড়াগুলো দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর বাদী বিবাদী দরবার থেকে বেরিয়ে গেল।

যখন তারা দরজার বাইরে এলো, তখন হযরত সোলায়মানের সাথে তাদের দেখা হলো। তিনি জানতে চাইলেন যে, তাদের মামলার বিচার কিভাবে হয়েছে। জবাবে তারা হযরত দাউদের রায় শুনিয়ে দিল। হযরত সোলায়মান তাদেরকে অপেক্ষা করতে বললেন এবং পিতা হযরত দাউদের কাছে গিয়ে বললেন যে, এই মামলার নিস্পত্তির ব্যাপারে আমার একটা ভিন্ন মত ছিল। সেই মত গ্রহণ করলে উভয় পক্ষ উপকৃত হবে। হযরত দাউদ জিজ্ঞাসা করলেন, সেটি কি? হযরত সোলায়মান বললেনঃ ছাগল ভেড়াগুলোকে ক্ষেতের মালিকের নিকট এবং ক্ষেতকে ছাগলের মালিকের নিকট অর্পণ করা হোক। যখন সে ছাগল ভেড়ার দুধ মাংস ইত্যাদি খেয়ে ক্ষতি পূর্ণ আদায় করে নেবে, তখন ছাগল ভেড়া ও জমি মূল মালিকের কাছে ফেরত যাবে। ইত্যবসরে ক্ষেতের ফসল আগের অবস্থায় ফিরে যাবে এবং ছাগলের মালিক উপার্জনের উপকরণ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় অভাবে পড়বে না। কেননা জমি চাষ করে ফসল ফলিয়ে সে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। হযরত দাউদ এই রায়টি মেনে নিলেন এবং নিজের রায় পাল্টে ফেললেন।

শিক্ষা ঃ অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার পাশাপাশি তার কল্যাণের কথা চিন্তা করাও প্রত্যেক বিচারকের কর্তব্য। অপরাধীকে এমন শাস্তি দেয়া উচিত নয় যাতে সে দেউলে হয়ে যায় এবং পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়।

৯৫। হযরত ইউনুস (আঃ) এর কাহিনী

ইরাকের নিনোয়া নামক স্থানে হযরত ইউনুস (আঃ) কে মানুষের হেদায়াতের জন্য পাঠানো হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ঈমান আনয়ন ও নেক

কাজ করার আহ্বান জানাতে থাকেন। কিন্তু তারা ক্রমাগত তার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতে থাকে। এক পর্যায়ে তিনি তাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে তাদের জনপদ ত্যাগ করে চলে যান। এতে তারা ঘাবড়ে যায় এবং এখনই আযাব এসে যাবে বলে আশংকা করে। ফলে নবীর অনুপস্থিতিতেই তারা ঈমান আনয়ন করে এবং আযাব থেকে নিস্তার পায়। ওদিকে হযরত ইউনুস মনে করেছিলেন যে, এতক্ষণে আল্লাহর আযাব এসে তার জনগণকে হয়তো ধ্বংস করে দিয়েছে। কেননা কোন নবী যখন তাঁর জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে হিজরত করেন, তখন সাধারণতঃ ঐ জনপদের জন্য আযাব অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে, তাদের ওপর কোন আযাবই আসেনি এবং তারা ভালো আছে। তখন তিনি নিজেকে নিয়ে শংকিত হয়ে পড়লেন। কেননা প্রথমতঃ তিনি ভাবলেন, তাঁর জাতির কাছে তিনি মিথ্যুক প্রতিপন্ন হয়ে গেছেন। এখন আর তারা তাঁকে বিশ্বাস করবে না অথবা তাকে হত্যা করে ফেলবে।

অগত্যা তিনি নিজ অঞ্চলে ফিরে আসার পরিবর্তে অন্য দেশে যাওয়ার জন্য রওনা হলেন। পথিমধ্যে একটা নদী পার হবার জন্য নৌ কায় আরোহন করলেন। নৌ কা এক দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে ডুবে যেতে উদ্যত হলে মাঝি বললো যে, আরোহীদের মধ্য থেকে একজনকে পানিতে ফেলে দিতে হবে, তাহলে অন্যরা বেঁচে যাবে। এখন কাকে ফেলা হবে, সেটা স্থির করার জন্য আরোহীদের নামে লটারী করা হলো। এতে হযরত ইউনুসের নাম উঠলো এবং তাকে নদীতে ফেলে দেয়া হলো।

আল্লাহ একটি মাছকে আদেশ দিলেন হযরত ইউনুসকে গিলে খেয়ে পেটে পুরে রাখতে। মাছের পেটে গিয়ে হযরত ইউনুস আত্মসমালোচনা করেন এবং নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে নিম্নরূপ দোয়া করেনঃ হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমি যুলুমকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি। অতঃপর আল্লাহ তাকে মুক্তি দেন এবং মাছটি তাকে একটি দ্বীপে গিয়ে উদগিরণ করে দেয়।

হযরত ইউনুস আল্লাহর নির্দেশক্রমে জাতিকে বলেছিলেন তোমরা ঈমান না আনলে তিন দিনের মধ্যে আযাব আসবে। সেই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি আশংকা করেন যে, তাদের ওপর আযাব এসে যাবে। এই মনে করে তিনি আযাব থেকে দূরে থাকার জন্য অন্যত্র চলে যান। কিন্তু তারপর তাদের ঈমান আনার কারণে আযাব না আসা সত্ত্বেও তিনি তাদের কাছে ফিরে আসেননি। তাদেরকে ছেড়ে যাওয়া এবং তাদের কাছে ফিরে না আসা-

এই দু'টো কাজই তিনি নিজ মতানুসারে করেন অথবা এর একটি নিজের মতে এবং অন্যটি আল্লাহর নির্দেশে করেন- সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে যে কোন একটি কাজ যে তিনি ওহির অপেক্ষা না করেই নিজের মতানুসারে করেছিলেন এবং সে জন্য আল্লাহ তাকে পানিতে ও পানি থেকে মাছের পেটে নিক্ষেপ করে মৃদু শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওহীর অনুপস্থিতিতে নিজের ইজতিহাদ তথা সুচিন্তিত মত অনুসারে কাজ করা কোন নবীর পক্ষে কোন গুনাহ নয়, তবে ধৈর্যধারণ করে ওহির নির্দেশের অপেক্ষা করাই সম্ভবতঃ আল্লাহর দৃষ্টিতে উত্তম ছিল।

শিক্ষাঃ

১. কোন ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকলে সে ব্যাপারে নিজস্ব বা অন্যের মত অনুসরণ করা কোন মুসলমানের জন্যই বৈধ নয়। আর নির্দেশ নিজের অজানা থাকলে যারা অভিজ্ঞ, তাদের কাছ থেকে জেনে নেয়া এবং অপেক্ষা করা জরুরী।

২. বিপদে পড়লে আল্লাহর কাছে নিজের ভুলত্রুটি স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া ও মুক্তি চাওয়া যখন আল্লাহর নবীদের নীতি, তখন সাধারণ মুসলমানদের জন্য তা আরো বেশী অপরিহার্য কর্তব্য।

৯৬। উয়াইস কারনীর ঘটনা

হযরত আছীর বিন আমর থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমরের কাছে যখনই ইয়ামানের মুসলিম বীর মুজাহিদরা আসতো, তখন তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতেনঃ তোমাদের মধ্যে উয়াইস বিন আমের করনী নামে কেউ আছে নাকি? এভাবে খোঁজ-খবর নিতে নিতে এক সময় তিনি তাকে পেলেন।

অতঃপর বললেনঃ আপনিই কি উয়াইস বিন আমের?

উয়াইস বললেনঃ হ্যাঁ।

হযরত ওমরঃ আপনার বাড়ী কি ইয়ামানের কারণ নামক স্থানে?

উয়াইসঃ জ্বি।

হযরত ওমরঃ আপনার গায়ে কি কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল এবং এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা বাদে তার সবটাই কি এখন সেরে গেছে?

উয়াইসঃ জ্বি।

হযরত ওমরঃ আপনার কি মা আছেন?

উয়াইসঃ হ্যাঁ।

হযরত ওমরঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, ইয়ামানের বীর মুজাহিদদের সাথে উয়াইস বিন আমের নামক এক ব্যক্তি তোমাদের

কাছে আসবে। তার বাড়ী ইয়ামানের কারণে। তার কুষ্ঠ রোগ ছিল। এক দিরহাম জায়গা বাদে তা সেরে যাবে। তার এক মা থাকবে এবং সে এত মাতৃভক্ত হবে যে, মার দোহাই দিয়ে সে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ তাকে তা দেবেন। সম্ভব হলে তার কাছে গিয়ে আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফের আবেদন জানাতে অনুরোধ করো।" অতএব, হে উয়াইস। আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। উয়াইস তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

হযরত ওমরঃ আপনি কোথায় চলেছেন?

উয়াইসঃ কুফায়।

হযরত ওমরঃ আমি কি কুফার শাসকের কাছে আপনার যত্ন নেয়ার জন্য একটা চিঠি লিখে দেবো?

উয়াইসঃ না, সাধারণ মানুষের কাছে থাকতেই আমি ভালোবাসি।

এরপর কুফাবাসীরা যখনই হজ্জ করতে মক্কা ও মদীনায় আসতো, তখনই হযরত ওমর তাদের কাছে উয়াইসের খোঁজ-খবর নিতেন এবং তার সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) এর উক্তি সবাইকে জানাতেন। তারপর দলে দলে লোকেরা উয়াইসের কাছে যেতো এবং গুনাহ মাফের দোয়া চাইতো।

অপর রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ওমর বলেনঃ রাসূল (সাঃ) উয়াইসকে শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী বলেছেন। রাসূল (সাঃ) এর জীবদ্দশায় ঈমান আনা সত্ত্বেও উয়াইস নিজের কুষ্ঠ রোগ ও পঙ্গু মায়ের সেবা-শুশ্রুষার কারণে রাসূল (সাঃ) এর সাথে দেখা করতে ও সাহাবীর মর্যাদা লাভ করতে পারেননি। কিন্তু আল্লাহ তাকে শ্রেষ্ঠ তাবেয়ীর মর্যাদাই শুধু দেননি, সাহাবীদেরকেও তাঁর কাছে গুনাহ মাফের দোয়া চাইবার উপদেশ দিয়েছেন। কথিত আছে, উয়াইস ওহোদ যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) এর দাঁত ভেঙ্গে যাওয়ার খবর শুনে প্রচন্ড আবেগে বেসামাল হয়ে গিয়ে নিজের কয়েকটি দাঁত পাথর দিয়ে আঘাত করে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন।

শিক্ষাঃ ইসলামের যথার্থ অনুসারী ও শুভাকাংখী হলে সাহাবী না হয়েও মানুষ উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে ও আল্লাহর প্রিয় হতে পারে। বিশেষতঃ পিতামাতার সেবা যে মানুষকে কত উর্দ্ধে তুলে দিতে পারে তা এ ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায়।